কলিকাতা, বর্ধমান ও উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত, পরিবর্তিত ও সংশোধিত পাঠক্রম অনুসারে ত্রি-বার্ষিক স্নাতক (*Three-year Degree—Pass Course*) পরীক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তক।

[*Vide : Syllabi—1963*]

ভারতের সংবিধান

(Constitution of India)

দ্বিতীয় খণ্ড

[ত্রি-বার্ষিক স্নাতক (*Pass Course*) শ্রেণীর পাঠ্য]

শ্রীমহাদেব চট্টোপাধ্যায়, এম. এ[illegible]ল-এল-বি,
অধ্যাপক, কৃষ্ণচন্দ্র কলেজ, হেতমপুর (বীরভূম);
পরীক্ষক, বর্ধমান বিশ্ববি[illegible]
কর্তৃক প্রণীত

ব্যানার্জী পাবলিশার্স
৫/১এ, কলেজ রো,
কলিকাতা-৯

প্রকাশক
শ্রীসূর্যকুমার ব্যানার্জী
ব্যানার্জী পাবলিশার্স
৫।১এ, কলেজ রো
কলিকাতা—৯

মুদ্রাকর
শ্রীঅবনীরঞ্জন মান্না
নিউ মহামায়া প্রেস
৬৫।৭ কলেজ স্ট্রীট,
কলিকাতা—১২

পরমারাধ্যা মাতৃদেবী

নিহারনলিনী দেবীর

শ্রীচরণে—

মহাদেব

মুখবন্ধ

সংবিধানের বিষয়বস্তুকে ছাত্র-ছাত্রীদের উপযোগী করে পরিবেশন করা দুরূহ কাজ। এই কাজে ভাষার সাবলীলতার দিকে যেমন লক্ষ্য রাখতে হয় তেমনি বিষয়বস্তুকে যাতে বিকৃত করা না হয় সেদিকেও লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। বর্তমান গ্রন্থ রচনায় সাধ্যমত এই দুটি নীতিকেই অনুসরণ করার চেষ্টা করেছি। স্নাতক-শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষার প্রয়োজনীয়তার দিকে লক্ষ্য রেখে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিস্তৃত আকারে আলোচনা করার চেষ্টা করেছি। তাছাড়া, যে সমস্ত বিতর্কমূলক আলোচনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ব্যাখ্যা বা অভিমত সংবাদপত্র, সাময়িক পত্রিকা ইত্যাদিতে প্রকাশিত হয়েছে সেগুলিকেও সাধ্যমত ছাত্রদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। ভারতের মূল সংবিধানকে ভিত্তি করেই প্রতিটি অধ্যায় সহজ ও সরলভাবে ছাত্রদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। তাছাড়া, এই পুস্তক রচনায় অন্যান্য যে সমস্ত বইয়ের সাহায্য গ্রহণ করেছি তার মধ্যে D. Basu-এর Commentary on the Constitution of India ; D. N. Banerjee-এর Fundamental Rights, Some Aspects of the New Constitution of India ; K. V. Rao-এর Parliamentary Democracy in India প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। উক্ত লেখকদের সকলের নিকট আমার কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। তাছাড়া, Indian Journal of Political Science-এ প্রকাশিত কয়েকটি প্রবন্ধও এই পুস্তক রচনার কাজে আমায় বিশেষভাবে সাহায্য করেছে। উহার সম্পাদক ও সংশ্লিষ্ট লেখকদের আমার কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

আমার এই গ্রন্থ প্রকাশে বোলপুর কলেজের অধ্যাপক অশোক বক্সী, মহারাজা মনীন্দ্রচন্দ্র কলেজের অধ্যাপক বিভূতিভূষণ মহাত্মা অনেক বিষয়ে সাহায্য ও পরামর্শ দিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন।

সহৃদয় সহকর্মীবৃন্দ এই বইয়ের উন্নতির জন্য যে কোন পরামর্শ ও উপদেশ দেবেন কৃতজ্ঞচিত্তে তা অবশ্যই গ্রহণ করব। অনিচ্ছাসত্ত্বেও দু'-একটি মুদ্রণ প্রমাদ রয়ে গেছে ; এর জন্য আমি দুঃখিত ও লজ্জিত। পরবর্তী সংস্করণে এগুলিকে সংশোধন করার ইচ্ছা রইল। যাদের জন্য বইখানি লেখা হল তারা উপকৃত হলেই আমার পরিশ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করব। ইতি—

হেতমপুর, বীরভূম
১লা আগষ্ট, '৭৪

শ্রীমহাদেব চট্টোপাধ্যায়

POLITICAL SCIENCE

Paper II

GOVERNMENT OF INDIA

India—Chief features of the Constitution—The Preamble, the Fundamental Rights, the Directive Principles of State Policy.

Division of Powers—Relation between the Union and the States (Administrative and Legislative).

Union Government—Position and Powers of the President—Functions of the Council of Ministers—its relation to Parliament—Composition and Functions of Parliament—Legislative Procedure—Financial Control.

State Governments—Position and Powers of the Governor—Position and Functions of the Council of Ministers—Composition and Functions of the Legislative Council and Lagislative Assembly in a State—Legislative Procedure—Finance Control.

Constitution and functions of the Supreme Court—a brief description of the organisation of the State Judiciary.

Party system in India.

The Electorate—Civil Services.

An outline of the system of Local Government in West Bengal.

সূচীপত্র

অষ্টম অধ্যায়

নবম অধ্যায়

দশম অধ্যায়

একাদশ অধ্যায়

দ্বাদশ অধ্যায়

ত্রয়োদশ অধ্যায়

চতুর্দশ অধ্যায়

পঞ্চদশ অধ্যায়

ভারতের সংবিধান

(Constitution of India)

প্রথম অধ্যায়

সংবিধানের বিবর্তন ও তার ঐতিহাসিক পটভূমিকা

(Evolution and Historical background of the Constitution of India)

ভারতের বর্তমান সংবিধানকে বুঝতে হলে তার ঐতিহাসিক পটভূমিকাটি আমাদের জানা দরকার। বিদেশী শাসকগোষ্ঠীর কাছ থেকে স্বাধীনতা আদায় করতে গিয়ে যে আশা-আকাঙ্ক্ষা জাতীয় আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ে প্রতিফলিত হয়েছিল তারই পরিণত প্রকাশ হয়েছে আমাদের সংবিধানে। তাছাড়া, স্বার্থলিপ্সা অথবা যোগ্যতার সন্দিহানে পরিচালিত ইংরেজ জাতি তাদের পশ্চিমী রাষ্ট্রনৈতিক অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে এতদ্দেশীয় রাজনৈতিক পরিস্থিতির সংগে সংগতিরক্ষা করে যে শাসনতান্ত্রিক কাঠামো পর্যায়ক্রমে চালু করেছিল, বর্তমান সংবিধানের সংগে তার সুস্পষ্ট যোগসূত্র না বুঝলে, তার আসল স্বরূপটির ধারণা আমাদের অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

বিদেশী বণিক সম্প্রদায় বাণিজ্য করতে এসে এদেশের শাসন ক্ষমতা কুক্ষিগত করল। প্রাথমিক পর্যায়ে এর আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি খুঁজতে গিয়ে আমাদের দুটি উৎসের কথা উল্লেখ করতে হয়। একটি হচ্ছে বাণিজ্য করার অধিকার থেকে সাম্রাজ্য বিস্তৃতি পর্যন্ত ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপকে সনদের মাধ্যমে ইংলণ্ডের রাজা ও পার্লামেণ্ট কর্তৃক অনুমোদন এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে স্থানীয় শাসকগোষ্ঠী ও দুর্বল মোগল সম্রাটদের কাছ থেকে তার আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি।

ইংরাজী ১৬০০ সালে রাণী এলিজাবেথের কাছ থেকে সনদ নিয়ে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী নামে এক বণিক সম্প্রদায় এদেশে বাণিজ্য করতে আসে। পরবর্তী কালে দেশীয় রাজন্যবর্গের অনুগ্রহ লাভ করে তারা যথাক্রমে বোম্বাই (১৬৬৮), মাদ্রাজ এবং সুতানুটিতে (১৬৯০) তিনটি বাণিজ্যকেন্দ্র স্থাপন করে। এগুলিকে অবশ্য সাধারণ বাণিজ্যকেন্দ্র বলে ধরে নিলে ভুল করা হবে। অর্থের লোভ দেখিয়ে কিংবা নিরাপত্তার দোহাই দিয়ে এবং প্রয়োজনবোধে তোষামোদের আশ্রয় নিয়ে এই বাণিজ্য কেন্দ্রগুলিকে তারা অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত দুর্গ এবং

সৈন্যবাহিনী দিয়ে সুরক্ষিত করার ব্যবস্থা করেছিল। ১৭০৭ সালে মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেব শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার সংগে সংগে মোগল সাম্রাজ্যের সংহতিতে যে ভাঙন ধরতে শুরু করে সুচতুর এবং দুঃসাহসী বণিকগোষ্ঠী তার পরিপূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ভারতবর্ষের কর্ণধারেরা বাংলাদেশের ঘাঁটিগুলিকেই বৃহত্তর সাম্রাজ্য স্থাপনের প্রস্তুতিকেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করতে ভুল করেনি। ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে জয়লাভ করে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যে ক্ষমতা কুক্ষিগত করে, এর পরে ১৭৬৪ সালে বক্সার যুদ্ধে বিজয়ী হয়ে তার আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি তারা আদায় করে নেয় নামসর্বস্ব দিল্লীর বাদশা শাহআলমের কাছ থেকে। বাদশা শাহআলম কোম্পানীকে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানীর অধিকার দান করলেন। কোম্পানী এই অধিকার পেয়েও শাসনকার্যের সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করতে সাহসী হয়নি। তাই মুহম্মদ রেজার্খা নামে এক অপদার্থ ভাগ্যান্বেষীকে নামেমাত্র নবাবের গদীতে বসিয়ে কোম্পানীই হয়ে উঠল বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার ভাগ্যবিধাতা। দেশের শান্তি ও শৃঙ্খলারক্ষার দায়িত্ব নিয়ে রেজার্খা হলেন নবাব। আর কোম্পানী তার দেওয়ান—অর্থাৎ রাজস্বসংক্রান্ত ব্যাপারের তত্ত্বাবধায়ক মাত্র। হতভাগ্য নবাব! না আছে টাকা, না আছে সৈন্যবাহিনীর উপর কর্তৃত্ব। দুটোর জন্যই কোম্পানীর দ্বারস্থ না হয়ে গত্যন্তর নেই। ক্লাইভের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত এই দ্বৈত শাসনব্যবস্থা বাংলা দেশের জীবনে এক চরম দুর্যোগ ডেকে এনেছিল। দায়িত্বহীন শাসনব্যবস্থা ও নিষ্ঠুর অর্থনৈতিক শোষণের ভয়াবহ পরিণতি ছিয়াত্তরের মন্বন্তর (ইং ১৭৬৯—'৭০)। এমত অবস্থায় স্বভাবতই ব্রিটিশ সরকার ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কার্যকলাপে হস্তক্ষেপ না করা সমীচীন বোধ করলেন না। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ভারতীয় কার্যকলাপ সম্বন্ধে বিবরণ দাখিল করার জন্য পার্লামেণ্ট একটি কমিটি নিয়োগ করলেন। এই কমিটি কোম্পানীর কাজের তীব্র সমালোচনা করে তার বিরুদ্ধে এক বিবরণ পেশ করেন। ফলে

নর্থের রেগুলেটিং অ্যাক্ট

কোম্পানীর কার্যকলাপকে নিয়ন্ত্রিত করার জন্য ১৭৭৩ সালে প্রধানমন্ত্রী লর্ড নর্থের নেতৃত্বে ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট একটি আইন পাস করে। এই আইনটিকে নর্থের রেগুলেটিং অ্যাক্ট (Regulating Act—1773) বলা হয়। এই আইন অনুসারে বাংলা দেশের শাসনের দায়িত্ব সপরিষদ গভর্ণর জেনারেলের হাতে ন্যস্ত করা হয় এবং

বোম্বাই ও মাদ্রাজের গভর্ণরদের বাংলার গভর্ণর জেনারেলের অধঃস্তন হিসেবে ঘোষণা করা হয়। এছাড়া, গভর্ণর জেনারেল এবং তাঁর পরিষদের কার্যাবলীকে কিছুটা নিয়ন্ত্রিত করার জন্য ইংলণ্ডের রাজার প্রতি দায়িত্বশীল সুপ্রীমকোর্ট নামে একটি সংস্থার সৃষ্টি করা হয়।

পিটের ইণ্ডিয়া অ্যাক্ট

এই আইনের দশ বৎসর পর পিটের প্রধান মন্ত্রিত্বকালীন ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট ১৭৮৪ সালে আর একটি আইন পাস করে। এই আইন পিটের ইণ্ডিয়া অ্যাক্ট (Pitt's India Act, 1784) নামে খ্যাত। এই আইন সর্বপ্রথম ভারতীয় ভূখণ্ডের উপর ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের সার্বভৌমত্ব সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করে। অতঃপর কোম্পানীর বিলাতের কার্যনির্বাহক পরিষদ (Court of Directors) এবং ভারতীয় শাসনব্যবস্থাকে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত করার উদ্দেশ্যে পার্লামেণ্ট রাজার প্রতিনিধিদের নিয়ে বোর্ড অব্ কণ্ট্রোল (Board of Contro) নামে একটি পৃথক সংস্থার সৃষ্টি করে।

১৮১৩—'৫৩ সালের বিভিন্ন চার্টার অ্যাক্ট

১৮১৩ সাল থেকে ১৮৫৩ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন চার্টার আইন (Charter Acts) দ্বারা ব্রিটিশ পালামেণ্ট কোম্পানীর ভারতীয় শাসনব্যবস্থার উপর তার কর্তৃত্ব বিস্তৃত করে। এই আইনগুলির মধ্যে ১৮৩৩ এবং ১৮৫৩ সালের চার্টার আইন দুটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৮৩৩ সালের চার্টার আইনের দ্বারা বাংলার গভর্ণরকে ভারতের গভর্ণর জেনারেল হিসেবে নিয়োগ করা হয় এবং প্রাদেশিক সরকারদের আইন প্রণয়নের ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত করে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে এই ক্ষমতা দেওয়া হয়। ভারতের শাসন-সংক্রান্ত সমুদয় কার্যাবলীর ব্যবস্থাপনা, পরিচালনা এবং নিয়ন্ত্রণের (Superintendence, direction and control) দায়িত্ব সপরিষদ গভর্ণর জেনারেলের হাতে ন্যস্ত করা হয়। আর ১৮৫৩ সালের চার্টার আইনে আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্যে শাসন পরিষদের আয়তন বৃদ্ধি করে কয়েকজন অতিরিক্ত সদস্য দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়।

সিপাই বিদ্রোহ ও ১৮৫৮ সালের ভারত শাসন আইন

১৮৫৭ সালে সারা ভারতবর্ষ ব্যাপী ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহানল জ্বলে ওঠে। ভারতবর্ষের ইতিহাসে এই বিদ্রোহ ১৮৫৭ সালের সিপাই বিদ্রোহ নামে বিখ্যাত। ডঃ পট্টাভি সীতারামিয়া এই বিদ্রোহকে 'ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ' (First war of Independence) বলে আখ্যা দিয়েছেন। এই বিদ্রোহের যথার্থ স্বরূপ সম্বন্ধে মতবিরোধ থাকলেও বিক্ষুব্ধ ও চঞ্চল সিপাহীরা

দেশীয় নৃপতিবর্গ এবং স্থানে স্থানে সাধারণ মানুষের সংগে যোগ দিয়ে বিদেশী শাসনব্যবস্থার ভিত্‌কে যে গভীর ভাবে নাড়া দিয়েছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তদানীন্তন ব্রিটিশ সরকারের কর্ণধারেরা কোম্পানীর শাসনের বিরুদ্ধে ভারতীয়দের অসন্তোষ এবং বিক্ষোভের তীব্রতা অনুভব করে এবং ১৮৫৮ সালে এক নতুন ভারত শাসন আইন পাস করেন। এই আইনের দ্বারা ভারতে কোম্পানীর শাসনের অবসান ঘটিয়ে ব্রিটিশ সম্রাজ্ঞী মহারাণী ভিক্টোরিয়া প্রত্যক্ষ ভাবে ভারত শাসনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এই আইনের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ভারতের শাসনব্যবস্থা সম্বন্ধে ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের প্রতি দায়িত্বশীল একটি ভারত সচিব (Secretary of State for India) পদের সৃষ্টি। ভারত সচিব কেবিনেট পর্যায়ভুক্ত একজন মন্ত্রী হবেন। ভারত সচিবকে তাঁর কাজে সাহায্য করার জন্য ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন কয়েকজন ব্যক্তিকে নিয়ে একটি মন্ত্রণা পরিষদ (Indian Council) গঠিত হবে। এই মন্ত্রণা পরিষদের মোট সদস্যসংখ্যা হবে ১৫ জন। এই ১৫ জনের মধ্যে ৮ জন রাণীর দ্বারা নিযুক্ত হবেন এবং বাকী ৭ জন অবলুপ্ত কোর্ট অফ ডাইরেকটারদের দ্বারা নির্বাচিত হবেন। পরবর্তী কালে এই পরিষদের সদস্যদের সকলেই রাজা বা রাণী কর্তৃক নিযুক্ত হতেন। এই পরিষদের সদস্যদের মধ্যে অন্তত: ৯ জনকে এমন ব্যক্তি হতে হবে যাঁরা ভারত সরকারের অধীনে অন্তত: দশ বছর কাজ করেছেন। ভারত-সচিব মন্ত্রীপর্যায়ভুক্ত এবং ভারতীয় ব্যবস্থা সম্বন্ধে অভিজ্ঞ রাজনীতিজ্ঞ হলেও ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে তাঁর প্রত্যক্ষ জ্ঞান না থাকাই স্বাভাবিক। তাই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তিদের নিয়ে এই মন্ত্রণা পরিষদের সৃষ্টি। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার একটি ঘোষণা (Proclamation) সহ এই আইনটিকে আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রকাশ করা হয়। এই ঘোষণায় বলা হয় যে যথাসম্ভব জাতি ও ধর্ম নিরপেক্ষ সকল ভারতীয় প্রজাকে তাদের শিক্ষা ও যোগ্যতা অনুসারে সরকারী চাকরিতে নিযুক্ত করাই তাঁদের ইচ্ছা। তাছাড়া, দেশীয় নৃপতিবর্গের সংগে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যে সমস্ত সন্ধি ও চুক্তিতে আবদ্ধ হন সেগুলিকে শ্রদ্ধার সংগে মেনে চলা ও বজায় রাখার্ কথাও বলা হয়।

১৮৫৭ সালের পর ব্রিটিশ সরকার তাদের শাসন ব্যবস্থা সম্বন্ধে ভারতীয় জনমতের স্বরূপ জানবার জন্য অধিকতর আগ্রহী হয়ে ওঠে। এতদুদ্দেশ্যে ১৮৬১ সালে *Indian Council Act* পাস করে পার্লামেণ্টে ভারতীয় আইন

সভায় কয়েকজন ভারতীয় সদস্যকে গ্রহণ করার ব্যবস্থা করেন। এই আইনের বিধান অনুসারে ঠিক হয় যে কেন্দ্রীয় আইনসভায় (Supreme Council) কয়েকজন অতিরিক্ত সদস্য নেওয়া হবে। এই অতিরিক্ত সদস্যদের সংখ্যা ছয়জনের কম ও বারজনের বেশী হবে না এবং সমগ্র সদস্য সংখ্যায় অন্ততঃ অর্ধেক সংখ্যক হবেন বেসরকারী। বেসরকারী সদস্যদের মধ্যে ভারতীয় সদস্যদের নেওয়ারও ব্যবস্থা করা হয়। এই অতিরিক্ত সদস্যদের সকলেই গভর্ণর জেনারেল কর্তৃক মনোনীত হবেন। সুপ্রীম কাউন্সিলের ক্ষমতা ছিল খুবই সীমাবদ্ধ। প্রশ্ন করবার ক্ষমতা অথবা সরকারীর আয়ব্যয় সম্বন্ধে আলোচনা করার ক্ষমতাও এই পরিষদের ছিল না। কতকগুলি বিষয়ে আইন তৈরী করার মধ্যেই এর ক্ষমতা ছিল সীমাবদ্ধ। কতকগুলি বিশেষ বিষয়ে বিল উত্থাপনের জন্যও গভর্ণর জেনারেলের অনুমতি নিতে হত। ১৮৩৩ সালের আইনে বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর শাসন প্রণয়নের ক্ষমতা তুলে নেওয়া হয়। ১৮৬১ সালের আইনে এই দুটি প্রদেশকে পুনরায় আইন প্রণয়নের ক্ষমতা প্রত্যার্পণ করা হয়।

১৮৬১ সালের Indian Councils Act

ভারতে জাতীয়তাবাদের ভাবধারা ইতিমধ্যেই দানা বাঁধতে শুরু করেছিল। ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত ভারতীয়েরা পাশ্চাত্ত্যের স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তাদের নিজের দেশের জন্যও প্রতিনিধিমূলক শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের কথা চিন্তা করতে লাগল। অষ্টাদশ এবং ঊনবিংশ শতকের সামাজিক ও ধর্মীয় আন্দোলন জাতীয়তাবাদের ভাবধারাকে পরিপুষ্ট করে। ব্রাহ্মসমাজের প্রবর্তক রাজা রামমোহন রায়কে ভারতের নবজাগরণ (Indian Renaissance) এবং জাতীয়তাবাদের অন্যতম পুরোধা হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী দয়ানন্দ, এনিবেসন্ত প্রভৃতি মহাপুরুষদের কথাও এই প্রসংগে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁরা একাধারে হিন্দুধর্ম তথা প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠত্ব এবং তদানীন্তন সমাজ-ব্যবস্থার সংস্কারের কথা বলিষ্ঠভাবে প্রচার করে ভারতের সাধারণ মানুষকে আত্ম-সচেতন করে তুলে জাতীয়তাবাদের উন্মেষকেই সুপ্রশস্ত করে তুললেন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রয়োজনের তাগিদে গড়ে ওঠা রেল, তার প্রভৃতি যোগাযোগ ব্যবস্থা শিক্ষিত ভারতবাসীদের চিন্তা ও ভাবের আদান-প্রদানের পথকে সুপ্রশস্ত করে পরোক্ষভাবে ভারতীয় ভাবধারাকে সুদৃঢ়ভাবে গড়ে উঠতে সাহায্য করে।

জাতীয়তাবাদের উন্মেষ

১৮৭৬ সাল থেকে ১৮৮০ সাল পর্যন্ত লর্ড লিটন (*Lord Lytton*) ভারতের গভর্ণর জেনারেল পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ভারতীয় জনমতকে উপেক্ষা করে আফগানিস্থানের অভিযান পরিচালনা, অস্ত্রসংক্রান্ত আইন (The Arms Act), ভারতীয় ভাষায় মুদ্রাযন্ত্র-সংক্রান্ত আইন (The Vernacular Press Act) প্রভৃতি আইনের মাধ্যমে তিনি যে দমন নীতি প্রবর্তন করেন ভারতের ইংরাজী শিক্ষিত সম্প্রদায় তার ফলে অনিবার্যভাবে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে বিরুদ্ধ মনোভাবাপন্ন হয়ে ওঠে। ইউরোপীয় এবং ভারতীয়দের মধ্যে বিচার-বৈষম্য দূরীকরণের জন্য স্যার সি. পি. এলবার্ট (*Sir C. P. Ilbert*) যে বিল আনয়ন করেন ইউরোপীয় এবং আংলোইণ্ডিয়ান সম্প্রদায় তাদের শ্রেণীর স্বার্থ বজায় রাখার উদ্দেশ্যে যে আন্দোলন শুরু করে তার প্রতিক্রিয়া হিসেবে স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৭৬ সালে ইণ্ডিযান এ্যাসোসিয়েশন (Indian Association) নামে এক সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান গঠন করেন। নবজাগ্রত ভারতের রাজনৈতিক জীবনের এমনি এক যুগ সন্ধিক্ষণে ১৮৮৫ সালে জাতীয় কংগ্রেসের জন্ম হয়। অক্টোভিয়ান হিউম (*A. O. Hume*) নামে জনৈক অবসরপ্রাপ্ত সিভিলিয়ানকে জাতীয় কংগ্রেসের জনক হিসেবে গণ্য করা হয়। ১৮৮৫ সালে বোম্বাইয়ে শ্রীউমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন বসে।

লিটনের দমন নীতি

জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা

জাতীয় কংগ্রেস প্রথম অধিবেশনেই কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন-সভাগুলিতে নির্বাচিত সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি এবং সেগুলিকে অধিকতর ক্ষমতা দেবার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে প্রস্তাব গ্রহণ করে। ("That this Congress considers the reform and expansion of the Supreme and existing Provincial Legislative Councils by the admission of a considerable proportion of elected members (and the creation of similar Councils for the North Western Provinces and Oudh and also for the Punjab) essential and holds that all budgets should be referred to these Councils for consideration, their members being moreover empowerd to interpellate the Executive in regard to all branches of the administration") ।

এমত অবস্থায় ১৮৬১ সালের আইন স্বভাবতঃই ভারতীয় জনমতকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি। তারা চেয়েছিল এই পরিষদগুলির এমন ক্ষমতা থাকবে যাতে নাকি তারা সরকারকে সত্যিকারের প্রভাবিত ও পরিচালিত করতে পারে। ভারত সচিবের পদ ও তার মন্ত্রণাপরিষদ সৃষ্টির পর থেকেই ব্রিটিশ সরকারের স্থানীয় কর্মকর্তারা ইংলণ্ডের নিয়ন্ত্রণের তীব্রতাও অনুভব করতে লাগলেন। ফলে এই পরিষদগুলিকে ভারতীয় সদস্যদের সংখ্যা এবং আইনগত ক্ষমতা বৃদ্ধি করে আইন পরিষদগুলিকে নতুন করে সংগঠন করার কথা অনুভূত হতে লাগল। ১৮৮৮ সালে লর্ড ডাফরিণ (*Lord Dufferin*) এই পরিষদগুলিকে নতুন করে গঠন করার উদ্দেশ্যে একটি কমিটি নিয়োগ করেন। তিনি ভারতীয় সদস্যদের নির্বাচনের ভিত্তিতে গ্রহণ করার পক্ষপাতী ছিলেন এবং সেই মর্মে বিলাতের কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন জানান। এই প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে লড ডাফরিণের পর তার পরবর্তী গভর্ণর জেনারেল লর্ড ল্যানস্‌ডাউনের (*Lord Lansdown*) আমলে ১৮৯২ সালে Indian Councils Act পাশ হয়। এই আইনের দ্বারা গভর্ণর জেনারেলের শাসন পরিষদের (Executive Council) সদস্য সংখ্যা বাড়িয়ে দেওয়া হয় এবং ঠিক করা হয় অতিরিক্ত সদস্যের সংখ্যা (Additional members) দশ জনের কম ও ষোল জনের বেশী হতে পারবে না। প্রাদেশিক আইনসভাগুলিতেও অতিরিক্ত সদস্য (Additional members) গ্রহণ করার ব্যবস্থা করা হয়। পরোক্ষ নির্বাচনের ভিত্তিতে কেন্দ্র ও প্রাদেশিক আইনসভাগুলিকে অতিরিক্ত সদস্য গ্রহণ করার ব্যবস্থা গৃহীত হয়। সুপ্রীম কাউনসিলের (Supreme Council) চার জন বেসরকারী সদস্য চারটি প্রাদেশিক আইনসভার বেসরকারী সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত হবেন বলে ঠিক করা হয়। এই নির্বাচন হবে সুপারিশের আকারে। তাঁরা সুপারিশ করার পর গভর্ণর জেনারেল তাঁদের মনোনীত করবেন প্রাদেশিক আইনসভাগুলিতে এবং মিউনিসিপ্যালিটি, জেলাবোর্ড, বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি সংস্থাগুলি থেকে যে সদস্যদের নাম সুপারিশ করা হবে ছোটলাট তাঁদের মনোনীত করবেন। আইনসভাগুলির ক্ষমতার পরিধিও বাড়িয়ে দেওয়া হয়। শাসন পরিষদের সদস্যদের প্রশ্ন করার এবং বাজেট নিয়ে আলোচনা করার ক্ষমতাও তাঁদের দেওয়া হয়।

১৮৯২ সালের Indian Councils Act

স্থাপনের প্রথম দিন থেকেই কংগ্রেস কতকগুলি সংস্কারবাদী মধ্যপন্থীদের প্রভাবাধীনে ছিল। নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে আইনসভা, স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠান

এবং সরকারী চাকরিগুলির যথাসম্ভব ভারতীয়করণ ছিল তাঁদের লক্ষ্য। এই নিয়মতান্ত্রিক উপায়ের বৈধতাকে অস্বীকার করে এই সময় ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনের পুরোভাগে এগিয়ে এলেন ভারতীয় ভাবধারায় অনুপ্রাণিত একদল চরমপন্থী। লোকমান্য তিলক, বিপিনচন্দ্র পাল, লালা লাজপৎ রায় প্রভৃতি নেতারা ছিলেন এই নব্য চিন্তাধারার পুরোভাগে। এই সময় লর্ড কার্জন ছিলেন ভারতবর্ষের গভর্ণর জেনারেল (১৮৯৪—১৯০৫)। নিষ্ঠুর দমন নীতির প্রবর্তক হিসেবেই ভারতের ব্রিটিশ শাসনের ইতিহাসে তিনি সমধিক প্রসিদ্ধ।

চরমপন্থীদের অভ্যুত্থান ও বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন

কলিকাতা করর্পোরেশন আইন (Calcutta Corporation Act, 1899), ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়-সংক্রান্ত আইন (Indian Universities Act, 1904), অফিসিয়েল সিক্রেট আইন (Official Secrets Act) প্রভৃতি জনস্বার্থবিরোধী আইন এদেশে যে প্রতিবাদের ঝড় তুলেছিল তার তীব্র এবং চরম আকার ধারণ করে ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের মাধ্যমে। আবেদন-নিবেদনের পালা শেষ করে চরমপন্থীরা এক নতুন কর্মপন্থা উপস্থাপিত করলেন দেশবাসীর সামনে: এই পন্থা হচ্ছে—স্বরাজ, স্বদেশী, বয়কট এবং জাতীয় শিক্ষা। ১৯০৬ সালে কলকাতা কংগ্রেসে গৃহীত এই ঐতিহাসিক পরিকল্পনা সারা ভারতে এক নতুন প্রেরণা এবং আলোড়ন সৃষ্টি করে। ব্রিটিশ সরকারের ধুরন্ধরেরা একাধারে চরমপন্থীদের বিরুদ্ধে তীব্র শাস্তিমূলক ব্যবস্থা এবং নতুন শাসন সংস্কারের পরিকল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করলেন এর পরে ১৯০৯ সালে *Indian Councils Act* পাস হল। এই আইন *Morly Minto Reforms* নামে খ্যাত।

মর্লি-মিণ্টো রিফর্মে কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক আইনসভাগুলির গঠন ও ক্ষমতার যথেষ্ট পরিবর্তন সাধন করা হয়। এই আইনে কেন্দ্রীয় আইনসভার অতিরিক্ত সদস্য (Additional members) সংখ্যা বাড়িয়ে ৬০ জন করা হয়। এই সংস্থার মোট সদস্য সংখ্যা হবে ৬৯ জন। ৬০ জন অতিরিক্ত সদস্য ছাড়া, বাকী সদস্যেরা হবেন গভর্ণর জেনারেল ও প্রধান সেনাপতিসহ শাসন পরিষদের (Executive Council) সদস্যেরা এবং যে প্রদেশে অধিবেশন বসবে সেই সরকারের সর্বোচ্চ পদাধিকারী। 'বাংলা, মাদ্রাজ, বোম্বাই এবং ইউনাইটেড প্রভিন্সের আইন পরিষদের সদস্য সংখ্যাও বাড়ান হয়। আইন পরিষদগুলির সদস্যদের

মর্লি-মিণ্টো রিফর্ম

মোটামুটি চার আগে ভাগ করা যেতে পারে। যথা, প্রথমতঃ, শাসন পরিষদের (Executive Council) সদস্যরা পদাদিকারবলে এই পরিষদের সদস্য। দ্বিতীয়তঃ, মনোনীত সরকারী সদস্যরা (Nominated officials), তৃতীয়তঃ মনোনীত বেসরকারী সদস্যরা এবং চতুর্থতঃ বিভিন্ন শ্রেণী, স্বার্থ এবং সম্প্রদায়দের দ্বারা নির্বাচিত সদস্যরা। কেন্দ্রীয় আইনসভার (Imperial Legislative Council) ২৭ জন সদস্যের মধ্যে ৫ জন নির্বাচিত হবেন মুসলমানদের দ্বারা। ৬ জন হবেন জমিদারদের দ্বারা ১ জন মুসলমান জমিদারদের দ্বারা এবং বোম্বাই ও মাদ্রাজ চেম্বাব অব্ কমার্সের দ্বাবা একজন করে প্রতিনিধি নির্বাচিত হবেন। বাকী ১৩ জন সদস্য প্রাদেশিক আইনসভার বেসরকারী সদস্যেরা নির্বাচিত করবেন। প্রাদেশিক আইনসভাগুলিতে বিভিন্ন শ্রেণী সম্প্রদায় এবং জেলাবোর্ড, মিউনিসিপ্যালিটি, করর্পোরেশন প্রভৃতির তবফ থেকে প্রতিনিধি গ্রহণের ব্যবস্থা হয়। কেন্দ্রীয় আইনসভায় সবকাবী সদস্যরা ছিলেন সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং প্রাদেশিক আইনসভার বেসরকারী সদস্যরা ছিলেন সংখ্যাগরিষ্ঠ। আইনসভার ক্ষমতাও কিছু পরিমাণে বাড়িয়ে দেওয়া হয়। তাঁরা বাজেট আলোচনা করতে পারতেন এবং প্রয়োজনবোধে সরকারকে প্রশ্ন করার অধিকারও পেয়েছিলেন। জনস্বার্থ সম্বন্ধে প্রস্তাব গ্রহণ করার অধিকারও তাদের দেওয়া হয়।

১৯০৯ সালের আইন কংগ্রেসের মধ্যপন্থী নেতাদেরও সন্তুষ্ট করতে পারল না। পক্ষান্তরে চরমপন্থীদের বিরুদ্ধে নিষ্ঠুর দমন নীতি তাঁদের আন্দোলনের তীব্রতাকে বাড়িয়েই দিয়েছিল। ১৯১৪ সালে ইউরোপে প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হয়। গভর্নর জেনারেল লর্ড হার্ডিঞ্জ বঙ্গভঙ্গ রদ করলেন এবং কলকাতা থেকে দিল্লীতে ভারতের রাজধানী স্থানান্তরিত করা হল। লর্ড হার্ডিঞ্জের উদারনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী এবং ভারতীয় জনমতের সপক্ষে সহানুভূতি সহকারে শাসনব্যবস্থা পরিচালনার ফলে ভারতবর্ষ ইউরোপের মহাসমরে ইংলণ্ডকে বিশ্বস্ততা সহকারে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে এল। মহাত্মা গান্ধী এই যুদ্ধে ব্রিটিশ সরকারকে ভারতের তরফ থেকে অকুণ্ঠ সহযোগিতার কথা জ্ঞাত করালেন। ভারতবর্ষ অর্থ ও জনবল দিয়ে সরকারকে তার যুদ্ধ প্রচেষ্টায় সাহায্য করায় স্বভাবতই ভারতীয় জনমত আশা করেছিল সে যুদ্ধান্তে ভারত সরকার ভারতের স্বাধীনতার দাবীকে উপেক্ষা করবেন না। ১৯১৭ সালের ২০শে আগস্ট মণ্টেগু ঘোষণা করলেন যে শাসনব্যবস্থার প্রত্যেক বিভাগে অধিক সংখ্যক ভারতীয়দের নিয়ে

বৃটিশ সাম্রাজ্যের অংশ হিসেবে ভারতে দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন করাই ভারত সরকারের লক্ষ্য। ভারত সচিবের এই উক্তিতে সন্তোষ প্রকাশ করে ১৯১৭ সালে কলকাতা কংগ্রেসে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। উক্ত ঘোষণার তিন মাস পরেই ভারত-সচিব মণ্টেগু ভারতবর্ষে এলেন। তখনকার বড়লাট চেমস্‌ফোর্ডকে নিয়ে তিনি ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করে ভারতের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সংগে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে ভারতের জনমত সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হলেন। মণ্টেগু ও চেমস্‌ফোর্ডের সহি-সম্বলিত তাঁদের বিবরণ ১৯১৮ সালের প্রকাশিত হল। এই বিবরণের ভিত্তিতে ৯১৯ সালের ভারত শাসন আইন পাস হয়।

এই আইনের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক শাসন-সংক্রান্ত বিষয়গুলিকে পৃথক করে প্রদেশগুলিতে দ্বৈতশাসন ব্যবস্থার (Dyarchy) প্রবর্তন। প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থার সমস্ত বিষয়বস্তুগুলিকে দুইভাগে ভাগ করা হয়: যথা, সংরক্ষিত (*Reserved*) ও হস্তান্তরিত (*Transferred*)। সংরক্ষিত (Reserved) অংশের বিষয়বস্তুগুলি গভর্ণর স্বয়ং এবং তাঁর উপদেশষ্টামণ্ডলীর (Executive Council) সাহায্যে পরিচালিত হত। তাঁদের কার্যাবলীর জন্য তাঁরা আইন-সভার কাছে দায়ী হবেন না। হস্তান্তরিত Transferred অংশের বিষয়বস্তুগুলি পরিচালিত হত আইনসভাগুলি থেকে গৃহীত মন্ত্রিমণ্ডলীর সাহায্যে। তাঁরা আইনসভার কাছে দায়ী হবেন। উপদেষ্টামণ্ডলীর দ্বারা পরিচালিত সংরক্ষিত অংশে রাজস্ব, শান্তিশৃঙ্খলা প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত ছিল, আর হস্তান্তরিত অংশে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আবগারী প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সমগ্র শাসনব্যবস্থার বিষয়গুলিকে এইভাবে দুই ভাগে ভাগ করার জন্য এই শাসনব্যবস্থাকে দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা বা (Dyarchy) বলা হত। তাছাড়া, আইন সভায় যে কোন প্রস্তাবকে নাকচ করার ক্ষমতা গভর্ণরের ছিল। আইনসভা কর্তৃক কোন অস্বীকৃত বা না-মঞ্জুর বিষয়কেও চালু করার ক্ষমতাও গভর্ণরদের দেওয়া হয়েছিল।

মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড রিফর্ম

মণ্টেগু চেমস্‌ফোর্ড রিফর্ম চালু হবার আগে ভারতের জাতীয় আন্দোলনের নেতৃত্ব পদে অধিষ্ঠিত হলেন মহাত্মা গান্ধী। ১৯১৫ সালে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি জাতীয় কংগ্রেসে যোগদান করেন। প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর জাতীয় কংগ্রেসের নেতারা আশা করেছিলেন যে ব্রিটিশ

সরকার তার প্রতিশ্রুতি অনুসারে প্রয়োজনীয় শাসন সংস্কার প্রবর্তন করবেন। কিন্তু কুখ্যাত রাউলাট আইন (*Rowlatt Act*) পাস হওয়ার ফলে সে আশা তাঁরা ত্যাগ করলেন। ১৯১৯ সালের ১৩ই মার্চ গান্ধীজীর ডাকে সারা ভারতবর্ষ হরতাল পালন করল। তারপর এল ঐ বছরের ১৩ই এপ্রিল তারিখের জেনারেল ডায়ারের পরিচালনায় জালিয়ানওয়ালাবাগের ভয়াবহ এবং নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড। ১৯২০ সালের নাগপুর কংগ্রেস গান্ধীজীর পরিচালনায় সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করল যে সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়ে স্বায়ত্তশাসন (Self Government within the Empire) নয়—বৈধ এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে স্বরাজ (The altainment of Swaraj by the people of India by all legitimate and peaceful means) লাভ করাই হবে ভারতবর্ষের লক্ষ্য।

মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলন ও জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড

মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড রিফর্ম চালু হওয়ার সংগে সংগে ১৯২৩ সালে কংগ্রেসের মধ্যে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, মতিলাল নেহেরু প্রভৃতির নেতৃত্বে স্বরাজ্য পার্টি গঠিত হয়। এই দলের উদ্দেশ্য ছিল আইনসভা দখল করে মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড রিফর্মকে বানচাল করে দেওয়া। বাংলার আইন সভায় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের এবং কেন্দ্রীয় আইন সভায় মতিলাল নেহেরুর পরিচালনায় মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড রিফর্মের আসল স্বরূপকে প্রকাশ করে দিয়ে তাঁরা এই প্রচেষ্টায় কৃতকার্য হয়েছিলেন। ১৯১৯ সালের ভারত-শাসন আইনের বিধান অনুসারে সাইমনের নেতৃত্বে ভারতের শাসনব্যবস্থা ও তার কার্যপ্রণালী সম্বন্ধে বিবরণ দাখিল করার জন্য ১৯২৬ সালে স্যার জন সাইমনের (*Sir John Simon*) সভাপতিত্বে একটি কমিশন নিযুক্ত হয়। এই কমিশন ১৯১৯ সালের দ্বৈতশাসন ব্যবস্থার অসারত্ব উল্লেখ করে এবং প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থার ক্ষেত্রে আইনসভার প্রতিনিধিদের দ্বারা নির্বাচিত মন্ত্রিমণ্ডলীর পরিচালনায় দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের সপক্ষে বিবরণ পেশ করেন।

র‍্যামসে ম্যাক্‌ডোনাল্ডের প্রধান মন্ত্রিত্বকালীন সাইমন কমিশনের রিপোর্টের ভিত্তিতে ১৯৩০ সালে লণ্ডনে একটি গোলটেবিল বৈঠক আহূত হয়। এই বৈঠকে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের তরফ থেকে প্রতিনিধি নেওয়া হলেও কংগ্রেসের তরফ থেকে কোন প্রতিনিধিকে এখানে আহ্বান করা হয় না। স্বভাবতঃ এই বৈঠক কোন কার্যকরী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেনি। ইতিমধ্যে যুদ্ধোত্তর

অর্থনৈতিক দুরাবস্থার কবলে নিষ্পেষিত কৃষক, শ্রমিক এবং সাধারণ বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে ব্রিটিশ সরকারকে শাসন সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে অধিকতর সজাগ করে তুলল। ১৯৩১ এবং ১৯৩২ সালে উপর্যুপরি দুটি গোলটেবিল বৈঠক আহুত হয়। দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে কংগ্রেসের প্রতিনিধি হিসেবে মহাত্মা গান্ধী উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে আইনসভার আসন বণ্টনের প্রশ্নে গান্ধীজীর সংগে ব্রিটিশ সরকারের প্রতিনিধিদের মতান্তর উপস্থিত হওয়ায় এই বৈঠকে কোন কার্যকরী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। তৃতীয় বৈঠকেও কংগ্রেসের প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন না। তিনটি গোলটেবিল বৈঠকের আলোচনার ভিত্তিতে ১৯৩৩ সালের মার্চ মাসে ব্রিটিশ সরকার একটি হোয়াইট পেপার (*White Paper*) প্রকাশ করেন। এই হোয়াইট পেপারে বর্ণিত সরকারের প্রস্তাবগুলি আলোচনা করে তার ভিত্তিতে একটি বিবরণ পেশ করার জন্য পার্লামেণ্ট কর্তৃক একটি সিলেক্ট কমিটি (Joint Parliamentary Select Committee) নিযুক্ত হয়। ১৯৩৪ সালের নভেম্বর মাসে এই কমিটি একটি বিবরণ দাখিল করেন। এই বিবরণের ভিত্তিতে পার্লামেণ্ট ১৯৩৫ সালে ভারত-শাসন আইন পাস করেন।

১৯৩৫ সালের ভারত-শাসন আইনে দেশীয় রাজ্য এবং ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষকে নিয়ে একটি যুক্তরাষ্ট্র গঠনের উল্লেখ করা হয়। ১৯১৯ সালের মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড রিফর্মে প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থার অনুকরণে ১৯৩৫ সালের আইনে কেন্দ্রে দ্বৈত শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। দেশরক্ষা (Defence), বৈদেশিক ব্যবস্থা (External Affairs), ধর্মসম্বন্ধীয় ব্যবস্থা (Ecclesiastical Affairs), উপজাতি এলাকা (Tribal Areas) প্রভৃতি বিষয় সপরিষদ গভর্ণর জেনারেলের হস্তে ন্যস্ত হয়। এই সব বিষয়ের বিভিন্ন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সদস্যেরা আইনসভার কাছে দায়ী থাকবেন না বা আইনসভা কর্তৃক অপসারিতও হবেন না। অন্যান্য বিষয়গুলি আইনসভার সদস্যদের মধ্য থেকে গৃহীত মন্ত্রীদের দ্বারা পরিচালিত হবে। তাঁরা মন্ত্রিসভার সদস্য হিসেবে আইনসভার কাছে দায়ী থাকবেন এবং আইনসভার দ্বারা অপসারিতও হতে পারেন।

১৯৩৫ সালের ভারত-শাসন আইন

প্রদেশের ক্ষেত্রে দ্বৈতশাসন ব্যবস্থার বিলোপসাধন করে দায়িত্বশীল শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন (Provincial Autonomy) এই আইনের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

১৯১৯ সালের আইনে শাসনব্যবস্থার বিষয়বস্তুগুলিকে *Reserved* এবং *Transferred*—এই দু'ভাগে ভাগ করা হয়। ১৯৩৫ সালের আইনে এই বিধান তুলে দিয়ে সমস্ত বিষয়গুলি দায়িত্বশীল মন্ত্রিসভার পরিচালনায় রক্ষিত হয়। দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থা বলতে আমরা যেন মনে না করি যে গণতান্ত্রিক নীতি অনুসারে মন্ত্রিমণ্ডলী তাদের উপর ন্যস্ত বিষয়বস্তুগুলি স্বাধীনভাবে পরিচালিত করত। আইনসভাও প্রতিনিধিস্থানীয় সংস্থা হিসেবে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারত। এই আইনে গভর্ণর জেনারেল এবং প্রাদেশিক গভর্ণরদের হাতে প্রচুর ক্ষমতা দেওয়া হয় যার বলে মন্ত্রী অথবা আইনসভার যে কোন সিদ্ধান্ত তাঁরা নাকচ (Veto) করে দিতে পারতেন বা তাঁদের অস্বীকৃত সিদ্ধান্তকে কার্যকরী (Certification) করতে পারতেন। তাছাড়া, তাঁদের কতকগুলি বিশেষ দায়িত্ব (Special Responsibilities) দিয়েও এই শাসনব্যবস্থা তথাকথিত *Provincial Antonomy*কে এক প্রহসনে পর্যবসিত করেছিল।

এই শাসনব্যবস্থায় প্রাদেশিক অংশটুকু চালু করা হয় এবং কেন্দ্রীয় অংশটুকু চালু হওয়ার পূর্বেই ইউরোপে দ্বিতীয় মহাসমর শুরু হয়। মহাত্মা গান্ধী ১৯৪২ সালে পুনরায় অসহযোগ আন্দোলন শুরু করেন। নেতাজী সুভাষচন্দ্র দেশত্যাগ করে ব্রিটিশ সরকারকে চরম আঘাত হানবার জন্য ভারতের বাইবে গঠন করলেন স্বাধীন আজাদ্ হিন্দ্ সৈন্যদল। ব্রিটিশ সরকারের চৈতন্যোদয় হল। ১৯৪২ সালের ব্রিটিশ কোয়ালিশান সরকার স্যার স্টাফোর্ড ক্রিপস্ (*Sir Stafford Cripps*)-কে ভারতীয় নেতাদের সংগে বোঝাপাড়ার জন্য প্রেরণ করলেন।

ক্রীপস্ প্রস্তাবে ঘোষণা করা হয় যে ডমিনিয়নের সম্পূর্ণ মর্যাদা সম্পন্ন এক নতুন ভারতীয় ইউনিয়ন গঠন করাই ব্রিটিশ সরকাবের উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যকে কার্যকরী করার জন্য বলা হয় যে যুদ্ধের শেষে প্রদেশ এবং দেশীয় রাজ্যগুলি থেকে প্রতিনিধি নিয়ে ভবিষ্যতের শাসনতন্ত্র তৈরী করার জন্য একটি গণপরিষদ

ক্রিপস্ দৌত্য (Cripps Mission)

গঠিত হবে। গণপরিষদের সদস্যরা প্রাদেশিক আইনসভার সদস্যবৃন্দের দ্বারা সমানুপাতিক ভোটের ভিত্তিতে নির্বাচিত হবেন। দেশীয় রাজ্যগুলির সদস্যেরাও অনুরূপ ভাবে নির্বাচিত হবেন। দুটি শর্তসাপেক্ষে এই প্রস্তাব কার্যকরী করা হবে: প্রথমটি হচ্ছে (১) কোন প্রদেশ বা প্রদেশগুলি যদি এই ব্যবস্থায় যোগ দিতে রাজী না হয় তবে তার বর্তমান শাসনব্যবস্থা বজায় রাখতে পারবেন অথবা নিজেদের জন্য পৃথক শাসন-

ব্যবস্থা সৃষ্টি করতে পারবেন। (২) দ্বিতীয়টি হচ্ছে ধর্মীয় বা জাতিগত সংখ্যা-লঘুদের স্বার্থ রক্ষার জন্য এই পরিষদের সংগে ব্রিটিশ সরকার একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হবেন। ক্রিপস প্রস্তাবের আর একটি শর্ত হচ্ছে যুদ্ধকালীন অবস্থায় একমাত্র দেশরক্ষা ব্যবস্থা ছাড়া জাতীয় নেতৃবৃন্দ সরকার পরিচালনায় গ্রহণ কর তে পারেন।

ক্রীপস্ প্রস্তাব ভারতের কোন রাজনৈতিক দল মেনে নেয়নি। ১৯৪২ সালে আগস্টমাসে কংগ্রেস "ভারত-ছাড" (Queit India) প্রস্তাব পাস করার সংগে সংগে সরকার মহাত্মা গান্ধী ও কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটির অন্যান্য সদস্যদের বন্দী করার ফলে সারা ভারতে বিদ্রোহের বন্যা ছড়িয়ে পডল। এ সময় মুসলীম লীগও ভাগ করে এদেশ ছাড (Divide and Quit) প্রস্তাব পাস করে। ১৯৪৩ সালে লর্ড-লিন্‌লিথগোর স্থানে লর্ড-ওয়াভেল (*Lord Wavell*) ভারতের গভর্ণর জেনারেল নিযুক্ত হন। ভারতীয় নেতাদের দিয়ে গভর্ণর জেনারেলের মন্ত্রণাপরিষদ (Executive Council) গঠনের প্রস্তাব করে তিনি ভারতের শাসনব্যবস্থা সম্বন্ধে অচল অবস্থা অপসাবণের চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁর প্রস্তাব কংগ্রেস ও মুসলীম লীগ মেনে না নেওয়ায় শেষ পর্যন্ত এই প্রস্তাবকে কার্যকরী করা সম্ভব হয়নি। এই সময় গ্রেটব্রিটেনে সাধারণ নির্বাচনের পর লেবার পার্টি সরকার গঠন কবলে তাঁরা স্যার পেথিক লরেন্স, (*Sir Pethick Lawrance*), স্যাস স্টাফোর্ড ক্রীপস্ (*Sir Stafford Cripps*) ও এ, ভি, অ্যালেকজাণ্ডার (*A. V. Alexander*)-কে নতুন শাসন সংস্কারের প্রস্তাব নিয়ে ভারতে প্রেরণ করেন। কেবিনেট মিশন ভারতবর্ষের শাসনব্যবস্থা সম্বন্ধে· যে প্রস্তাব পেশ করেন তা এইরূপ :

কেবিনেট মিশান প্ল্যান
Cabinet Mission Plan

সমগ্র শাসনব্যবস্থাকে তিনটি স্তরে ভাগ করা হবে : যথা, কেন্দ্রীয় সরকার (Union Government), আঞ্চলিক সরকার (Groups of Provinces) এবং প্রাদেশিক সরকার (Provinces)। কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে মাত্র তিনটি বিষয় পরিচালনার ভার দেওয়া হবে। সেগুলি হচ্ছে : (১) দেশরক্ষা, (Defence), বৈদেশিক সংক্রান্ত ব্যাপার (Foreign Affairs) এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা (Communication)। এই বিষয়গুলি পরিচালনা করার জন্য প্রয়োজনীয় কর আরোপ করা বা অর্থ সংগ্রহের ক্ষমতা তাদের থাকবে। কেন্দ্রের একটি আইন সভা এবং একটি শাসন পরিষদ থাকবে।

এদের গঠন প্রণালী একটি গণপরিষদের দ্বারা স্থির করতে হবে। এদের এক্তিয়ারভুক্ত সমস্ত বিষয় সংখ্যাধিক্যের ভোটে গৃহীত হবে, কিন্তু কোন সাম্প্রদায়িক বিষয় সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হলে সংশ্লিষ্ট উভয় সম্প্রদায়ের সংখ্যাধিক্য থাকা প্রয়োজন।

আসাম ও বাংলা একত্রে একটি আঞ্চলিক সরকার গঠন করতে পারে, পাঞ্জাব, সিন্ধু ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ মিলে আর একটি আঞ্চলিক সরকার এবং বাকী প্রদেশগুলি আর একটি পৃথক আঞ্চলিক সরকার গঠন করতে পারে। বিভিন্ন অঞ্চল থেকে নির্বাচিত গণপরিষদের সদস্যরা নিজেদের জন্য আঞ্চলিক সরকার গঠন হবে কিনা বা তার গঠন প্রণালী এবং ক্ষমতা স্থির করবেন।

কেন্দ্রের উপর ন্যস্ত তিনটি বিষয় ছাড়া বাকী সমস্ত বিষয়, এমন কি মুদ্রা-ব্যবস্থা (Currency), সরকারী ব্যাঙ্ক ইত্যাদি প্রদেশের হাতে ন্যস্ত থাকবে। দশ বৎসর অন্তর প্রদেশগুলির সংবিধান পরিবর্তন করার অধিকার থাকবে।

কেবেনিট মিশনের প্রস্তাব অনুসারে ১৯৪৬ সালের জুলাই মাসে গণপরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। কংগ্রেস এই গণপরিষদে যোগদান করেন কিন্তু নির্বাচনের ফলাফলে হতোদ্যম হয়ে মুসলীম লীগ এই পরিষদে যোগদান করেনি। ১৯৪৬ সালের ১৩ই ডিসেম্বর তারিখে জওহরলাল নেহরু ভারতবর্ষকে একটি সার্বভৌম প্রজাতন্ত্ররূপে ঘোষণা করার এক প্রস্তাব পেশ করেন।

গণপবিষদেব অধিবেশন

মুসলীম লীগ ব্রিটিশ সরকারকে গণপরিষদ ভেঙে দেবার জন্য অনুরোধ জানাল এবং ১৯৪৬ সালের ১৬ই অগস্ট তারিখ *Direct Action* দিবস হিসেবে ঘোষণা করল। ঐদিন থেকে সারা কলকাতা, পাঞ্জাব এবং বিহারের স্থানে স্থানে হিন্দু-মুসলমান দাংগা শুরু হয়। অতঃপর ১৯৪৭ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারি তারিখে ব্রিটিশ সরকার পরিষ্কার ভাবে ঘোষণা করলেন যে, ১৯৪৮ সালেব জুন মাসের আগেই তাঁবা ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করবেন। কেবিনেট মিশনের প্রস্তাব অনুসারে যদি গণপরিষদ আগামী ভারতের সংবিধান রচনা করতে সক্ষম না হয় তাহলে ব্রিটিশ সরকার সারা ব্রিটিশ শাসিত ভারতের জন্য কোন কেন্দ্রীয় সরকারকে অথবা কোন এলাকায় প্রাদেশিক সরকারদের উপর এই ক্ষমতা অর্পণ করতে পারেন। এই ঘোষণায় উৎফুল্ল হয়ে স্বভাবতই মুসলীম লীগ একটি পৃথক গণপরিষদ দাবী করে বসলেন।

লর্ড ওয়াভেলের স্থলাভিষিক্ত হয়ে লর্ড মাউণ্টব্যাটেন ভারতের গভর্ণর জেনারেল হয়ে এসে ভারতের শাসন সংস্কার সম্বন্ধে একটি নতুন পরিকল্পনা পেশ করলেন।

তাঁর পরিকল্পনায় বলা হয় যে, সরকার গণপরিষদের কাজে বাধা দেবেন না, তবে ভারতের যদি কোন অংশ তার সংবিধান মেনে নিতে রাজী না হয় তবে তা জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হবে না। এই পরিকল্পনায় আরো বলা হয় সে বাংলা ও পাঞ্জাবের আইনসভায় মুসলমান ও হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকার সদস্যরা পৃথক পৃথক ভাবে অধিবেশন করে তাদের প্রদেশকে ভাগ করা হবে কিনা এবং বর্তমান গণপরিষদ তার সংবিধান রচনা করবেন কিনা ঠিক করবেন। সিন্ধু প্রদেশের সদস্যরা তাদের আইনসভার এক বিশেষ অধিবেশনে এই সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের সিদ্ধান্ত গণভোটের দ্বারা স্থির হবে। অনুরূপভাবে আসামের অন্তর্গত সিলেটকেও গণভোটের দ্বারা আসাম অথবা প্রস্তাবিত পূর্ববংগে যোগ দেবার স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয়। এই পরিকল্পনা হিন্দু, মুসলমান ও শিখ সম্প্রদায়ের দ্বারা গৃহীত হয়। মাউন্টব্যাটেনের পরিকল্পনা অনুসারে ১৯৪৭ সালের ১৮ই জুলাই ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট ভারতেব স্বাধীনতা সংক্রান্ত আইন (*Indian Independence Act*) পাস করে এবং ঐ সালের ১৫ই আগস্ট তারিখ ভারতবর্ষ—ভারত ও পাকিস্তান এই দুটি পৃথক রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়ে ডোমিনিয়ন রাষ্ট্র হিসেবে গণ্য হয়। উভয় ডোমিনিয়নের আইন সভার সার্বভৌমত্ব (Legislative Supremacy) স্বীকার করে নেওয়া হয়। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারগুলির উপব ব্রিটিশ সরকারের সর্বপ্রকার নিয়ন্ত্রণ তুলে নেওয়া হয়। নতুন সংবিধান রচিত না হওয়া পর্যন্ত গণপরিষদকেই কেন্দ্রীয় আইন সভা হিসেবে কাজ করার ক্ষমতা দেওয়া হয় এবং উভয় ডোমিনিয়ন ও তার প্রদেশগুলির শাসনব্যবস্থা বর্তমান স্বাধীনতা আইনের সংগে সংগতি রক্ষা করে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন অনুসারে পরিচালিত হবে। ইংলণ্ডের রাজার ভারতীয় আইনসভার বিল নাকচ করার অথবা তাঁর বিবেচনার জন্য সংরক্ষণ করার বিধান রহিত হয় এবং ডোমিনিয়ন আইনসভাগুলির প্রণীত যে কোন আইনকে রাজার নামে সম্মতি দেওয়ার অধিকার গভর্ণর জেনারেলকে দেওয়া হয়।

মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা

দেশীয় রাজ্যগুলির উপর ইংলণ্ডেব রাজাব সার্বভৌমত্বের অবলুপ্তি এবং তাদের সংগে সকল প্রকার সন্ধি চুক্তির অবসান ঘোষণা করা হয়।

ভারতীয় গণপরিষদ ১৯৪৯ সালের ২৬শে নভেম্বর তারিখ যে সংবিধান গ্রহণ করে ১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারি আনুষ্ঠানিক ভাবে তা সারা ভারতে প্রবর্তিত হয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ভারতের সংবিধানের বৈশিষ্ট্য

(Salient features of the Constitution of India)

ভারতের সংবিধান অনুশীলন করতে গিয়ে আমাদের প্রথমেই চোখে পড়ে এর আকৃতি। এই সংবিধান বোধ হয় পৃথিবীর বৃহত্তম সংবিধান। এতে প্রাথমিক অবস্থায় ৩৯৫টি অনুচ্ছেদ এবং ৮টি সিডিউল ছিল। পরবর্তী সংশোধনগুলির ফলে কতকগুলি বাদ দিয়ে এবং কতকগুলি নতুন অনুচ্ছেদ সংযুক্ত হওয়ার ফলে এতে বর্তমানে ৩৮০টি অনুচ্ছেদ এবং ৯টি তালিকা (Schedule) আছে। এদিক থেকে বিচার করলে ভারতের সংবিধানকে পৃথিবীব বৃহত্তম সংবিধান বলা যেতে পারে।

বৃহত্তম সংবিধান

ভারতের সংবিধান প্রণেতারা গ্রেটব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, আইরিস ফ্রি স্টেট, জাপান, জার্মানী প্রভৃতি রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থা থেকে উপাদান সংগ্রহ করে একে এক আদর্শ সংবিধানে রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। গ্রেটব্রিটেনেব অনুকরণে যেমন ভারতের কেন্দ্র এবং অংগ রাজ্যগুলিতে নিয়মতান্ত্রিক প্রধান সমন্বিত পার্লামেণ্ট চালিত শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছে, তেমনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনুকরণে যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রথার প্রবর্তন করে সুপ্রীমকোর্টকে সংবিধানের প্রধান রক্ষক এবং ব্যাখ্যা কর্তা হিসেবে স্থান দেওয়া হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রীয় ক্ষমতা বণ্টনের ক্ষেত্রে ১৯৩৫ সালের ভারত-শাসন আইন এবং কানাডার অনুকরণ করা হয়েছে। আয়ারল্যাণ্ডের সংবিধানের অনুকরণে 'রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশাত্মক নীতি' সংবিধানে স্থান পেয়েছে। 'মৌলিক অধিকারের' ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও জাপানের সংবিধানের প্রভাব সুস্পষ্ট।

বিভিন্ন সংবিধানেব প্রভাব

আমাদের সংবিধানের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তার যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো। ক্ষমতা বণ্টনের উদ্দেশ্যে এতে তিনটি তালিকা আছে: যথা, কেন্দ্রীয় তালিকা (Union List), রাজ্য তালিকা (State List) এবং যুগ্ম তালিকা (Concurrent List)। কেন্দ্রীয় তালিকার অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলির উপর কেন্দ্রীয় পার্লামেণ্ট আইন তৈরী করবে, রাজ্যতালিকার বিষয়গুলির উপর রাজ্য আইনসভা আইন প্রণয়ন করবে এবং যুক্ত তালিকার

অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলির উপর কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য উভয় আইনসভাই আইন প্রণয়ন করবে। এছাড়া, অন্য কোন বিষয় থাকলে (Residuary Powers) সেগুলির আইন তৈরী করবে কেন্দ্রীয় আইনসভা। জরুরী অবস্থা এবং আরও কয়েকটি বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে রাজ্যতালিকার বিষয়গুলির উপর কেন্দ্রীয় আইনসভার আইন এবং কেন্দ্র ও রাজ্য আইনসভার আইনের মধ্যে কোন অসংগতি থাকলে, রাজ্য আইনসভার আইনটুকু বাতিল হয়ে কেন্দ্রের আইনটিই বৈধ হবে বলে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, আমাদের সংবিধান যুক্তরাষ্ট্রীয় ধাঁচের হলেও, এককেন্দ্রিকতার দিকে প্রবণতাও সুস্পষ্ট। তাই ভারতের সংবিধানকে আমরা এককেন্দ্রিকতার দিকে ঝোঁক সম্পন্ন যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধান বলে আখ্যা দিতে পারি।

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য

ভারতের সংবিধানের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর ক্ষেত্রে আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এই যে, এখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অথবা সুইজারল্যাণ্ডের মত দ্বিনাগরিকত্ব স্বীকৃত হয়নি। ভারতের সংবিধানে একটিমাত্র নাগরিকত্বই স্বীকৃত হয়েছে—সেটি হচ্ছে সারা ভারতের নাগরিকত্ব।

একনাগরিকত্ব

পার্লামেণ্ট পরিচালিত শাসনব্যবস্থা ভারতের সংবিধানের আর একটি বৈশিষ্ট্য। এখানে রাষ্ট্রপতি নামে মাত্র রাষ্ট্রপ্রধান। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির মত তাঁর প্রকৃত ক্ষমতা নেই। এখানে প্রকৃত শাসনক্ষমতার অধিকারী মন্ত্রিপরিষদ, যাঁদের পার্লামেণ্টের সদস্য হতে হয় এবং যৌথভাবে পার্লামেণ্টের কাছে তাঁদের নীতি ও কার্যাবলীর জন্য দায়ী থাকতে হয়। রাষ্ট্রের শাসনক্ষমতা সংবিধানের ভাষায় রাষ্ট্রপতির উপর ন্যস্ত থাকলেও রাষ্ট্রপতিকে মন্ত্রিপরিষদের পরামর্শ অনুসারেই তাঁর কার্যনির্বাহ করতে হয়।

পার্লামেণ্ট চালিত শাসনব্যবস্থা

পার্লামেণ্ট পরিচালিত শাসনব্যবস্থার আর একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে পার্লামেণ্টই এখানে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। পার্লামেণ্ট এখানে শুধু শাসন কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ মন্ত্রিসভাকেই নিয়ন্ত্রিত করে না, যে কোন প্রকারের আইন প্রণয়ন করার ক্ষমতাও তার আছে। কিন্তু, ভারতে পার্লামেণ্ট চালিত শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হলেও, এখানে পার্লামেণ্টকে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী বলা যেতে পারে না —অন্ততঃ ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট যে অর্থে সার্বভৌম সে অর্থে নয়। কেননা আমাদের

সংবিধান লিখিত এবং যুক্তরাষ্ট্রীয়, সুতরাং লিখিত সংবিধানের বিধান অনুসারেই তাকে আইন প্রণয়ন করতে হয়। সংবিধান নির্দিষ্ট পথে তার কার্যাবলী পরিচালিত না হলে, সুপ্রীমকোর্ট তাকে অবৈধ ঘোষণা করে নাকচ করে দিতে পারে। এদিক থেকে বিচার করলে আমাদের বিচার বিভাগকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিচার বিভাগের মত ক্ষমতাশালী বলে মনে হতে পারে। কিন্তু কার্যতঃ আমাদের বিচার বিভাগ মার্কিন যুক্তবাষ্ট্রের বিচার বিভাগের মত তত ক্ষমতাশালী নয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সংবিধানের সংক্ষিপ্ততা, অস্পষ্টতা এবং বিচার বিভাগের আইনের যাথার্থ নির্ধারণে প্রচুর ক্ষমতা ইত্যাদির জন্য বিচার বিভাগ সংবিধানের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে যে পরিমাণ স্বাধীনতা ভোগ করে আমাদের বিচার বিভাগ সে পরিমাণ ক্ষমতা ভোগ করে না। সংবিধানের বিস্তৃত বিধানাবলী এবং ক্ষেত্রবিশেষে বিচারালয়ে ক্ষমতা সংকোচনের ফলে আমাদের বিচার বিভাগের ক্ষমতা কিছুটা সীমিত। এই সব দিক বিচার করে আমরা বলতে পারি আমাদের পার্লামেণ্ট যেমন গ্রেটব্রিটেনের পার্লামেণ্টের মত সর্বশক্তিমান নয় তেমনি আবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসের মত তার বিচার বিভাগের উপর নির্ভরশীলও নয়।

আমাদের সংবিধানের সংশোধন পদ্ধতিও বৈচিত্র্যপূর্ণ। গ্রেটব্রিটেনের সংবিধানের মত আমাদের সংবিধানের পরিবর্তন সহজসাধ্য নয়, আবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত কষ্টসাধ্যও নয়। প্রকৃতপক্ষে আমাদের সংবিধানকে আমরা কিছুটা সুপরিবর্তনীয় এবং কিছুটা দুষ্পরিবর্তনীয় বলে অভিহিত করতে পারি। কতকগুলি বিশেষ অনুচ্ছেদ, যেমন—রাজ্যের নাম, সীমানা ইত্যাদির পরিবর্তন, রাজ্য আইনসভার উচ্চতর কক্ষের সৃষ্টি অথবা অপসারণ ইত্যাদি বিষয়গুলি পার্লামেণ্ট সাধারণ আইনের মত সাধারণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সংশোধন করতে পারে। এক্ষেত্রে আমাদের সংবিধান স্পষ্টতই সুপরিবর্তনীয়। আবার এমন কতকগুলি বিষয় আছে, কেন্দ্র ও অংগরাজ্যগুলির মধ্যে আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত ক্ষমতার বণ্টন, রাজ্যগুলির তরফ থেকে পার্লামেণ্টে প্রতিনিধিত্ব প্রভৃতি বিষয়গুলি সংশোধনের জন্য রাজ্য আইনসভাগুলির অর্ধেকের অনুমোদন প্রয়োজন। প্রসংগক্রমে উল্লেখযোগ্য যে এ সমস্ত ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অংগরাজ্যগুলির তিন চতুর্থাংশের অনুমোদন প্রয়োজন হয়। সংবিধানের অন্যান্য অধিকাংশ অনুচ্ছেদগুলির সংশোধনের

আমাদের সংবিধান কিছুটা দুষ্পরিবর্তনীয় এবং কিছুটা সুপরিবর্তনীয়

জন্য কেন্দ্রীয় আইন সভায় যে কোন কক্ষ প্রস্তাব আনতে পারে। তবে তার জন্য উক্ত কক্ষের মোট সদস্য সংখ্যার সংখ্যাধিক্য এবং উপস্থিত ভোটদানকারী সদস্যের দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যক সদস্যের সমর্থনে সেটি পাস হওয়া দরকার। সংবিধানের সংশোধন বিষয়ক এই বিভিন্ন প্রকার পদ্ধতিগুলি লক্ষ্য করে আমরা আমাদের সংবিধানকে কিছুটা সুপরিবর্তনীয় এবং কিছুটা দুষ্পরিবর্তনীয় বলে গণ্য করতে পারি।

মৌলিক অধিকার

ভারতের লিখিত সংবিধানের তৃতীয় অধ্যায়ে কতকগুলি মৌলিক অধিকার লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। সংবিধান বর্ণিত এই মৌলিক অধিকারগুলির বৈশিষ্ট্য এই যে, এখানে রাষ্ট্রের নিরাপত্তা এবং নাগরিক অধিকার—এই উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করা হয়েছে। মৌলিক অধিকার সংরক্ষণের দায়িত্ব নিয়ন্ত্রণ-বিহীন অবস্থায় বিচার বিভাগের হাতে সম্পূর্ণভাবে ছেড়ে দিলে অনেক সময় রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ হবার সম্ভাবনা থেকে যায়। আমাদের সংবিধান প্রণেতারা এই সম্ভাবনা সম্বন্ধে অবহিত হয়ে মৌলিক অধিকারগুলিকে যথাসম্ভব আইনসভার নিয়ন্ত্রণাধীন করে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তাকে সুরক্ষিত করার চেষ্টা করেছেন।

রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশাত্মক নীতি

সংবিধানের চতুর্থ অধ্যায়ে বর্ণিত 'রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশাত্মক নীতিগুলি' (Directive Principles of State Policy) ভারতের সংবিধানের আর এক বৈচিত্র্য। আয়ারল্যাণ্ডের সংবিধানের অনুকরণে আমাদের সংবিধানে লিপিবদ্ধ এই বিবরণগুলিতে এক বিশেষ অর্থনৈতিক, সমাজনৈতিক এবং রাজনৈতিক আদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে আগামী দিনের রাষ্ট্রকে গড়ে তোলার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করা হয়েছে। সংবিধানের তৃতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত মৌলিক অধিকারগুলির সংগে এই নির্দেশাত্মক নীতিগুলির পার্থক্য এই যে, মৌলিক অধিকার ভংগ হয়েছে মনে করলে যে কোন ব্যক্তি আদালতে নালিশ করতে পারে এবং সে ক্ষেত্রে সুপ্রীমকোর্ট অথবা হাইকোর্ট তার প্রতিকারকল্পে হেভিয়াসকর্পাস, ম্যানডামাস প্রভৃতি আদেশনামা জারী করতে পারে। কিন্তু রাষ্ট্র পরিচালনার কোন নীতি ভংগ হয়েছে বা প্রযুক্ত হয়নি—এই কারণে আদালতে নালিশ করা চলবে না।

তৃতীয় অধ্যায়

প্রস্তাবনা

(Preamble)

সংবিধানের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে তাব প্রস্তাবনা। সংবিধানের মূল নীতি এবং আদর্শ সাধারণতঃ সংক্ষিপ্ত আকারে প্রস্তাবনার মধ্যে লিপিবদ্ধ থাকে। তাই সংবিধানের কোন বিশেষ অংশের অর্থ যদি অস্পষ্ট বা দ্ব্যর্থবোধক মনে হয় তবে প্রস্তাবনার সাহায্যেই তার স্বরূপ উদ্ঘাটনের চেষ্টা করা হয়। বস্তুতঃ, সংবিধান প্রণেতাদের মূল লক্ষ্য ও আদর্শটি প্রস্তাবনার মধ্যেই ফুটে ওঠে। এটি যেন সংবিধান প্রণেতাদের মনোরাজ্যের চাবিকাঠি। তাই কোন এক সংবিধানের বিস্তারিত অধ্যয়নেব আগে তার প্রস্তাবনার বিশেষত্ব ও তাৎপর্যগুলি আলোচনা করা দরকার।

ভারতের সংবিধানে প্রস্তাবনা এইভাবে শুরু হয়েছে :

WE, THE PEOPLE OF INDIA, having solemnly resolved to constitute India into a SOVEREIGN DEMOCRATIC REPUBLIC and to secure to all citizens :

"JUSTIC, Social, economic and political ,

LIBERTY of thought, expression, belief, faith and worship ,

EQUALITY of status and of opportunity ,

and to promote among them all

FRATERNITY assuring the dignity of the individual and the unity of the nation ,

IN OUR CONSTITUENT ASSEMBLY this twenty-sixth day of November, 1949, do HEREBY ADOPT, ENACT AND GIVE TO OURSELVES THIS CONSTITUTION.

প্রথমেই আমরা 'আমরা ভারতের জনগণ' এই কথাগুলির উপর নজর না দিয়ে পারি না। ১৭৯৩ সালের নর্থের রেগুলেটিং অ্যাক্ট (North's Regulating Act) থেকে শুরু করে ১৯৪৭ সালে ভারতের স্বাধীনতা আইন

পর্যন্ত ভারতের শাসনব্যবস্থা সংক্রান্ত সমস্ত আইনগুলি এক বিদেশী সংস্থা অর্থাৎ ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের সৃষ্ট। কিন্তু বর্তমান সংবিধান কোন বিদেশী সংস্থার সৃষ্ট নয়। আমরা ভারতের জনগণ নিজেদের জন্য এই সংবিধান তৈরী করেছি। তবে এই প্রসংগে একটি প্রশ্ন ওঠে, বর্তমান সংবিধান প্রণেতা গণপরিষদের সদস্যদের জনগণের নামে সংবিধান প্রণয়নের কোন অধিকার আছে কি না। প্রকৃতপক্ষে, গণপরিষদের সদস্যরা ভারতবর্ষের জনগণের দ্বারা প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত হননি। ১৯৩৫ সালের ভারত-শাসন আইনের দ্বারা সৃষ্ট প্রাদেশিক আইনসভাগুলির দ্বারা তাঁরা অপ্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত। তাছাড়া, তখন প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের দাবী স্বীকৃত না হওয়ায়, প্রাদেশিক আইনসভার সদস্যরাও সমগ্র জনসাধারণের প্রতিনিধিত্ব দাবী করতে পারেন না। এই সব দিক বিচার করে গণপরিষদের সদস্যদের দ্বারা ভারতবর্ষের সংবিধান প্রণয়নের বৈধতা বিচার-সাপেক্ষ সন্দেহ নেই। তবে আমাদের স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে তদানীন্তন রাজনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আশু সংবিধান প্রণয়নের কাজে গণপরিষদের সদস্যদের প্রাদেশিক আইনসভাগুলি দ্বারা অপ্রত্যক্ষ ভাবে নির্বাচিত করা ভিন্ন গত্যন্তর ছিল না। তাছাড়া, বর্তমান সংবিধান অনুসারে বিগত সাধারণ নির্বাচনগুলিতে জনসাধারণ এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলির অংশগ্রহণের মধ্যেও জনসাধারণ কর্তৃক বর্তমান সংবিধানের সুস্পষ্ট স্বীকৃতি প্রকাশিত হয়েছে। এই নির্বাচনগুলির মাধ্যমে আমরা যাঁদের উপর রাষ্ট্র পরিচালনার গুরুদায়িত্ব তুলে দিয়েছি, সংবিধান মুখ্যতঃ তাঁদেরই সৃষ্টি। সুতরাং সংবিধান প্রণয়নের আইনসংগত এবং নৈতিক অধিকার তাঁদের নেই—একথা আমরা মেনে নিতে পারি না।

গণপরিষদের সদস্যদের সংবিধান প্রণয়নের বৈধতা

প্রস্তাবনায় ভারতবর্ষকে একটি সার্বভৌম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। সার্বভৌম, গণতান্ত্রিক এবং প্রজাতন্ত্র—এই প্রত্যেকটি শব্দই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সমগ্র শাসনব্যবস্থার আকারগত বৈশিষ্ট্যটি এই কথাগুলির মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। প্রায় দুই শতাব্দীর বিদেশী শাসনের অবসানের পর এই কথা কয়টি যেন জাতির জীবনে নব অধ্যায়ের সূচনা করে। সার্বভৌম অর্থে, ভারত রাষ্ট্র হিসেবে বিদেশী শক্তির নিয়ন্ত্রণমুক্ত। যে ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট এতদিন পর্যন্ত ভারতবর্ষের শাসনব্যবস্থায় চূড়ান্ত নিয়ন্ত্রণকর্তা ছিল, সংবিধানের এই সুস্পষ্ট এবং বলিষ্ঠ

সার্বভৌম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র

শব্দটি যেন সেই কর্তৃত্বের পরিসমাপ্তি ঘোষণা করল। ভারত এখন হতে সম্পূর্ণ স্বাধীন—যে কোন বহিঃশক্তির নিয়ন্ত্রণ থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত।

দ্বিতীয়তঃ, ভারতবর্ষ একটি গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র। 'গণতন্ত্র' এবং 'প্রজাতন্ত্র' শব্দ দুটি সমার্থবোধক বলে মনে হয়। তবে ল্যাটিন আমেরিকার কয়েকটি রাষ্ট্রের মত অনেক তথাকথিত প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র আমরা দেখেছি যেগুলিকে আমরা প্রকৃতপক্ষে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা বলতে পারি না। এই দিক থেকে বিচার করলে আমাদের সংবিধান প্রণেতাদের দ্বারা প্রজাতান্ত্রিক শব্দটির সাথে গণতান্ত্রিক শব্দটির সংযোজন যুক্তিযুক্ত বলেই মনে হয়। ভারতের 'রাষ্ট্রপতি' জনসাধারণের নির্বাচিত রাষ্ট্রপ্রধান তো বটেই, উপরন্তু শাসনকার্য পরিচালনার প্রকৃত দায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছে মন্ত্রিপরিষদের হাতে যাঁরা জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধি এবং তাঁদের ক্ষমতায় অধিষ্ঠান জনপ্রতিনিধিমূলক সংস্থা পার্লামেণ্টের আস্থাভাজন হওয়ার উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল।

তাছাড়া, সংবিধানে প্রস্তাবনা এবং চতুর্থ পরিচ্ছেদে উল্লিখিত রাষ্ট্রনৈতিক আদর্শগুলির পরিপ্রেক্ষিতে গণতান্ত্রিক (Democratic) শব্দটির ব্যবহার যুক্তিযুক্ত বলেই মনে হয়। গণতন্ত্র বলতে শুধুমাত্র রাজনৈতিক গণতন্ত্রকেই বুঝায় না, অর্থনৈতিক সমতা এবং বৈষম্যহীন সমাজব্যবস্থাও গণতন্ত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। (১) সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ন্যায় বিচার, (২) চিন্তা, বাক্য, বিশ্বাস এবং ধর্মের স্বাধীনতা, (৩) মর্যাদা এবং সুযোগ-সুবিধার ক্ষমতা এবং (৪) ব্যক্তির মর্যাদা ও জাতীয় সংহতি রক্ষা কল্পে ভারতীয় নাগরিকদের মধ্যে সৌভাতৃত্ব বর্তমান সংবিধানের লক্ষ্য বলে প্রস্তাবনায় উল্লেখ করা হয়েছে। এই সমস্ত মহৎ আদর্শগুলি গণতন্ত্রেরই অংগ। প্রকৃত পক্ষে এদের বাদ দিয়ে গণতন্ত্রের কথা কল্পনা করা যায় না। এদিক থেকে চিন্তা করলে আমরা প্রজাতন্ত্র শব্দটির পূর্বে গণতন্ত্র শব্দটি প্রয়োগের যাথার্থ উপলব্ধি করতে পারি।

১৯৪৯ সালে এপ্রিল মাসে কমন্‌ওয়েলথ প্রধানমন্ত্রীদের সম্মেলনে ভারতবর্ষ কমনওয়েলথের সদস্য হবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এই সিদ্ধান্তের ফলে ভারতবর্ষের সার্বভৌমত্ব এবং প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রাদর্শ ক্ষুণ্ণ হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন। কিন্তু একটু প্রনিধান করলে দেখা যাবে যে, কমনওয়েলথের সদস্যভুক্ত হওয়ায় ভারতের রাষ্ট্র হিসেবে সার্বভৌমত্ব আদৌ ক্ষুণ্ণ হয়নি। বর্তমান সংবিধানের প্রস্তাবনায় ভারতবর্ষকে একটি সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র বলে

অ্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে এবং পূর্বোক্ত কমনওয়েলথ প্রধানমন্ত্রী সম্মেলনে ভারতের এই সার্বভৌম রাষ্ট্রীয় মর্যাদাকে কোন ক্রমেই খর্ব করা হয়নি। উক্ত সম্মেলনে রাজাকে কমনওয়েলথ সদস্যভুক্ত জাতির স্বেচ্ছায় এবং স্বাধীন-ভাবে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রতীক হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে ("Symbol of the free association of its independent member nations.") এবং সেই অর্থে রাজা বা রাণী কমনওয়েলথের প্রধান। এখানে রাজার প্রতি আনুগত্যের কোন প্রশ্নই ওঠে না।

সর্দার প্যাটেল ১৯৪৯ সালে ২৮শে এপ্রিল তারিখে এক সাংবাদিক সম্মেলনে যথার্থই বলেছেন—"সার্বভৌম এবং স্বাধীন প্রজাতন্ত্র হিসেবে—ভারতের মর্যাদা কোন ক্রমেই ক্ষুণ্ণ হয়নি। কারণ এতে রাজার প্রতি আনুগত্য জ্ঞাপনের কোন প্রশ্নই ওঠে না, রাজা শুধু কমনওয়েলথ সদস্যদের স্বাধীনভাবে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রতীক হিসেবে কাজ করবেন ("India's status as a sovereign independent Republic is, by no means, affected, because there is no question of allegiance to His Majesty the king who will merely remain a symbol of our free association as he would be of other members.")। শ্রীনেহেরু কমনওয়েলথ চুক্তির সমর্থনে ১৯৪৯ সালের ১০ই মে তারিখে এক বেতার বক্তৃতায় বলেছেন, "আমাদের অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে যে কমনওয়েলথ কোন super-state নয়। আমরা রাজাকে আমাদের স্বাধীনভাবে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার নামে মাত্র প্রধান হওয়ার প্রতীক হিসেবে গণ্য করেছি। কিন্তু সেই পদ মর্যাদার জন্য কমনওয়েলথে রাজার কোন কাজ নেই। ভারতের সংবিধানেও রাজার কোন স্থান নেই এবং আমরা তাঁর প্রতি আনুগত্যও জ্ঞাপন করব না ("It must be remembered that the Commonwealth is not super-state in any sense of the term. We have agreed to consider the king as the symbolic head of this free association. But the king has no function attached to that status in the Commonwealth. So far as the constitution of India is concerned, the king has no place and we shall owe no allegiance to him.")। বস্তুতঃ, ভারতের সাংবিধানিক, আভ্যন্তরীণ অথবা বৈদেশিক সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ণ হতে পারে এমন কোন

চুক্তি কমনওয়েলথ সম্মেলনে করা হয়নি। তাই এই চুক্তির ফলে ভারতের রাষ্ট্রীয় মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়েছে—এরূপ মনে করার কোন সংগত কারণ নেই।

তবে এই চুক্তির ফলে ভারতের ক্ষেত্রে একটি বিরাট বৈষম্যের কথা আমরা উল্লেখ না করে পারি না। কমনওয়েলথ চুক্তিমত রাজাকে "কমনওয়েলথের প্রধান" ("Head of Commonwealth") বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আমাদের সংবিধানেও ভারতকে প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রধান হিসেবে আমরা রাষ্ট্রপতিকেই গণ্য করব। তাই প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রে এমন কোন সংস্থা বা শক্তি গোষ্ঠীর সংগে একত্রিভূত হতে পারে না যেখানে নাকি অন্য একজন রাজাকে প্রধান হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। কমনওয়েলথ সদস্যভুক্ত অস্ট্রেলিয়া, কানাডা প্রভৃতি অন্যান্য রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে এই প্রশ্ন ওঠে না। কারণ তারা কেউই প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র নয়। ১৯৩১ সালে Statute of Westminister অনুসারে তারা সকলেই রাজার প্রতি আনুগত্যের বন্ধনে ঐক্যবদ্ধ। কিন্তু ভারতের ক্ষেত্রে এই প্রশ্ন ওঠে না। জেনারেল স্মাট্স্ (*Genaral Smuts*) যথার্থ-ই বলেছেন যে, কমনওয়েলথ সদস্য পদ এবং প্রজাতান্ত্রিক অবস্থা স্পষ্টতই অসংগতিপূর্ণ।

এই অসংগতিপূর্ণ অংশটুকুর কথা বাদ দিলে ভারতের স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে কমনওয়েলথের সদস্যভুক্তি যুক্তিযুক্ত বলেই বিবেচিত হয়। স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে ভারত যে কোন সময় কমনওয়েলথ থেকে বেরিয়ে আসতে পারে। স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ না করে অন্যের সংগে ঐক্যবদ্ধ হলে লাভ ছাড়া লোকসানের কিছু নেই। ভারত তার স্বাধীন অস্তিত্ব বজায় রাখতে চায় কিন্তু 'একক' হয়ে থাকতে চায় না। সাধারণ সুযোগ-সুবিধা এবং বন্ধুত্বের বন্ধনে অন্য রাষ্ট্রের সংগে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার অর্থ কোন শক্তি জোটে (Power Block) যোগ দেওয়া বা সন্ধি চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়া নয়। কমনওয়েলথের সদস্যভুক্ত হয়েও জোট নিরপেক্ষ বৈদেশিক নীতি অনুসরণের মধ্যেই তার সত্যতা প্রমাণিত হয়।

চতুর্থ অধ্যায়

ভারতীয় ইউনিয়নের এলাকা

(Territories of Indian Union)

১৯৪৭ সালের ১৫ই অগস্টের পূর্ব পর্যন্ত ভারতের এলাকা বলতে ব্রিটিশ শাসিত প্রদেশ, চীফ কমিশনারের প্রদেশ এবং দেশীয় রাজ্যগুলিকে বোঝাত। বর্তমানের মূল সংবিধানে প্রথম তপশীলে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অংগরাজ্যগুলিকে প্রথম ভাগ (Part—A), দ্বিতীয় ভাগ (Part—B), তৃতীয় ভাগ (Part—C), এবং চতুর্থ ভাগ (Part—D)—এই চারিটি ভাগে ভাগ করা হয়।

প্রথম ভাগে ছিল—অন্ধ্র, আসাম, বিহার, বোম্বাই, মধ্যপ্রদেশে, মাদ্রাজ, উড়িষ্যা, পূর্ব পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ ও পশ্চিম বাংলা। দ্বিতীয় ভাগে ছিল—হায়দ্রাবাদ, জম্মু ও কাশ্মীর, মধ্যপ্রদেশ, মধ্যভারত, মহীশূর, পাতিয়ালা ও পূর্বপাঞ্জাব রাজ্য সমবায়, রাজস্থান, সৌরাষ্ট্র, ত্রিবাঙ্কুর ও কোচিন। তৃতীয় ভাগে ছিল--আজমীর, ভূপাল, দিল্লী, হিমাচল প্রদেশ, কচ্ছ, মণিপুর, ত্রিপুরা, বিন্ধ্যাচল। চতুর্থ ভাগে ছিল—আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ। প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগে বর্ণিত রাজ্যগুলি সমান ক্ষমতার অধিকারী ছিল। তবে রাষ্ট্রপতিকে সংবিধান প্রবর্তনের ১০ বৎসর পর্যন্ত—দ্বিতীয় ভাগের রাজ্যগুলির উপর কর্তৃত্ব করতে দেওয়া হয়। তাছাড়া, দ্বিতীয় ভাগের রাজ্যগুলির প্রধানকে রাজপ্রমুখ বলা হত। তৃতীয় ও চতুর্থ ভাগের রাজ্যগুলি কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক শাসিত এলাকা। ১৯৫২ সালে তেলেগু ভাষাভাষিরা নিজেদের জন্য স্বতন্ত্র প্রদেশের দাবীতে আন্দোলন শুরু করলে—১৯৫৩ সালের অক্টোবর মাসে ভারত সরকার কর্তৃক নতুন অন্ধ্রপ্রদেশ গঠিত হয়। একটা পৃথক অংগরাজ্য হিসেবে অন্ধ্রপ্রদেশের জন্মের পর ভাষার ভিত্তিতে রাজ্য পুনর্গঠনের জন্য সারা ভারতের বিভিন্ন স্থানে আলোড়ন শুরু হয়। এই আন্দোলনের দাবীকে উপেক্ষা করতে না পেরে সরকার ১৯৫৩ সালের ২৯শে ডিসেম্বর তারিখে একটি রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন নিয়োগ করেন। সৈয়দ ফজল আলী, শ্রীহৃদয়নাথ কুঞ্জরু এবং শ্রী কে. এম. পাণিক্কর এই কমিশনের সদস্য

ছিলেন। এই কমিশন ভারতের বিভিন্ন এলাকা পরিভ্রমণ করে অভিমত সংগ্রহ করেন এবং রাজ্য পুনর্গঠন সম্বন্ধে ১৯৫৫ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর তারিখে সরকারের নিকট তাঁদের বিবরণ পেশ করেন। এই কমিশনের সুপারিশগুলি নিম্নলিখিত রূপ :

(১) মূল সংবিধানে বর্ণিত অংগরাজ্যগুলির শ্রেণীবিভাগ তুলে দিতে হবে।

(২) দ্বিতীয় ভাগে বর্ণিত রাজ্যগুলিকে প্রথম ভাগে বর্ণিত রাজ্যগুলির সংগে সমপর্যায়ভুক্ত করতে হবে এবং রাজপ্রমুখের পদ তুলে দিতে হবে।

(৩) ভাবতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অংগবাজ্যগুলির দুটি শ্রেণী থাকবে ; যথা—(ক) রাজ্য, (খ) কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল। অন্ধ্র, আসাম, বিহার, বোম্বাই, হায়দ্রাবাদ, জম্মু ও কাশ্মীব, কর্ণাটক্, কেরালা, মাদ্রাজ, মধ্যপ্রদেশ, উড়িষ্যা, পাঞ্জাব, রাজস্থান, উত্তর প্রদেশ, বিদর্ভ এবং পশ্চিম বাংলা—এই ষোলটি হবে রাজ্য এবং দিল্লী, মণিপুর এবং আন্দামান্ ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ—এই তিনটি হবে কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চল। রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে সরকার ১৯৫৬ সালের রাজ্যপুনর্গঠন বিলের খসড়া কবে সেটি বিভিন্ন অংগরাজ্যে আইন সভাগুলির মতামতের জন্য প্রেরণ করেন। ১৯৫৬ সালের ৩১শে অগস্ট তারিখে এই বিলটি পার্লামেণ্ট কর্তৃক আইনে পরিণত হয়। ১৯৫৬ সালের ১৫ই নভেম্বর তারিখে এই আইনটিকে কার্যকরী করা হয়। এই আইনের মূল বৈশিষ্ট্য হচ্ছে মূল সংবিধানে উল্লিখিত অংগরাজ্যগুলির বিভিন্ন শ্রেণীবিভাগ তুলে দিযে ভারতীয় যুক্তবাষ্ট্রকে মাত্র দুই শ্রেণীর রাজ্য নিয়ে গঠিত করা হয়। যথা—(১) ১৪টি রাজ্য (States) এবং (২) ৬টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল (Union Territories)। প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগে বর্ণিত রাজ্যগুলিকে সমপর্যায়ভুক্ত করে সকল রাজ্যে রাজ্যপাল নিয়োগের ব্যবস্থা করা হয। এই আইন রাজ্যপুনর্গঠন কমিশনেব সুপারিশকে মোটামুটি মেনে নিলেও কয়েকটি বিষয়ে সরকার তার নিজস্ব সিদ্ধান্তকে এই আইনের মধ্যে রূপ দেন। যেমন—বিদর্ভ ও কর্ণাটক রাজ্যস্থাপন না করে—তাঁরা হায়দ্রাবাদ রাজ্যকে ভাষাভিত্তিতে তিনভাগে ভাগ করে বোম্বাই, মহীশূর এবং অন্ধ্ররাজ্যের সংগে যোগ করে দিলেন। মধ্যপ্রদেশের বিদর্ভ এলাকা এবং সৌরাষ্ট্র ও কচ্ছকে বোম্বাই-এর সংগে যোগ করে দেওয়া হল। হায়দ্রাবাদের মারাঠী ভাষাভাষি এলাকা—বিদর্ভ, সৌরাষ্ট্র ও কচ্ছ এবং কানাড়া ভাষাভাষি অঞ্চল বাদে তার নিজস্ব এলাকা নিয়ে বোম্বাইকে এক বৃহৎ রাজ্যে পরিণত করা হল। মাদ্রাজের

অন্তর্গত মালাবার জেলার অধিকাংশ এলাকাকে ত্রিবাঙ্কুর ও কোচিনের সংগে যোগ দিয়ে নতুন কেরল রাজ্য গঠন করা হল। ভূপাল, মধ্যভারত ও বিন্ধ্যপ্রদেশকে মধ্যপ্রদেশের সংগে যোগ করে দেওয়া হল। পেপ্সুকে পাঞ্জাবের অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং বিহারের মানভূম ও পুর্ণিয়া জেলার কিয়দংশ ও কুচবিহারকে পশ্চিম বাংলার সংগে যোগ করে দেওয়া হয়। এই আইনের পরিপ্রেক্ষিতে সংবিধানের প্রয়োজনীয় সংশোধন সাধন কল্পে ১৯৫৬ সালের সংবিধান—সংশোধন আইন [The Constitution (seventh amendment) Act, 1956] পাস করা হয়। পূর্বোক্ত বিহার থেকে পশ্চিম বাংলায় এলাকা হস্তান্তরের জন্য বিহার এবং পশ্চিমবাংলা এলাকা পরিবর্তন আইন [Bihar & West Bengal (Transfer of Territories) Act, 1956]-ও পাস করা হয়।

সংবিধান সংশোধনী আইনের ফলে বোম্বাই ভারতের বৃহত্তম অংগরাজ্যে পরিণত হয়। বোম্বাই-এর গুজরাট এবং মারাটা ভাষাভাষি এলাকার লোকেরা তাদের নিজেদের জন্য পৃথক রাজ্য দাবী করে তুমুল আন্দোলন শুরু করে। শ্রীচিন্তামন দেশমুখ এই দাবীর সমর্থনে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করলেন। এই আন্দোলনের ফলে ১৯৬০ সালে বোম্বাই পুনর্গঠন আইনের (Bombay Reorganisation Act, 1960) দ্বারা বোম্বাই রাজ্যকে গুজরাট এবং মহারাষ্ট্র এই দুটি পৃথক রাজ্যে পরিণত করা হয়। সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনের দ্বারা নাগাল্যাণ্ড গঠিত হয় এবং চতুর্দশ সংশোধনের দ্বারা পণ্ডিচেরী এবং গোয়া, দমন, দিউকে দুটি স্বতন্ত্র কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলরূপে পুনর্গঠিত করা হয়।

বর্তমানে সংবিধানে প্রথম সিডিউলে নিম্নলিখিত ষোলটি রাজ্য এবং নয়টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল আছে।

রাজ্যগুলি (The States) হচ্ছে : (১) অন্ধ্রপ্রদেশ, ২) আসাম, (৩) বিহার (৪) গুজরাট, (৫) কেরালা, (৬, মধ্যপ্রদেশ, (৭) মাদ্রাজ, (৮) মহারাষ্ট্র (৯) মহীশূর, (১০) উড়িষ্যা, (১১) পাঞ্জাব, (১২) রাজস্থান, (১৩) উত্তরপ্রদেশ, (১৪) পশ্চিম বাংলা, (১৫) জম্মু ও কাশ্মীর, (১৬) নাগাল্যাণ্ড।

কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল (Union Territories) হচ্ছে : (১) দিল্লী, (২) হিমাচলপ্রদেশ, (৩) মণিপুর, (৪) ত্রিপুরা, (৫) আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ (৬) লাক্কা দ্বীপ, মিনিকয় এবং আমিনি দিবি দ্বীপপুঞ্জ, (৭) দাদরা ও নগর হাভেলি, (৮) গোয়া, দমন, দিউ, (৯) পণ্ডিচেরী।

পঞ্চম অধ্যায়

নাগরিকত্ব

(Citizenship)

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থায় সাধারণতঃ দু' প্রকার নাগরিক অধিকার থাকে—কেন্দ্র এবং অংগরাজ্যগুলির নাগরিকত্ব। ভারতের ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম হয়েছে। ভারতের নাগরিকত্ব একটি এবং সেটি হচ্ছে ভারতীয় ইউনিয়নের নাগরিকত্ব। সংশ্লিষ্ট অংগরাজ্যগুলির কোন নাগরিকত্ব নেই। রাষ্ট্রের সংহতি, জাতীয় ঐক্য এবং কেন্দ্রীয় সরকারকে শক্তিশালী করার প্রয়োজনীয়তায় এই ব্যবস্থার যৌক্তিকতা অবশ্যই স্বীকার করে নিতে হয়।

সংবিধান চালু হওয়ার দিন থেকে কারা ভারতের নাগরিক বলে গণ্য হবেন তা সংবিধানের ৫ থেকে ১০ অনুচ্ছেদের বিধানে উল্লেখ আছে। সংবিধান চালু হওয়ার দিন থেকে যে সমস্ত অধিবাসী (১) ভারতীয় এলাকার মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছে, (২) যে সকল ব্যক্তির মা-বাবা ভারতীয় এলাকায় জন্মগ্রহণ করেছেন এবং (৩) যারা ঐ তারিখের অব্যবহিত পূর্বে অন্ততঃ পক্ষে—পাঁচ বৎসরকাল ভারতীয় এলাকায় বাস করছে, তাঁরাই ভারতের নাগরিক বলে গণ্য হবেন।

এই শ্রেণীর লোক ছাড়া, আরোও দুই শ্রেণীর লোকদের নাগরিকত্বের কথা বলা হয়েছে। এঁরা হচ্ছেন: (১) পাকিস্থান থেকে ভারতীয় এলাকায় আগত ব্যক্তিরা এবং (২) ভারতের বাইরে বসবাসকারী মূলতঃ ভারতীয় ব্যক্তিরা। পাকিস্থান থেকে আগত ব্যক্তিদের মোটামুটি দু' শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে, যথা –(১ যাঁরা ১৯৪৮ সালের ১৯শে জুলাইয়ের আগে ভারতে এসেছেন এবং (২) যাঁরা ঐদিন অথবা তারপরে ভারতে এসেছেন। ১৯৪৮সালের ১৯শে জুলাইয়ের আগে যাঁরা ভারতে এসেছেন তাঁরা অথবা 'তাঁদের মা-বাবা' অথবা তাঁদের পিতামহ বা পিতামহী যদি অবিভক্ত ভারতে জন্মগ্রহণ করেন এবং সেই সময় থেকে মোটামুটি ভাবে এখানে বাস করেন তবে তাঁদের ভারতীয় নাগরিক বলে গণ্য করা হবে। ১৯৪৮ সালের ১৯শে জুলাই অথবা তার পরে যাঁরা ভারতে এসেছেন (১) তাঁরা অথবা তাঁদের মা-বাবা অথবা তাঁদের পিতামহ অথবা পিতামহী যদি অবিভক্ত ভারতে জন্মগ্রহণ করেন এবং

(২) ভারত সরকার কর্তৃক নিযুক্ত অফিসারের কাছে নাম রেজেস্ট্রী করে থাকেন তবে তাঁকে ভারতীয় নাগরিক বলে গণ্য করা হবে। অবশ্য তার আগে দরখাস্তকারী দরখাস্তের তারিখ পর্যন্ত অন্ততঃ ছয় মাস ভারতীয় এলাকাতে বসবাস করেছেন, তা উক্ত কর্মচারীর কাছে প্রতিপন্ন করতে হবে। এখানে লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, এই বিধান অনুসারে ১৯৪৯ সালের ২৫শে জুলাই অথবা তারপরে যাঁরা ভারতে এসেছেন তাঁরা ভারতের নাগরিক বলে দাবী করতে পারবেন না। স্পষ্টতঃই এই শ্রেণীব ব্যক্তিদের ভারতীয় নাগরিকত্ব লাভ করতে হলে পার্লামেণ্ট প্রণীত কোন আইনের বলেই তা পেতে হবে। এই প্রসংগে উল্লেখযোগ্য যে, সংবিধান ১১ অনুচ্ছেদে পার্লামেণ্টকে নাগরিক অধিকার নিয়ন্ত্রণ কল্পে আইন প্রণয়ন করার ক্ষমতা দিয়েছে। এই ক্ষমতার বলে পার্লামেণ্ট ১৯৫৫ সালে নাগরিকত্ব আইন (Citizenship Act, 1955) পাস করে। সংবিধান চালু হওয়ার পর কিভাবে ভারতীয় নাগরিকত্ব লাভ করা যেতে পারে সে সম্বন্ধে নিয়মাবলী এই আইনে লিপিবদ্ধ হয়েছে।

১৯৪৭ সালেব ১লা মার্চের পর যাঁরা ভারতীয় ভূখণ্ড পরিত্যাগ করে পাকিস্থানে চলে যাবেন তাঁদেব নাগবিক বলে গণ্য কবা হবে না। অবশ্য ঐ তারিখের পর পাকিস্থানে গিয়ে যদি কেউ ভারতে ফিরে আসতে চায়, তাহলে এখানে বাস করার জন্য পারমিট বা অনুমোদন পত্র নিয়ে এলে তাদের নাগরিকত্ব দেওয়া হবে।

ভারতের বাইরে যাঁরা বসবাস করছেন তাঁরা অথবা তাঁদের মা-বাবা অথবা পিতামহ বা পিতামহী যদি অবিভক্ত ভারতে বাস করতেন এবং তাঁদের অবস্থিতির স্থানে ভারতীয় দূতাবাসে যদি তাঁদেব নাম নাগরিক হিসেবে রেজেস্ট্রীকৃত হয় তাহলে তাঁদের ভারতীয় নাগরিক হিসেবে গণ্য করা যাবে।

সংবিধান ১১ অনুচ্ছেদে পার্লামেণ্টকে নাগরিকত্ব সম্বন্ধে আইনপ্রণয়ন করায় যে অধিকার দেয় সেই অধিকার বলে পার্লামেণ্ট ১৯৫৫ সালের নাগরিকত্ব আইনটি (Citizenship Act, 1955) বিধিবদ্ধ করে। এই আইনে ১৯৫০ সনের ২৬শে জানুয়ারীর পর যারা ভারতে জন্মগ্রহণ করবে তাদের সকলকেই জন্মস্থান সূত্রে নাগরিকত্ব দেওয়া হয়। ঐ সময়ে বা তারপর যাঁরা ভারতের বাইরে জন্মগ্রহণ করবেন তাঁদের বাবা যদি ঐ সময়ে ভারতের নাগরিক হন তাহলেও তাঁরা এই আইনের বলে ভারতীয় নাগরিকত্ব লাভ করবে। তাছাড়া, যাঁরা সাধারণতঃ ভারতে বসবাস করেন সেই সব ব্যক্তি অন্ততঃ ছয়মাস ভারতে

বসবাস করার পর যদি নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে তালিকাভুক্ত হওয়ার জন্ম দরখাস্ত করেন তাহলেও তাঁরা নাগরিকত্ব অর্জন করতে পারেন। বিদেশী নারী ভারতীয় নাগরিককে বিবাহ করলেই তাঁরা এই আইনের বলে নাগরিকত্ব পেতে পারেন। তাছাড়া, এতদ্দেশীয় নাগরিক হবার দরখাস্ত করলে তার মাধ্যমে এবং কোন এলাকা ভারতীয় ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত হলেও তার অধিবাসীরা এই আইনের বলে ভারতীয় নাগরিক হিসেবে গণ্য হতে পারবে।

সংবিধানের ১১ অনুচ্ছেদ অনুসারে পার্লামেণ্টকে নাগরিকত্ব বিলুপ্তি সম্পর্কে আইন প্রণয়নের অধিকাবও দেওয়া হয়েছে। সংবিধানের ৯ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে ৫, ৬ এবং ৮ অনুচ্ছেদ অনুসারে নাগরিকত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তিরা স্বেচ্ছায় অন্য রাষ্ট্রেব নাগরিকত্ব গ্রহণ করলে তাঁরা ভারতের নাগরিক বলে গণ্য হবেন না। যে সব বিদেশী ভাবতীয় নাগরিকত্ব লাভ করেছেন তাঁরা ভারতের প্রতি আনুগত্যের অভাবস্বরূপ কোন কার্যে লিপ্ত থাকলে অথবা দীর্ঘকাল যাবৎ বিদেশে অবস্থান করলে বা দু' বৎসরের বেশী সময়ের জন্য বিদেশী সরকার কর্তৃক কারাদণ্ডে দণ্ডিত হলে তাদের ভারতীয় নাগরিকত্ব লোপ পাবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

মৌলিক অধিকার

(Fundamental Rights)

আধুনিক রাষ্ট্রের নাগরিক যে সমস্ত অধিকার ভোগ করে থাকে তার মধ্যে কতকগুলিকে মৌলিক অধিকার বলা হয়। আইনের দৃষ্টিতে সমতার অধিকার, বাক্‌স্বাধীনতার অধিকার, স্বাধীনভাবে চলাফেরা করার অধিকার, জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার অধিকার, সংস্কৃতি রক্ষার অধিকার, জীবিকা নির্বাহের জন্য কর্মসংস্থানের অধিকার প্রভৃতিকে সাধারণতঃ মৌলিক অধিকার বলা হয়। এগুলিকে মৌলিক অধিকার বলার কারণ এই যে, প্রত্যেক নাগরিককে তার ব্যক্তিত্ব বিকাশে সাহায্য করার জন্য এই অধিকারগুলি অপরিহার্য বলে পরিগণিত হয়। এগুলির অভাবে নাগরিক তার ব্যক্তিত্বকে পরিস্ফুট করতে সক্ষম হয় না বলে এই অধিকারগুলির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

নাগরিক জীবনের পক্ষে একান্ত অপরিহার্য বলে এই অধিকারগুলি আধুনিক কালে প্রায় সকল রাষ্ট্রের সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রভৃতি রাষ্ট্রের সংবিধানে এই অধিকারগুলি স্বীকৃত হয়েছে। ভারতের সংবিধানেও তৃতীয় পরিচ্ছেদে কতকগুলি অধিকার মৌলিক অধিকার বলে বর্ণিত হয়েছে। ব্রিটেনের সংবিধান মূলতঃ অলিখিত। এখানে পার্লামেন্ট রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। পার্লামেন্ট সাধারণ উপায়ে সংবিধানগত যে কোন বিধান বা অধিকার পরিবর্তন করতে সক্ষম। ব্রিটেনের সংবিধান মুখ্যতঃ অলিখিত হলেও অন্যান্য দেশের মৌলিক অধিকারগুলির মত অনেক গুরুত্বপূর্ণ অধিকার—ম্যাগনাকার্টা (Maganacarta), বিল অব রাইট্‌স্ (Bill of Rights) প্রভৃতি রাষ্ট্রীয় দলিলগুলির মধ্যে স্থান পেয়েছে। তাছাড়া, অন্যান্য দেশে মৌলিক অধিকার বলে স্বীকৃত অনেক অধিকার গ্রেট ব্রিটেনে প্রথাগত নিয়ম ও সাধারণ আইনের মধ্যে (Common law) সংরক্ষিত আছে। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার চূড়ান্ত অধিকারী হিসেবে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের এই বিধানগুলিকে পরিবর্তন করার আইনগত অধিকার থাকলেও পার্লামেন্ট এইগুলি রক্ষা করেই রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক মর্যাদাকে রক্ষা করেন। অনেক মৌলিক অধিকার লিখিত অবস্থায় নেই বলে ব্রিটেনের লোকেরা

মৌলিক অধিকার ভোগ করে না বলে ধরে নিলে আমরা ভুল করব। বস্তুতঃ, অনেক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নাগরিকদের তুলনায় ব্রিটেনের নাগরিকেরা এই অধিকার অনেক বেশী পরিমাণে ভোগ করে থাকে।

যে অধিকারগুলি নাগরিক জীবনের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় সেগুলি সম্বন্ধে কোন অনিশ্চয়তা বা সন্দেহের অবকাশ না রাখার জন্যই অধুনা অনেক দেশের সংবিধানে এগুলিকে লিখিত আকারে স্থান দেওয়া হয়েছে। সাধারণ আইন সহজে পরিবর্তন করা যায় কিন্তু সংবিধান পরিবর্তন কষ্টসাধ্য—বিশেষ করে লিখিত সংবিধান সমন্বিত রাষ্ট্রে। এইরূপ ক্ষেত্রে এক বিশেষ নিয়মের মাধ্যমে সংবিধান পরিবর্তনের ব্যবস্থা থাকায় এই অধিকাগুলির উপভোগের জন্য শাসন কর্তৃপক্ষের ইচ্ছার উপর নির্ভর করতে হয় না। তা ছাড়া, যেহেতু সংবিধানে এই বিধানগুলিকে সাধারণ আইন অপেক্ষা অধিকতর সম্ভ্রমের চক্ষে দেখা হয়, সে কারণে সংবিধান স্বীকৃত মৌলিক অধিকারগুলি শাসন কর্তৃপক্ষ তাঁদের খেয়াল-খুশী মত পরিবর্তন করতে সাহসী হন না।

মৌলিক অধিকারের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ ভারতের সংবিধানে তৃতীয় অধ্যায়ে মৌলিক অধিকারগুলি (Fundamental Rights) সংরক্ষিত হযেছে। এই অধ্যায়ে মৌলিক অধিকারগুলিকে সাধারণ ভাবে আটটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে এবং প্রত্যেক ভাগে তার অন্তর্গত অন্যান্য সংশ্লিষ্ট অধিকার-গুলিকে বিস্তৃত ভাবে উল্লেখ করা হযেছে। মৌলিক অধিকারগুলির আটটি ভাগ এইরূপ : (১) সাধারণ (General), (২) সাম্যের অধিকার (Right to Equality), (৩) স্বাধীনতার অধিকাব (Right to Freedom), (৪) শোষণের বিরুদ্ধে অধিকাব (Right against Exploitation), (৫) ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার (Right to Freedom of Religion), (৬) সংস্কৃতি এবং শিক্ষা সংক্রান্ত অধিকাব (Cultural and Educational Rights), (৭) সম্পত্তির অধিকার (Right to Property), (৮) শাসন-তান্ত্রিক প্রতিবিধানের অধিকার (Right to Constitutional Remedies)।

তৃতীয় অধ্যায়ে উল্লিখিত এই আট শ্রেণীর অধিকারগুলির প্রত্যেকটিতে আবার কতকগুলি বিশেষ বিশেষ অধিকার অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

প্রথমতঃ, সাধারণ অধিকার (১২ এবং ১৩ অনুচ্ছেদ) পর্যায়ে বলা হয়েছে যে, সংবিধান চালু হওয়ার আগে প্রণীত কোন আইন এই অধ্যায়ে বর্ণিত মৌলিক অধিকারগুলির সংগে অসংগতিপূর্ণ হলে সেই আইনকে অবৈধ বলে গণ্য

করা হবে। তাছাড়া, সরকার এমন কোন আইন তৈরী করবে না যা এই মৌলিক অধিকারগুলি ক্ষুণ্ণ করতে পারে এবং করলেও তা অবৈধ বলে গণ্য করা হবে।

দ্বিতীয়তঃ, সাম্যের অধিকার (১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮) পর্যায়ে আইনের চোখে সমতা এবং তার সম-সংরক্ষণ, ধর্মীয় কারণে বৈষম্যমূলক আচরণের নিষিদ্ধকরণ, সরকারী চাকরির ক্ষেত্রে সমান সুযোগ দান, অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ এবং উপাধিদানের অবসান—এই অধিকারগুলি বর্ণিত হয়েছে।

তৃতীয়তঃ, স্বাধীনতার অধিকার পর্যায়ে (১৯, ২০, ২১ ২২) বাক্ স্বাধীনতার, সমবেত হওয়ার, সভাসংগঠনের, চলাফেরা, বসবাস করার, সম্পত্তি এবং বৃত্তি ও জীবিকার অধিকার, আইন ভংগ না করলে দণ্ডিত না হওয়ার অধিকার, জীবন ও ব্যক্তি-স্বাধীনতার সংরক্ষণ, কয়েকটি নির্দিষ্ট বিধান ব্যতিরেকে গ্রেপ্তার বা আটক না হওয়ার অধিকার ইত্যাদি অধিকারগুলি বর্ণিত হয়েছে।

চতুর্থতঃ, শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার (Right Against Exploitation) পর্যায়ে মানুষকে নিয়ে ব্যবসা ও দাসশ্রমের অপসারণ এবং কলকারখানায় শিশুশ্রমিকের নিয়োগ নিষদ্ধ করা হয়েছে।

পঞ্চমতঃ, ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার (Right to Freedom of Religion) পর্যায়ে বিবেক এবং ধর্মীয় স্বাধীনতা, ধর্মসংক্রান্ত বিষয় পরিচালনায় স্বাধীনতা, কোন বিশেষ ধর্মের জন্য কর প্রদান হতে নিষ্কৃতি এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ধর্মসংক্রান্ত শিক্ষা বা আরাধনা হতে অব্যাহতি প্রভৃতি অধিকারগুলি আলোচিত হয়েছে।

ষষ্ঠতঃ, সংস্কৃতি এবং শিক্ষা সংক্রান্ত অধিকার (Caltural and Educational Rights) পর্যায়ে সংখ্যালঘুদের ভাষা, লিপি ও সংস্কৃতি এবং তাদের দ্বারা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার অধিকার স্বীকৃত হয়েছে।

সপ্তমতঃ, সম্পত্তি রক্ষার অধিকার (Right to Property) পর্যায়ে আইনের বিধান ব্যতিরেকে প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কারোর সম্পত্তি থেকে তাকে বঞ্চিত না করার অধিকার এবং সমাজের প্রয়োজনে ও ক্ষতিপূরণ প্রদান ব্যতীত সরকার কর্তৃক কোন আইনের দ্বারা ব্যক্তিগত সম্পত্তি দখল না করার অধিকার লিপিবদ্ধ হয়েছে।

অষ্টমতঃ, শাসনতান্ত্রিক প্রতিবিধানের অধিকার (Right to Constitutional Remedies) পর্যায়ে সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক হেবিয়াস কর্পাস (Habeas

Corpus), ম্যানডামাস (Mandamus) ও অন্যান্য কয়েকটি আদেশপত্রের মাধ্যমে এই অধ্যায়ে বর্ণিত মৌলিক অধিকারগুলি সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

সমতার অধিকার (Right to Equality) ঃ সংবিধানে ১৪ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে ভারতের এলাকাধীন কোন স্থানে কোন ব্যক্তিকে আইনের নিকট সমতা এবং আইনের সম-সংরক্ষণ থেকে বঞ্চিত করা চলবে না ("The state shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of the laws within the territory of India")। 'আইনের নিকট সমতা' (Equality before the law) এবং 'আইনের সমসংরক্ষণ' (equal protection of the laws)—এই শব্দসমষ্টি সমার্থ বোধক মনে হওয়াই স্বাভাবিক। আইনের নিকট সমতা (equality before the law) শব্দসমষ্টি ব্রিটিশ যুক্তরাজ্যের Rule of law-এর ধারণার সংগে জড়িত। এই ধারণার অন্যতম মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে অবস্থা বা মর্যাদা নির্বিশেষে আইনের চোখে সকলেই সমান, কেউই আইনের ঊর্ধ্বে নয়। একমাত্র রাজা ছাড়া, ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে সকলেই আইনভংগের জন্য সমভাবে দায়ী। আইনের সমান সংরক্ষণ (equal protection of the laws)—এই শব্দসমষ্টি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চতুর্দশ সংশোধনী থেকে নেওয়া হয়েছে।[1] এর অর্থ হচ্ছে সমান পর্যায়ভুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে আইন সমান হবে এবং তার প্রয়োগের ক্ষেত্রেও সমতা রক্ষা করা হবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রীম কোর্ট এই বিধানটির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, এর দ্বারা ন্যায়সংগত কারণে নাগরিকদের শ্রেণীকরণকে অস্বীকার করা হয়নি। অর্থাৎ ন্যায়সংগত কারণে, যেমন কর ধার্যের ক্ষেত্রে, কোন আইন নাগরিকদের মধ্যে শ্রেণীবিভাগ করলে তাকে আইনের সমান রক্ষণের অস্বীকৃতি বলে গণ্য করা চলবে না। সমান অবস্থাযুক্ত ব্যক্তিদের ("Under like Circumstances") জন্য আইন সমভাবে সংরক্ষণ এবং নিরাপত্তা দান করবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিচার বিভাগের এই ব্যাখ্যা ভারতের বিচারপতিরাও মেনে নিয়েছেন।

সংবিধানের ১৫(১) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, শুধুমাত্র ধর্ম, বংশ, জাতি, স্ত্রী-পুরুষভেদে অথবা জন্মস্থানের কারণে রাষ্ট্র কোন নাগরিকদের মধ্যে বৈষম্যের

1. "No State shall......deny to any person within its jurisdiction the equal protection of the laws"

সৃষ্টি করবে না (The State shall not discriminate against any citizen on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them)। উক্ত অনুচ্ছেদের ২ ধারায় বলা হয়েছে যে কোন নাগরিকের উপর পুর্বোক্ত কারণে দোকান, রেষ্টরেণ্ট, হোটেল এবং আমোদ-প্রমোদের স্থানে প্রবেশাধিকারের ক্ষেত্রে অথবা রাষ্ট্রের সম্পূর্ণ বা আংশিক ব্যয়ে নির্বাহিত কুপ, পুষ্করিণী, রাস্তা-ঘাট এবং জনসমাগমের স্থান ব্যবহারের ক্ষেত্রে কোনরূপ বাধানিষেধ বা অক্ষমতা আরোপ করা চলবে না। এই অনুচ্ছেদের পরবর্তী কয়েকটি ধারায় (১৫) (৩) ও ৪) যথাক্রমে স্ত্রীলোক ও শিশুদের জন্য এবং সামাজিক ও শিক্ষার দিক থেকে অনুন্নত শ্রেণীর জন্য অথবা তপশীলভুক্ত বর্ণ বা তপশীলভুক্ত জাতির জন্য রাষ্ট্র বিশেষ ব্যবস্থা করলে তাতে বাধা দেওয়া চলবে না। অর্থাৎ পুর্বোক্ত শ্রেণীর ব্যক্তিদের স্বার্থ রক্ষা কল্পে রাষ্ট্র বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারবে। অবশ্য এই প্রসংগে উল্লেখযোগ্য যে কেবলমাত্র ধর্ম, বংশ, জাতি, স্ত্রীপুরুষভেদ এবং জন্মের স্থানের কারণেই বৈষম্য সৃষ্টি নিষিদ্ধকরণ হয়েছে। অর্থাৎ অন্যান্য ন্যায় সংগত কারণে বাধানিষেধ আরোপ করা বেআইনী হবে না। যেমন, প্রয়োজনীয় শিক্ষার অভাব থাকলে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি নিষিদ্ধ করা যেতে পারে অথবা কোন সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত হলে কোন হোটেলে ভর্তি হওয়াও নিষিদ্ধ করা যেতে পারে।

সংবিধানের ১৬ (১) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে রাষ্ট্রের অধীনস্থ কোন কর্মে এবং পদে নিয়োগের ব্যাপারে সকল নাগরিকের সমান সুযোগ থাকবে (There shall be equality of opportunity for citizens in matters relating to employment or appointment to any office under the State)।

১৬ (২) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে কেবলমাত্র ধর্ম, জাতি, বর্ণ, স্ত্রীপুরুষ, বংশ এবং জন্মস্থান অথবা এদের যে কোন একটির কারণে কোন নাগরিক রাষ্ট্রের কোন পদের জন্য অযোগ্য বলে বিবেচিত হবে না (No citizen shall, on grounds only of religion, race, caste, sex, descent, place of birth, residence or any of them be ineligible for or discriminated against in respect of any employment or office under the State)।

স্থতরাং দেখা যাচ্ছে রাষ্ট্রের অধীনস্থ চাকরিতে নিয়োগের ব্যাপারে সকলকে সমান স্থযোগ দেওয়াই এই অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্য। ধর্ম, জাতি, বর্ণ, স্ত্রীপুরুষ, বংশ এবং জন্মস্থানের কারণে সরকারী চাকরি অথবা রাষ্ট্রের অধীনস্থ যে কোন চাকরির ক্ষেত্রে বৈষম্য নিষিদ্ধ করাই এই অনুচ্ছেদের লক্ষ্য।

এই অনুচ্ছেদের অন্তর্গত (৩) (৪) এবং (৫)—তিনটি ধারায় ব্যতিক্রমের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ১৬ অনুচ্ছেদের (৩) ধারায় বলা হয়েছে যে কোন রাজ্যে কোন বিশেষ শ্রেণীর কর্মে নিয়োগের জন্য পার্লামেণ্ট ঐ রাজ্যে বসবাসের শর্ত আরোপ করে আইন তৈরী করতে পারে। কোন রাজ্যের বিশেষ বিশেষ কাজের জন্য অনেক ক্ষেত্রে বিশেষ জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা থাকা প্রয়োজন, যেগুলি কেবলমাত্র সেই রাজ্যের অধিবাসীদের কাছ থেকেই আশা করা যেতে পারে। তবে এই সমস্ত ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট অংগরাজ্যকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব ছেড়ে দিলে প্রাদেশিকতার কুফল জাতীয় ঐক্যের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করতে পারে। তাই সংবিধান প্রণেতারা এই কাজ রাজ্য আইনসভার হাতে ছেড়ে না দিয়ে কেন্দ্রীয় পার্লামেণ্টের হাতে ন্যস্ত রাখাই যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করেছেন।

১৭ অনুচ্ছেদের (৪) ধারায় অনুন্নত শ্রেণীর জন্য পদ সংরক্ষণের ব্যবস্থাকে বৈধ করা হয়েছে। এই অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে সরকার যদি মনে করেন যে কোন পদে অনুন্নত সম্প্রদায় উপযুক্ত ভাবে নিযুক্ত হয়নি তাহলে এই শ্রেণীর নাগরিকদের জন্য এই পদগুলি সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এই প্রসংগে উল্লেখযোগ্য যে সংবিধানের ৩৩৫ অনুচ্ছেদে কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারের চাকরি এবং পদগুলিতে নিয়োগের ব্যাপারে তপশীলভুক্ত বর্ণ এবং জাতির (Scheduled castes and Scheduled tribes) দাবী বিবেচনা করা হবে।[1] সংবিধানের ৩৩৬ অনুচ্ছেদে অ্যাংলো ইণ্ডিয়ানদের জন্য কতকগুলি পদ দশ বৎসরের জন্য সংরক্ষণ করা হয়েছিল। এই সময় অতিক্রান্ত হওয়ার সংগে সংগে এই সংরক্ষণের বিধান রহিত হওয়ায় বর্তমানে এই সম্প্রদায় চাকরির নিয়োগের ব্যাপারে অন্যান্য নাগরিকদের পর্যায়ভুক্ত হয়েছেন।

১৬ অনুচ্ছেদের (৫) ধারায় সাধারণ সমতায় যে ব্যতিক্রমের উল্লেখ করা হয়েছে তা এই অধ্যায়ে ২৫ অনুচ্ছেদে বর্ণিত ধর্মীয় স্বাধীনতার সংগে সংগতিপূর্ণ।

1. Article 335 "The Claims of the members of the Scheduled Castes and scheduled Tribes shall be taken into consideration, consistently with maintenance of efficiency of administration, in the making of appointments to services and posts in connection with the affairs of the Union or of a State".

১৬ অনুচ্ছেদের (৫) ধারায় কোন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সংগে জড়িত কোন পদ উক্ত ধর্মাবলম্বী সম্প্রদায়ের জন্য সংরক্ষিত হতে পারে। প্রকৃত পক্ষে নাগরিকদের ধর্মীয় স্বাধীনতা স্বীকৃত হলে ধর্মীয় সংস্থাগুলিতে স্বীয় ধর্মের ব্যক্তিদের নিয়োগের স্বাধীনতাও স্বীকার করে নিতে হয়।

সংবিধানের ১৭ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে: অস্পৃশ্যতা রহিত হল এবং এর যে কোন প্রকার প্রয়োগ নিষিদ্ধ করা হল। অস্পৃশ্যতা থেকে উদ্ভূত কোন অযোগ্যতার প্রবর্তন আইন অনুসারে দণ্ডনীয় অপরাধ বলে বিবেচিত হবে ("Untouchability" is abolished and its practice in any form is forbidden. The enforcement of any disability arising out of "Untouchability" shall be an offence punishable in accordance with law.)।

স্বাধীনতার অধিকার (Right to Freedom): মানুষ স্বাধীনতা চায়। কিন্তু সামাজিক জীব হিসেবে নিয়ন্ত্রণহীন অবাধ স্বাধীনতা সে দাবী করতে পারে না। সমাজের প্রয়োজনে ব্যক্তিস্বাধীনতাকে নিয়ন্ত্রিত আকারে মানুষের উপভোগ্য হতে হবে। কিন্তু এই নিয়ন্ত্রণের মাত্রা কতটুকু হবে—অর্থাৎ, কি পরিমাণ স্বাধীনতা ব্যক্তিবিশেষ উপভোগ করতে পারবে এবং রাষ্ট্রে সমাজের প্রয়োজনে কতটুকুই বা বিধি-নিষেধ আরোপ করতে পারবে – রাষ্ট্র-বিজ্ঞানে সে বিষয়টি এক চিরন্তন তর্কের বিষয় বস্তু। প্রকৃতপক্ষে প্লেটো, অ্যারিস্টটল প্রমুখ গ্রীক দার্শনিকের যুগ থেকে শুরু করে আধুনিক কালের ল্যাস্কি পর্যন্ত প্রখ্যাত রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা ব্যক্তিস্বাধীনতা ও রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের সীমানা নির্ধারণের সূত্রটিকে আবিষ্কার করার চেষ্টা করে আসছেন। তবে ব্যক্তির স্বাধীনতা সমাজের প্রয়োজনে যে কিছুটা নিয়ন্ত্রণসাপেক্ষ হবেই—একথা অনস্বীকার্য।

আমাদের সংবিধানে ১৯, ২০, ২১ ও ২২ অনুচ্ছেদে নাগরিকদের বিভিন্ন প্রকার স্বাধীনতার কথা বলা হয়েছে। ১৯ অনুচ্ছেদের (১) ধারায় বলা হয়েছে, নাগরিকদের (ক) বাক্যের ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা থাকবে, (খ) অস্ত্রশস্ত্র ব্যতিরেকে শান্তিপূর্ণভাবে জমায়েত হবার স্বাধীনতা থাকবে, (গ) সংঘ ও সমিতি গঠনের স্বাধীনতা থাকবে, (ঘ) সারা ভারতের যে কোন স্থানে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করার স্বাধীনতা থাকবে, (ঙ) ভারতের যে কোন স্থানে বাস করার ও বসতি স্থাপন করার স্বাধীনতা থাকবে, (চ) সম্পত্তির অর্জন, অধিকার ও

বিক্রয়ের স্বাধীনতা থাকবে এবং (ছ) যে কোন বৃত্তি পরিচালনা করার ও জীবিকা অথবা ব্যবসা বাণিজ্যে লিপ্ত থাকার স্বাধীনতা থাকবে।

সংবিধানের ১৯ অনুচ্ছেদের (১) ধারায় নাগরিকদের যে অধিকারগুলি দেওয়া হয়েছে উক্ত অনুচ্ছেদের (২), (৩), (৪), (৫) এবং (৬) ধারায় সেগুলি সম্বন্ধে কতকগুলি ব্যতিক্রমের উল্লেখ করা হয়েছে। এই প্রসংগে উল্লেখযোগ্য যে ১৯ (২) ধারায় যে ব্যতিক্রমের উল্লেখ করা হয়েছে তা সংবিধানে প্রাথমিক অবস্থায় ছিল না। ১৯৫১ সালে সংবিধানের প্রথম সংশোধনী আইনের [*Constitution* (First Amendment) Act, 1951] দ্বারা এই অংশটুকু যোগ করা হয়েছে। এই আইনের ৩ ধারায় বলা হয়েছে—রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, বৈদেশিক রাষ্ট্রের সংগে মৈত্রীভাব, শান্তি-শৃঙ্খলা, শ্লীলতা, সদাচার আদালতের অবমাননা নিবারণ, মানহানি থেকে রক্ষা এবং অপরাধে প্ররোচনা দান নিবারণের জন্য বাক-স্বাধীনতা এবং মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে সংগতভাবে আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করা চলবে।

রমেশ থাপার বনাম মাদ্রাজ রাজ্য, ব্রিজভূষণ বনাম দিল্লীরাজ্য প্রভৃতি মামলায় সুপ্রীম কোর্টের রায়ের ফলেই সংবিধানের প্রাথমিক অবস্থায় (২) ধারাটিকে অপসারিত করে তার পরিবর্তে পুর্বোক্ত সংশোধনী আইনের দ্বারা বর্তমান অংশটুকু সংযোজিত হয়। রমেশ থাপার মামলায় সুপ্রীম কোর্ট রায় দান প্রসংগে এই অভিমত প্রকাশ করেন যে জননিরাপত্তা অথবা আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা রক্ষার কারণে বাক্য ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা খর্ব করা যেতে পারে না, একমাত্র রাষ্ট্রের নিরপত্তার খাতিরেই বাক্য এবং মত প্রকাশের স্বাধীনতার উপর বাধা নিষেধ আরোপ করা যেতে পারে ("... nothing less than endangering the foundations of the state or threatening its overthrow could justify curtailment of the right to freedom of speech and expression.")। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, সুপ্রীম কোর্টের মতে মুল (২) ধারায় মতপ্রকাশের উপর বাধা-নিষেধের ক্ষেত্রটুকু সংকুচিত ছিল। রাষ্ট্রের নিরপত্তা রক্ষার উদ্দেশ্যে বাধা-নিষেধ আরোপ করার বিধান থাকলেও, আভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলার জন্য ("Public safety or the maintenance or public order.") বাক-স্বাধীনতার উপর আইনের দ্বারা কোন বিধি-নিষেধ আরোপের অবকাশ এতে ছিল না। এমন কি হত্যাকার্যে উস্কানি দেওয়া মুলক কোন বক্তৃতা করলেও, বাক ও

মত প্রকাশের মৌলিক অধিকারটিকে খর্ব করা চলত না। স্বভাবতই মূল ১৯ অনুচ্ছেদের (২) ধারায় বাক ও মত প্রকাশের স্বাধীনতার ক্ষেত্রে যে ব্যতিক্রম-গুলি উল্লেখ করা হয়েছিল সেগুলি যথেষ্ট নয় বিবেচনা করে আমাদের পার্লামেণ্ট ১৯৫১ সালে প্রথম সংবিধান সংশোধনী আইন পাশ করে নতুন ১৯ (২) ধারায় আরও কতকগুলি অতিরিক্ত বাধা-নিষেধের উল্লেখ করেন। মূল ১৯ (২) ধারাটির সংগে প্রথম সংশোধনী আইনের দ্বারা যুক্ত নতুন ১৯(২) ধারার সংগে তুলনা করলে দেখা যাবে যে এই ধারায় কতকগুলি নতুন অতিরিক্ত বাধা-নিষেধের উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলি হচ্ছে—(১) বিদেশী রাষ্ট্রের সংগে বন্ধুত্ব মূলক সম্পর্ক (Friendly relations with foreign State), (২) আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা (public order) এবং অপরাধে প্ররোচনা দান (incitement to an offence.)।

বাক ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা ছাড়া, নাগরিকদের অস্ত্রশস্ত্র ব্যতিরেকে জমায়েত হবার স্বাধীনতা এবং সংঘ ও প্রতিষ্ঠান গঠনের স্বাধীনতাও স্বীকৃত হয়েছে। বর্তমানে রাষ্ট্র জননিরাপত্তার (public order) প্রয়োজনে এই স্বাধীনতার উপর বাধা-নিষেধের আরোপ করতে পারবে।

নাগরিকদের ভারতের যে কোন স্থানে স্বাধীন ভাবে চলাফেরা করার স্বাধীনতা থাকবে, যে কোন স্থানে বাস করা অথবা বসতি স্থাপন করার এবং সম্পত্তি অর্জন, অধিকার ও বিক্রয় করার স্বাধীনতা থাকবে। সাধারণের স্বার্থ অথবা তপশীলভুক্ত উপজাতিদের সংরক্ষণ করার জন্য এক্ষেত্রেও রাষ্ট্রের ন্যায়সংগত বাধা-নিষেধ আরোপ করার স্বাধীনতা থাকবে।

সকল নাগরিকের যে কোন বৃত্তি পরিচালনা করার এবং জীবিকা অথবা ব্যবসা-বাণিজ্যে লিপ্ত থাকার স্বাধীনতা থাকবে। রাষ্ট্র সাধারণের স্বার্থে এই স্বাধীনতার উপর ন্যায়সংগত বাধা-নিষেধ আরোপ করতে পারবে। যে কোন বৃত্তি পরিচালনার জন্য রাষ্ট্র যে কোন বৃত্তিমূলক অথবা কারিগরী শিক্ষা লাভের শর্ত আরোপ করতে পারবে। সাধারণ নাগরিকদের সংগে অথবা সম্পূর্ণ নিজস্ব কর্তৃত্বে রাষ্ট্র যে কোন ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য আইন তৈরী করতে পারে।

২১ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, 'আইনের নির্ধারিত পদ্ধতি ব্যতিরেকে কোন ব্যক্তির প্রাণ অথবা স্বাধীনতা হরণ করা চলবে না' (No person shall be deprived of his life or personal liberty except according

to procedure established by law.)। এই অনুচ্ছেদ অনুসারে কোন নাগরিকের জীবন ও স্বাধীনতা হরণ হলে তা আইনের দ্বারা নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসারে হতে হবে। 'আইনের দ্বারা নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসারে' (Except according to procedure established by law)—এই কথা কয়েকটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। এ কে. গোপালন বনাম মাদ্রাজ রাজ্য (A. K. Gopalon *vs.* The State of Madras)—এই মামলায় সুপ্রীম কোর্ট এই মত প্রকাশ করেন যে, কোন আইন অন্যায় ভাবে কারোর জীবন ও স্বাধীনতা হরণ করলে তাতে সুপ্রীম কোর্টের করার কিছুই নেই। 'আইনের দ্বারা নির্দিষ্ট পদ্ধতি' (Except according to procedure established by law)—এই কথা কয়েকটির দ্বারা সংবিধান আইনসভাকে কোন ব্যক্তিকে আটক রাখার জন্য যে কোন প্রকারের আইন তৈরী করার স্বাধীনতা দিয়েছে —তা যতই নিষ্ঠুর বা অন্যায় হোক না কেন। অর্থাৎ, কারোর স্বাধীনতা হৃত হলে তা আইনের পদ্ধতি অনুসারে হতে হবে, সেই আইন অন্যায়, অসংগত বা নিষ্ঠুর হলে বিচার বিভাগের তার বিরুদ্ধে করার কিছুই নেই। সংক্ষেপে বলতে গেলে, এই কথা কয়েকটির জন্য আইন বিভাগকে আটক রাখা সংক্রান্ত আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে অত্যধিক ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে এবং বিচার বিভাগের ক্ষমতা সেক্ষেত্রে স্পষ্টই সীমাবদ্ধ।

২২ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে কোন ব্যক্তিকে আটক করে রাখতে হলে তাকে তার কারণ জানাতে হবে এবং নিজেকে রক্ষা করার জন্য নিজ পছন্দমত আইনজ্ঞের পরামর্শ গ্রহণ করার সুযোগ দিতে হবে। যে ব্যক্তিকে আটক করে রাখা হয়েছে তাকে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে নিকটবর্তী ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্টে বিচারের জন্য হাজির করতে হবে, তবে এই সময়ের মধ্যে আটক করার স্থান থেকে ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্ট পর্যন্ত যেতে যে সময়টুকু ব্যয় হবে সেটুকু অন্তর্ভুক্ত হবে না। অবশ্য এই নিয়ম আমাদের দেশে বসবাসকারী শত্রু রাষ্ট্রের নাগরিকদের (Enemy alien) এবং (২) নিবর্তনমূলক আটক আইনে (Preventive Detention Act) আটক রাখা ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

নিবর্তনমূলক আটক আইনের (Preventive Detention Act) দ্বারা কোন ব্যক্তিকে সাধারণভাবে তিন মাসের বেশী আটক রাখা যেতে পারে না। অবশ্য এই তিন মাস অতিক্রান্ত হবার আগে হাইকোর্টের বিচারপতি অথবা বিচারপতি হবার যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের দিয়ে গঠিত একটি উপদেষ্টা পরিষদ

যদি এই মর্মে অভিমত প্রকাশ করেন যে উক্ত সময়ের বেশী সময় ঐ ব্যক্তিকে আটক রাখার ন্যায়সংগত কারণ আছে, তখন তাকে নিবর্তনমূলক আটক আইনে তিন মাসের অধিক সময় আটক করে রাখা যেতে পারে। ২২ অনুচ্ছেদের (৭) ধারা অনুসারে পার্লামেণ্ট এমন আইনও পাশ করতে পারে যার ফলে কোন উপদেষ্টা পরিষদের পরামর্শ না নিয়েও কোন ব্যক্তিকে তিন মাসের বেশী সময় আটক করে রাখা যেতে পারে।

এই প্রসংগে উল্লেখযোগ্য যে নিবর্তনমূলক আটক আইন (Preventive Detention Act) সাধারণ আইন ভংগকারীদের বিরুদ্ধে প্রযোজ্য হবে না। যে সমস্ত ব্যক্তিদের আটক না করলে রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ হবার সম্ভাবনা আছে দেশের শাসন কর্তৃপক্ষ কেবলমাত্র তাদেরই নিবর্তনমূলক আটক আইনে আটকে রাখবেন। সংবিধানে নিবর্তনমূলক আটক আইনের এই বিধানটি গণপরিষদের অনেক সদস্যদের দ্বারাই বিরূপভাবে সমালোচিত হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে বর্তমান কালের কোন গণতান্ত্রিক সংবিধানে এই জাতীয় কোন আইনের উল্লেখ নেই। দেশের বিপদকালীন অবস্থায় বিনাবিচারে অধিক দিন ধরে আটকে রাখার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না। রাষ্ট্রের নিরাপত্তার খাতিরে শাসন কর্তৃপক্ষ অবশ্যই অবাঞ্ছিত ব্যক্তিদের বিনাবিচারে আটকে রাখতে পারেন। ইংলণ্ডে প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় পার্লামেণ্ট এই জাতীয় আইন পাস করে যাদের স্বাধীন গতিবিধি রাষ্ট্রের নিরাপত্তার পক্ষে ক্ষতিকারক বলে মনে করেছিলেন, তাদের বিনাবিচারে আটকে রাখার ব্যবস্থা করেছিলেন। এক্ষেত্রে লক্ষণীয় বিষয় এই যে পার্লামেণ্ট রাষ্ট্রের নিরাপত্তার খাতিরে কেবলমাত্র যুদ্ধের সময়েই এই জাতীয় আইন পাস করেন। কিন্তু আমাদের দেশে নিবর্তনমূলক আটক আইনের প্রয়োগ কেবলমাত্র যুদ্ধকালীন অবস্থার জন্য নয়—শান্তিকালীন অবস্থায়, অর্থাৎ সাধারণ সময়েও এই আইন রাষ্ট্রের নিরাপত্তার প্রয়োজনে প্রযুক্ত হতে পারে।

সংবিধানে উল্লিখিত নিবর্তনমূলক আটক আইনের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল এই যে, তিন মাসের বেশী কাউকে এই আইনে আটকে রাখতে হলে একটি উপদেষ্টামণ্ডলীর উপদেশ নিতে হবে। এই উপদেষ্টামণ্ডলী তার সিদ্ধান্তে উপনীত হবার জন্য সরকার কর্তৃক এই অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে উপস্থাপিত কাগজপত্র পরীক্ষা করবেন। এই উপদেষ্টামণ্ডলী কাগজপত্রাদি পরীক্ষা করে যদি এই অভিমত প্রকাশ করেন যে উক্ত অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আটকে রাখার কোন

সংগত কারণ নেই, তাহলে সরকার তাকে বন্দীদশা থেকে মুক্তি দেবেন। নিবর্তনমূলক আটক আইনে উপদেষ্টামণ্ডলীর গঠন এবং বাধ্যতামূলক ভাবে তার সিদ্ধান্তকে কার্যকরী করা এই আইনের একটি ভাল দিক সন্দেহ নেই, তবে এই প্রসংগে আমাদের স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে সরকার প্রয়োজনবোধে উপদেষ্টা-মণ্ডলী সংগঠনের বিধান না রেখেও নিবর্তনমূলক আটক আইন পাস করতে পারেন। সংবিধানে ২২ অনুচ্ছেদের (৭) ধারায় এরূপ একটি বিধানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে ১৯৫০ সালে পার্লামেণ্ট যে নিবর্তনমূলক আটক আইন Preventive Detention Act, 1950—পাস করেন তাতে কোন কোন ক্ষেত্রে তিন মাসের বেশী অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আটকে রাখার জন্য কোন উপদেষ্টামণ্ডলী গঠনের প্রয়োজন নেই বলে উল্লেখ করা হয়। ১৯৫০ সালের নিবর্তনমূলক আটক আইনটি জনসাধারণ ও পার্লামেণ্টের অনেক সদস্য তীব্রভাবে সমালোচনা করায় পরবর্তীকালে এই আইনটি সংশোধন করে এর আপত্তিজনক অংশগুলি তুলে দেওয়া হয়। বর্তমানে এই আইনের দ্বারা অভিযুক্ত ব্যক্তিদের অনিবার্যভাবে একটি উপদেষ্টামণ্ডলীর সম্মুখে উপস্থাপিত করতে হয় এবং ঐ উপদেষ্টা মণ্ডলীর সিদ্ধান্তকে মেনে নেওয়াও সরকারের পক্ষে বাধ্যতামূলক। এই পরিষদ তার সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার জন্য সরকারের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় সংবাদ ও তথ্যাদি দাবী করতে পারে। তাছাড়া, অভিযুক্ত ব্যক্তিও ব্যক্তিগতভাবে তার বক্তব্য এই পরিষদের সম্মুখে উপস্থাপিত করতে পারে।

শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার (Right against Exploitation) ঃ

সংবিধানের ২৩ অনুচ্ছেদে মানুষ নিয়ে ব্যবসা করা এবং 'বেগার (begar) প্রথা' নিষিদ্ধ করা হয়েছে। অবশ্য রাষ্ট্র সাধারণের কল্যাণের জন্য শ্রমদান করতে বাধ্য করতে পারে, অবশ্য তা করতে গিয়ে রাষ্ট্র ধর্ম, জাতি, বর্ণ এবং শ্রেণীগত কারণে কোন বৈষম্য সৃষ্টি করতে পারবে না।

অতীতে জমিদারেরা তাঁদের প্রজাদের কাছ থেকে জোর করে 'বেগার' আদায় করতেন। এটাকে তাঁরা তাঁদের প্রাপ্য সম্মানের অংশ বলে মনে করতেন। মানুষ নিয়ে নিষ্ঠুর ভাবে কেনাবেচা করে অসৎ উপায়ে

অর্থোপার্জনের নজির আজও বিরল নয়। ছেলেমেয়েদের চুরি করে বিক্রয় করা অথবা অসহায় স্ত্রীলোককে অসৎ কর্মে নিয়োগ করার পরিকল্পিত ষড়যন্ত্রের জঘন্য চিত্র মাঝে মাঝে আমরা আজকের দিনেও দেখতে পাই। সংবিধানের ২৩ অনুচ্ছেদে পুর্বোক্ত অন্যায় কাজগুলি নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে এই বিধান ভংগ করলে তা আইন অনুসারে শাস্তিযোগ্য এক অপরাধ বলে গণ্য করা হবে।

২৪ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে চৌদ্দ বৎসরের কম বয়স্ক বালক-বালিকাদের কোন কলকারখানা, খনি অথবা বিপদজনক কাজে (hazardous employment) নিয়োগ করা চলবে না।

ধর্মবিষয়ক স্বাধীনতা (Right to Freedom of Religion) ঃ

ভারত একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। এখানে হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, জৈন, খ্রীষ্টান, শিখ প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী লোক পাশাপাশি বাস করে। রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে রাষ্ট্র মানুষের সমাজ-জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে তার ব্যক্তিত্ব-বিকাশের পথকে সুপ্রশস্ত করে। কোন বিশেষ ধর্মের প্রতি বিশ্বাস বা তার অনুশাসনকে মেনে চলা মানুষের একান্তই ব্যক্তিগত ব্যাপার। ধর্মবিশ্বাসে হস্তক্ষেপ না করাই আধুনিক প্রগতিবাদী রাষ্ট্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য বলে গণ্য করা হয়। আমাদের সংবিধানে ২৫, ২৬, ২৭ এবং ২৮ অনুচ্ছেদে ধর্ম ব্যাপারে রাষ্ট্রের নীতিগুলি ব্যক্ত করা হয়েছে। ধর্মীয় ব্যাপারে রাষ্ট্রের নিরপেক্ষতাই এই নীতিগুলির সার কথা।

সংবিধানের ২৫ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে জননিরাপত্তা, নৈতিকতা এবং জনস্বাস্থ্য লজ্যন না করে সকল মানুষের বিবেকের স্বাধীনতা এবং যে কোন ধর্মমত পোষণ, তার আচরণ এবং প্রচারের স্বাধীনতা থাকবে। রাষ্ট্রের অবশ্য কোন ধর্মীয় আচরণের সংগে জড়িত কোন অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক অথবা অন্য যে কোন প্রকার পার্থিব ক্রিয়াকলাপকে (Secular activity) নিয়ন্ত্রিত করার স্বাধীনতা থাকবে। তাছাড়া, সমাজের উন্নতি ও সংস্কার-সাধনের জন্য এবং হিন্দুধর্মের সার্বজনীন প্রতিষ্ঠানগুলি সকল শ্রেণী ও সম্প্রদায়ভুক্ত হিন্দুদের নিকট উন্মুক্ত থাকার জন্য রাষ্ট্রের যে কোন ব্যবস্থা অবলম্বনের

স্বাধীনতা থাকবে। শিখ ধর্মাবলম্বীদের কৃপান পরিধান এবং তা বহন করা তাদের ধর্মীয় আচরণের অংগ বলে বিবেচিত হবে।

যে কোন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান বা সম্প্রদায়কেও (Denomination) কতকগুলি অধিকার দেওয়া হয়েছে। সেগুলি হচ্ছে : (ক) ধর্মীয় এবং দাতব্য প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা এবং প্রতিপালন, (খ) ধর্মীয় ব্যাপারে নিজস্ব বিষয় পরিচালনা, (গ) স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি অর্জন বা ভোগদখল, (ঘ) আইন অনুসারে এই সমস্ত সম্পত্তির তত্ত্বাবধান।

২৭ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে কোন বিশেষ ধর্ম বা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উন্নতি সাধন বা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য রাষ্ট্র কোন নাগরিককে কর প্রদান করতে বাধ্য করবে না। ২৮ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, সম্পূর্ণ রাষ্ট্রের অর্থে পরিচালিত কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়া হবে না। অবশ্য কোন দান বা ট্রাস্টের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে যদি বিধান থাকে যে সেখানে ধর্মীয় শিক্ষা দেওযা হবে, তাহলে সেই প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হলেও এই নিয়ম প্রযোজ্য হবে না। রাষ্ট্রের স্বীকৃত অথবা রাষ্ট্রের কাছ থেকে সাহায্যপ্রাপ্ত কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ধর্মীয় শিক্ষা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ না হলেও, কোন ব্যক্তির উপর তার সম্মতি ব্যতিরেকে এই শিক্ষা চাপিয়ে দেওয়া যেতে পারবে না।

ধর্মীয় স্বাধীনতা সম্বন্ধে আমাদের সংবিধানের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এই যে, মত পোষণ ও প্রচারের স্বাধীনতাকে বজায় রেখে আমাদের সংবিধান ধর্ম সম্বন্ধে রাষ্ট্রীয় নিরপেক্ষতা ঘোষণা করেছে। পাকিস্থানের সংবিধান রাষ্ট্রকে সুস্পষ্টই ইসলামীয় রাষ্ট্র বলে ঘোষণা করেছে। ব্রিটিশ যুক্তরাজ্যেও *Auglican Church*কে সরকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে গণ্য করা হয়। কিন্তু ভারতে এই জাতীয় কোন ধর্ম বা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করা হয়নি। অপর পক্ষে, সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে ধর্মের বিরুদ্ধে প্রচার করার স্বাধীনতা স্বীকৃত হলেও, যে কোন ধর্মমত প্রচারে স্বাধীনতা সেখানে স্বীকৃত হয়নি। এই বিধান স্পষ্টতঃই গণতন্ত্র বিরোধী। ভারতে রাষ্ট্রের কোন্ ধর্ম না থাকলেও নাগরিকদের যে কোন ধর্মমত পোষণ এবং তার প্রচারের স্বাধীনতা সংবিধান স্বীকার করে নিয়েছে। আমাদের দেশে ধর্মবিষয়ক স্বাধীনতার বৈশিষ্ট্য এবং মাধুর্যই এইখানে।

সংস্কৃতি ও শিক্ষাগত অধিকার (Cultural and Eudcational Rights) ঃ

বিভিন্ন ভাষা, ধর্ম এবং কৃষ্টির সহ-অবস্থিতিকে স্বীকার করে নিয়ে ভারত এক সুমহান সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য গড়ে তুলেছে। আমাদের নেতৃস্থানীয় গণপরিষদের সদস্যরা এক কেন্দ্রীভূত শাসনব্যবস্থার মাধ্যমে জাতীয় ঐক্যকে অটুট ও অক্ষুণ্ণ রাখার চেষ্টা করলেও, বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী এবং ভাষাভাষী সম্প্রদায়ের নিজ নিজ কৃষ্টি ও সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার অধিকারকেও স্বীকার করে নিয়েছেন। সংস্কৃতি এবং শিক্ষামূলক অধিকারগুলির উদ্দেশ্য ব্যক্ত করতে গিয়ে ডঃ আম্বেদকার বলেছেন যে, কোন সংখ্যালঘু সম্প্রদায় যদি তাদের ভাষা ও কৃষ্টিকে বাঁচিয়ে রাখতে চায় তাহলে রাষ্ট্র আইন করে অন্য কোন কৃষ্টিকে জোর করে চাপিয়ে দেবে না ("The object of these rights was to see that if there was a cultural minority which wanted to preserve its own language and culture, the state would not, by law, impose upon it any other culture which might be local or otherwise.")।

সংবিধানের ২৯ অনুচ্ছেদে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নিজস্ব কৃষ্টিকে বাঁচিয়ে রাখার অধিকারকে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। উক্ত অনুচ্ছেদে আরো বলা হয়েছে যে, রাষ্ট্রের দ্বারা প্রতিপালিত অথবা রাষ্ট্রের কাছ থেকে সাহায্যপ্রাপ্ত কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে জাতি, ধর্ম, বর্ণ বা ভাষাগত বৈষম্যের ভিত্তিতে কোন ব্যক্তির ভর্তি হওয়া নিষিদ্ধ হবে না। এই প্রসংগে উল্লেখযোগ্য যে, সংবিধানের এই অংশটুকু (অর্থাৎ ২৯ অনুচ্ছেদের দ্বিতীয় ধারা) এই পরিচ্ছেদে বর্ণিত ১৫ অনুচ্ছেদের অনুপূরক হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। উক্ত অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে রাষ্ট্র ধর্ম, জাতি, বর্ণ, স্ত্রী-পুরুষভেদে এবং জন্মস্থানের ভিত্তিতে নাগরিকদের মধ্যে কোন বৈষম্য সৃষ্টি করবে না।

মাদ্রাজের কয়েকটি সরকারী কলেজে ভর্তির ব্যাপারে বর্ণের ভিত্তিতে বৈষম্যের নিয়ম বিদ্যমান থাকায়[1] কয়েকটি ছাত্র উক্ত সরকারী নিয়মের (*Communal G. O.*) বিরুদ্ধে মাদ্রাজ হাইকোর্টের ম্যানডামাস (*Mandamus*) প্রার্থনা করে। মাদ্রাজ হাইকোর্টের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে

1. The Communal Government Order, Madras. "G. O No 2208, dated June 16, 1950,

সরকার সুপ্রীমকোর্টে আবেদন করলে সুপ্রীমকোর্ট উক্ত নিয়মকে (*Communal G. O.*) সংবিধান বিরোধী বলে ঘোষণা করেন। কারণ, উক্ত সরকারী আদেশ ধর্ম এবং বর্ণের ভিত্তিতে নাগরিকদের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টি করায়, সংবিধানের ১৫ অনুচ্ছেদের (১) ধারার বিরোধী হচ্ছে। ফলে পার্লামেণ্ট ১৯৫০ সালে সংবিধান প্রথম সংশোধনী আইনের দ্বারা [*Constitution* (First Amendment) Act, 1950] সংবিধানের ১৫ (১) এবং ২৯ (২) অনুচ্ছেদকে সংশোধন করে ১৫ অনুচ্ছেদের শেষে ১৫ (৪) অংশটুকু সংযোজিত করে। এখানে বলা হয়েছে যে, সংবিধানের ১৫ অনুচ্ছেদ এবং ২৯ (২) অনুচ্ছেদ সত্ত্বেও রাষ্ট্রের পক্ষে সমাজ ও শিক্ষার দিক থেকে অনুন্নত শ্রেণী এবং তপশীলভুক্ত বর্ণ এবং জাতিদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করা অবৈধ হবে না।

সংবিধানের ৩০ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে ধর্ম এবং ভাষার ভিত্তিতে গঠিত সমস্ত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নিজেদের পছন্দমত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করার ও পরিচালনা করার অধিকার থাকবে। উক্ত অনুচ্ছেদের দ্বিতীয় ধারায় বলা হয়েছে যে, সরকারী সাহায্যের ক্ষেত্রে সরকার উপরোক্ত কারণে কোন বৈষম্য সৃষ্টি করবে না। এই প্রসংগে উল্লেখযোগ্য যে State of Bombay vs Education Society[1]-র মামলায় সুপ্রীমকোর্ট এই রায় দেন যে, কোন সম্প্রদায়ের তাদের নিজস্ব ভাষার মাধ্যমে নিজেদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষা দেওয়ার অধিকার আছে এবং কোন নাগরিককে তার ভাষার জন্য সরকার কর্তৃক পরিচালিত অথবা সরকারের কাছ থেকে সাহায্যপ্রাপ্ত কোন বিদ্যালয়ে ভর্তি করা নিষিদ্ধ করা চলবে না। বোম্বাইয়ে নাসিক জেলায় বার্নেস হাইস্কুলে ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা দেওয়া হয়। একমাত্র অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান এবং এসিয়ার বাইরের কোন ছাত্র-ছাত্রী ছাড়া এই স্কুলে ভর্তি করা চলবে না—বোম্বাই সরকার এই আদেশ দেওয়ায় বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এই আদেশের বিরুদ্ধে বিচারালয়ে আবেদন জানালে সুপ্রীমকোর্ট উপরোক্ত মন্তব্য করেন।

সম্পত্তির অধিকার (Right to Property) ঃ

অ্যারিস্টটলের যুগ থেকে শুরু করে অষ্টাদশ এবং উনবিংশ শতকের উদার-নৈতিক ভাবধারায় পুষ্ট অনেক চিন্তাশীল মনীষী সম্পত্তির অবাধ অধিকারকে ব্যক্তির পরিপূর্ণ বিকাশ সাধনের অপরিহার্য অংগ বলে মনে করতেন। বিংশ

1. The State of Bombay vs Bombay Education Society and others. Judgement delivered by Das J. on 26th May, 1954.

শতকে এই চিন্তাধারার আমূল পরিবর্তন হতে চলেছে। নির্জলা ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের পথ পরিত্যাগ করে অনেক রাষ্ট্রই আজ অল্পবিস্তর সমাজতান্ত্রিক ভাবধারায় অনুপ্রাণিত। এই দুই বিপরীতমুখী অর্থনৈতিক আদর্শের সংঘাতে আমাদের রাষ্ট্রনৈতিক নেতারা স্বভাবতই সমাজতন্ত্রের নীতিকেই অধিকতর গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচনা করে আমাদের সংবিধানকে অনুরূপভাবে রূপান্তরিত করার চেষ্টা করেছেন। সংবিধানের চতুর্থ অধ্যায়ে রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশাত্মক নীতি (Directive principles of State policy)-গুলিতে সমাজতান্ত্রিক আদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে শাসনব্যবস্থা পরিচালনার প্রয়োজনীয়তাকেই স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। সমাজতন্ত্রের আদর্শে অনুপ্রাণিত হলেও আমাদের সংবিধান প্রণেতারা সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের মত সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানাকে অতিমাত্রায় সংকুচিত করার চেষ্টা করেননি।

আমাদের সংবিধানে ১৯ (চ) এবং (ছ) অনুচ্ছেদে নাগরিকদের সম্পত্তির অধিকারকে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে।

১৯ (চ) অনুচ্ছেদে সকল নাগরিকদের সম্পত্তি গ্রহণ, অধিকার ও বিক্রয়ের অধিকারকে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে।

১৯ (ছ) অনুচ্ছেদে নাগরিকদের যে কোন বৃত্তি, জীবিকা এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের অধিকারকেও স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে।

তাছাড়া, ৩১ অনুচ্ছেদের (১) ধারায় বলা হয়েছে যে, আইনের বৈধ ক্ষমতা ব্যতিরেকে কোন ব্যক্তিকে তার সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করা চলবে না। (No person shall be deprived of his property save by authority of law)।

১৯৫১ সালের সংবিধানের প্রথম সংশোধনী আইন [*Constitution* (First Amendment) Act, 1951] এবং ১৯৫৫ সালের সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনী আইনের [*Constitution* (Fourth Amendment) Act, 1955] দ্বারা সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানার অধিকারকে অনেকাংশে সংকুচিত করা হয়েছে।

সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনী আইনে বলা হয়েছে যে কোন এক 'সর্বজনীন উদ্দেশ্য' (Public purpose) ব্যতিরেকে ও ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা হয়েছে এমন এক আইনের বৈধ ক্ষমতা ব্যতিরেকে কোন সম্পত্তি দখল করা চলবে না এবং ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা যথেষ্ট নয় এই কারণে এই জাতীয় কোন আইনকে অবৈধ ঘোষণা করা চলবে না। এই বিধানগুলিকে অন্য ভাষায় এইভাবে

প্রকাশ করা যেতে পারে : কোন ব্যক্তির সম্পত্তি অধিকৃত হতে হলে : (১) তার একটি সার্বজনীন উদ্দেশ্য থাকতে হবে, (২) আইনের বৈধ অধিকারের দ্বারা তা করতে হবে, (৩) এই আইনে ক্ষতিপূরণের বিধান থাকতে হবে এবং (৪) এই ক্ষতিপূরণের পর্যাপ্ততা আদালতে বিচার সাপেক্ষ নয়।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার বনাম বেলারাণী ব্যানার্জীর মামলায় সুপ্রীমকোর্টের রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনী আইনের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। এই সংশোধনী আইনের বিশেষ বৈশিষ্ট্য এই যে, কোন সম্পত্তি অধিকারের উদ্দেশ্যে প্রণীত আইনের মধ্যে যে ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা থাকবে তার যাথার্থ কোন আদালতের বিচারের এক্তিয়ারভুক্ত হবে না। এই আইন প্রণয়ন কালে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী নেহেরু আগামী দিনের সমাজব্যবস্থায় ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে বৈষম্যের ব্যবধানকে সংকুচিত করার উদ্দেশ্যে পার্লামেণ্টের দ্বারা ক্ষতিপুরণ নির্ধারণের চুড়ান্ত স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করেন। তাছাড়া, সংবিধানের মৌলিক অধিকার এবং রাষ্ট্রপরিচালনার নির্দেশাত্মক নীতিগুলির মধ্যে অসামঞ্জস্যের ক্ষেত্রে তিনি রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশাত্মক নীতিগুলিকেই অগ্রাধিকার দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করেন। প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশাত্মক নীতিগুলি সমাজতান্ত্রিক আদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে রচিত হয়েছে। এই নীতিগুলি তথা সমাজতান্ত্রিক আদর্শকে বাস্তবে রূপায়িত করার প্রয়োজনীয়তায় বিচারবিভাগের তথাকথিত স্বাধীনতাকে কিছুটা খর্ব করে জনপ্রতিনিধিমূলক পার্লামেণ্টের ক্ষতিপুরণ নির্ধারণে অধিকতর স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করা চলে না।

১৯৫১ সালের সংবিধানের প্রথম সংশোধনী আইনের দ্বারা [সংবিধানের ৩১ (ক) অনুচ্ছেদ] জমিদারীপ্রথা বা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বিলোপ-সাধন সংক্রান্ত ৩১ (ক) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, কোন ব্যক্তির কোন জমিজমার (estate) মালিকানা স্বত্ব সংক্রান্ত আইনকে সংবিধানের বর্ণিত অন্যান্য মৌলিক অধিকারের সংগে অসংগতিপূর্ণ বলে অবৈধ ঘোষণা করা চলবে না। অর্থাৎ ক্ষতিপুরণের ব্যবস্থা নেই—অথবা কোন সার্বজনীন উদ্দেশ্য নেই বলে এই আইন-গুলিকে অবৈধ ঘোষণা করা যাবে না। কামেশ্বর বনাম বিহার রাষ্ট্র সরকারের মামলায় পাটনা হাইকোর্ট যে রায় দেন তার পরিপ্রেক্ষিতে এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রে মধ্যসত্ব বিলোপ করে যে আইন পাস করা হয় সেগুলিকে সংবিধান বিরোধী বলে যাতে বিচারবিভাগ কর্তৃক অবৈধ ঘোষিত না হয় তার জন্য সংবিধান

প্রথম সংশোধনী আইনের দ্বারা [*Constitution* (First Amendment) Act, 1951] সংবিধানে ৩১ (ক) অনুচ্ছেদ যোগ করা হয়। এই আইনের দ্বারা সৃষ্ট নবম সিডিউলে (Ninth Schedule) বিভিন্ন রাজ্য কর্তৃক প্রণীত কতকগুলি আইনের উল্লেখ করে সেগুলিকে বৈধ বলে ঘোষণা করা হয়েছে। এই আইনগুলির মধ্যে The Bihar Land Reforms Act, 1950, The West Bengal Land Development and Planning Act, 1948 প্রভৃতি আইনগুলি অন্যতম। চতুর্থ সংশোধনী আইনে মালিকানা সম্পত্তির নিয়ন্ত্রণের পরিধি আরও বিস্তৃত করা হয় এবং নবম সিডিউলে আরও কয়েকটি আইন উল্লেখ করা হয়।

মৌলিক অধিকার প্রযুক্ত করার অধিকার (Right to Constitutional Remedies) ঃ

মৌলিক অধিকারগুলির কোন একটি ভংগ হলে তার বিরুদ্ধে প্রতিবিধানের ব্যবস্থা থাকা উচিত। অন্যথায় মৌলিক অধিকারগুলি কতকগুলি আদর্শ সর্বস্ব নীতি বাক্যে পরিণত হয়। প্রকৃতপক্ষে মৌলিক অধিকার ভংগ হলে আইনের সাহায্যে তাকে প্রয়োগ করার অধিকারও আর এক গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক অধিকার বলে বিবেচিত হয়। আমাদের সংবিধানে ৩২, ৩৩, ৩৪ এবং ৩৫ অনুচ্ছেদে এরূপ কতকগুলি শাসনতান্ত্রিক প্রতিবিধানের অধিকারের কথা বলা হয়েছে। ৩২ অনুচ্ছেদে সংবিধানের তৃতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত মৌলিক অধিকারগুলিকে বলবৎ করার জন্য সুপ্রীমকোর্টে আবেদন করার অধিকার স্বীকৃত হয়েছে এবং উক্ত অনুচ্ছেদের ২নং ধারায় সুপ্রীমকোর্টকে কতকগুলি বিচারবিভাগীয় পরোয়ানা (writ) জারী করার অধিকার দেওয়া হয়েছে। এগুলি হচ্ছে ঃ হেভিয়াস কর্পাস (*Habeas Corpus*), ম্যানডামাস (*Mandamus*), প্রহিবিশন (*Prohibition*), সারটিওরি (*Certiorai*), কুয়োওয়ারেন্টো (*Quowarranto*) প্রভৃতি পরোয়ানা।

(i) হেভিয়াস কর্পাস[1] **(Habeas Corpus) ঃ** হেভিয়াস কর্পাস (*Habeas Corpus*) কথাটির অর্থ হচ্ছে 'have the body' অর্থাৎ

1. "This (Supreme) Court is thus Constituted the protector and guarantor of fundamental rights, and it cannot, consistently with the responsibility so laid upon it, refuse to entertain applications seeking protection against infringment of such right"—*Patanjali Sastri* in Romes Thapar Case.

সশরীরে হাজির করা। কোন ব্যক্তিকে আটক করে রাখলে সে যদি বিচারালয়ে আবেদন জানায় তা হলে বিচারালয় আটককারী কর্তৃপক্ষকে এই পরোয়ানার দ্বারা উক্ত অভিযুক্ত ব্যক্তিকে তার সামনে বিচারের জন্য হাজির করতে নির্দেশ দিতে পারে। বিচারালয়ে তাকে হাজির করা হলে বিচারালয় দেখবে কোন্ আইনের বলে তাকে আটক করে রাখা হয়েছে এবং তা আইনসিদ্ধ কি না। ইংলণ্ডের বিচারালয়ের Habeas Corpus writ জারী করার ক্ষমতা সেখানকার নাগরিকদের ব্যক্তিস্বাধীনতার অন্যতম রক্ষাকবচ বলে বিবেচিত হয়। ইংলণ্ডের বিচারালয়ের এই পরোয়ানা জারী করার ক্ষমতা প্রাচীনকাল থেকেই চলে আসছে। রাজার নিজস্ব ক্ষমতাই (Prerogative power) তার ভিত্তি। কিন্তু আমাদের সংবিধানে সুপ্রীম-কোর্টের এই পরোয়ানা জারী করার ক্ষমতা সংবিধান প্রদত্ত। সংবিধানের ৩২ অনুচ্ছেদের (২) ধারায় সুপ্রীমকোর্টকে এই আদেশগুলি জারী করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে এবং সংবিধানের ২২৬ অনুচ্ছেদে হাইকোর্টগুলিকেও অনুরূপ ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। শাসনতান্ত্রিক প্রতিবিধানের ক্ষেত্রে ৩২ (২) অনুচ্ছেদে সুপ্রীমকোর্টকে এবং ২২৬ অনুচ্ছেদে হাইকোর্টকে উক্ত পরোয়ানাগুলি জারী করার ক্ষমতা দেওয়ায় অভিযুক্ত ব্যক্তির অধিকার ভংগের প্রতিবিধানের ক্ষেত্রে প্রথমে হাইকোর্টে আবেদন করা উচিত কিনা—এই প্রশ্নটি স্থির হয় রমেশ থাপর বনাম মাদ্রাজ রাজ্যের মামলায় (১৯৫০)। আবেদনকারী রমেশ থাপর প্রথমেই ৩২ (২) অনুচ্ছেদে সুপ্রীমকোর্টে আবেদন করায় মাদ্রাজ সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয় যে নিয়মসংগত পদ্ধতি অনুসারে আবেদনকারীর প্রথমে মাদ্রাজ হাইকোর্টে আবেদন করা উচিত ছিল। মাদ্রাজ সরকারের এই দাবীকে অগ্রাহ্য করে সুপ্রীমকোর্ট এই অভিমত প্রকাশ করেন যে কোন ব্যক্তির অধিকার ভংগ হলে তার প্রতিবিধানের জন্য প্রথমেই সুপ্রীমকোর্টে আবেদন করা যেতে পারে। কারণ সংবিধানের তৃতীয় পরিচ্ছেদে বর্ণিত মৌলিক অধিকারগুলিকে বলবৎ করার আর এক মৌলিক অধিকার ৩২ ধারায় বর্ণিত হয়েছে এবং ৩২ অনুচ্ছেদের (২) ধারায় সুপ্রীমকোর্টকে মৌলিক অধিকার ভংগের প্রতিবিধানকল্পে এই পরোয়ানাগুলি জারী করতে দেওয়ার অর্থ ই হচ্ছে মৌলিক অধিকারের রক্ষাকর্তা হিসেবে এক বিশেষ দায়িত্ব সংবিধান তার উপর অর্পণ করেছে। সুতরাং এই দায়িত্বকে সে কোনক্রমেই অস্বীকার করতে পারে না।

(ii) **ম্যানডামাস** (Mandamus) :[1] ম্যানডামাস (Mandamus) শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'আমরা আদেশ করি' (We Command)। এই আদেশ কোন ব্যক্তিকে তার কর্তব্য পালন করার জন্য কোর্টের নির্দেশ। জনসাধারণের স্বার্থের সংগে জড়িত কর্তব্য পালনের জন্য কোর্ট সাধারণতঃ এই নির্দেশ দিয়ে থাকে।

(iii) **প্রহিবিশন্** (Prohibition) :[2] প্রহিবিশন্ (Prohibition) শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'নিষেধ করা' ('to prohibition or forbid)। এটি হচ্ছে কোন নিম্নতর কোর্টকে তার এক্তিয়ার বহির্ভূত কাজ না করার জন্য উর্ধ্বতন কোর্টের নির্দেশ। এই আদেশ জারী হওয়ার সংগে সংগে নিম্নতন কোর্টে বিচার বন্ধ রাখতে হয়।

(iv) **সারটিওরি** (Certiorai) : সারটিওরি (Certiorai) শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'আরও বিশদ্ভাবে জ্ঞাত হওয়া' (to be more fully informed of)। নিম্নতন কোর্টে বিচার চলা কালীন তার কাগজপত্র উর্ধ্বতন কোর্টে উপস্থাপিত করার জন্য উক্ত কোর্টের তরফ থেকে নির্দেশ। প্রহিবিশনের সংগে সারটিওরি-এর পার্থক্যটি লক্ষণীয়। প্রহিবিশন উর্ধ্বতন কোর্টের এমনি এক আদেশ যার ফলে নিম্নতন কোর্টকে তার বিচার কার্য বন্ধ রাখতে হয়, কিন্তু সারটিওরি বলতে আর এক ধরনের নির্দেশকে বোঝায় যার বলে নিম্নতন কোর্টকে তার নথিপত্র উর্ধ্বতন কোর্টে উপস্থাপিত করতে হয়। সংক্ষেপে বলা যেতে পারে যে, প্রহিবিশন

1. 'Mandamus is a peremptory order, issuing out of the Queen's Bench Division of the High-Court, commanding a body or person, to do that which it is its or his, duty to do. The issue of the order cannot be required as of right; it is entirely a matter for the discretion of the court.......The order does not lie against the Crown"—*Wade and Phillips* : Constitutional Law.

2. "A writ formerly issuing out of the High-Court to restrain an inferior Court from exceeding its powers....The writ of prohibition has been replaced by an order of prohibition which is used not only to restrain an inferior Court from exceeding its jurisdiction, or acting contrary to the rules of natural justice, but also to control a minister or public authority in the exercise of their judicial or quasi-judicial functions. It does not lie, however, to correct wrong decisions where a tribunal has jurisdiction" —*Osborn* : A Concise Law Dictionary.

আদেশটি নিষেধাত্মক (preventive) আর সারটিওরি আদেশটি প্রতিবিধানাত্মক (remedial)।

(v) **কুয়োওয়ারেণ্টো (Quowaranto):**[4] কুয়োওয়ারেণ্টো (Quowaranto) শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'কোন্ অধিকারে' (by what order)। কোন ব্যক্তি যখন কোন পদ বা অধিকার দাবী করে তখন কোর্ট এই আদেশের বলে কোন্ ক্ষমতার দ্বারা সে ঐ অধিকার বা পদ দাবী করছে তা জানতে পারে। অন্যভাবে বলা যেতে পারে যে, কোন অধিকারের বৈধতা স্থির করার জন্য কোর্ট এই ধরনের আদেশ জারী করে থাকে।

আইনের অনুশাসন (Rule of Law):

আইনের অনুশাসন গ্রেটব্রিটেনের সংবিধানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। আইনের অনুশাসন বলতে প্রধানতঃ দুটি নিয়মকে বোঝায়। একটি হচ্ছে, কোন ব্যক্তিকে কোন আইনের বিধান ব্যতিরেকে তার জীবন ও স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করা চলবে না। এই নিয়মের আর একটি অর্থ হচ্ছে, একমাত্র রাজা এবং রাণী ব্যতিরেকে কেউই আইনের উর্ধ্বে নয়। ফ্রান্স ও ইউরোপের আরও কয়েকটি দেশে উর্ধ্বতন রাষ্ট্রীয় কর্মচারীদের বিচারের জন্য প্রশাসনিক আইন বলে এক পৃথক শ্রেণীর আইন প্রচলিত আছে। কিন্তু ইংলণ্ডে এই জাতীয় কোন আইন নেই।

আমাদের সংবিধানে ১৪, ১৯, ২১, ৩১ ও ৩২ এই কয়েকটি অনুচ্ছেদের দ্বারা আইনের অনুশাসন প্রচলিত করা হয়েছে বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। ১৪ অনুচ্ছেদে আইনের দৃষ্টিতে সকলের সমতার কথা বলা হয়েছে, ১৯ ও ২১ অনুচ্ছেদে স্বাধীনতার অধিকারের কথা বলা হয়েছে, ৩১ অনুচ্ছেদে সম্পত্তির অধিকারের কথা বলা হয়েছে এবং ৩২ অনুচ্ছেদে শাসনতান্ত্রিক প্রতিবিধানের কথা বলা হয়েছে। ২১ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে 'কোন ব্যক্তিকে আইনের নির্দিষ্ট পদ্ধতি ব্যতিরেকে তার জীবন ও স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করা চলবে না ("No person shall be deprived his life and personal liberty except according to the procedure established by law")। আইনের নির্দিষ্ট পদ্ধতি ব্যতিরেকে (except according to

4. "......A high prerogative writ by the crown against one who claimed or usurped any office, franchise or liberty, to inquire by what authority he supported his claim. It lay also in cases or non-user, or misuser, of a franchise, or where any public trust was executed without authority"—*Osborn* : A Concise Law Dictionary.

procedure established by law)—এই কথাগুলি নিয়ে গণপরিষদে খুব তর্কের অবতারণা হয়। বলা হয় যে, এই কথা কয়েকটির জন্য বিচার বিভাগের স্বাধীনতা খুবই খর্ব করা হয়েছে। কারণ এক্ষেত্রে বিচার বিভাগ আইনের পদ্ধতি অনুসারে কোন ব্যক্তিকে জীবন এবং স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে কিনা, এইটুকু মাত্র বিচার করতে পারবে। আইনটি ভাল কি মন্দ তা বিচার করার ক্ষমতা বিচার বিভাগের থাকবে না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানে except according to procedure established by law —এই কথা কয়েকটির স্থলে 'without the due process of law'—এইরূপ কথাগুলির প্রয়োগ হয়েছে। এর ফলে সেখানকার বিচার বিভাগ কেবলমাত্র আইনেব নির্দিষ্ট পদ্ধতিগুলিই দেখে না, আইনের যাথার্থ অর্থাৎ ভাল-মন্দ বিচারের ক্ষমতাও তাদের রয়ে গেছে। কোন আইনকে অন্যায় বা নিষ্ঠুর বলে বিবেচনা করলে তারা সেই আইনকে সংবিধান বিরোধী বলে অবৈধ ঘোষণা করতে পারে। 'Except according to procedue established by law'—কথাগুলি থাকার জন্য ভারতের বিচার বিভাগ এই সুযোগ থেকে বঞ্চিত। 'Except according to procedure established by law'—এই কথাগুলি অধিকতর সুনির্দিষ্ট বিবেচনা করায় Drafting committee এইগুলিকে সংবিধানে স্থান দেন।

অবশ্য আমাদের বিচাব বিভাগের আইনের বৈধতা বিচারের ক্ষমতা যে নেই একথা ঠিক নয়। আমাদের সংবিধান যুক্তরাষ্ট্রীয়। সুতরাং এই সংবিধানের নিয়ম অনুসারে বিচার বিভাগ কোন আইনকে যদি সংবিধান বিরোধী বলে মনে করেন তবে তাকে অবৈধ ঘোষণা করতে পারেন। প্রকৃতপক্ষে কেন্দ্র ও রাজ্যের আইন সভা সংবিধানের নির্দেশের বাইবে কোন বিষয়বস্তুর উপর আইন তৈরী করতে পারে না। তাছাড়া, ২১ অনুচ্ছেদের পূর্বোক্ত ত্রুটি ২২ অনুচ্ছেদের বিধানের ফলে কিছুটা দূরীভূত হয়েছে। ২২ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, কেবলমাত্র Preventive Detention Act-এর দ্বারা অটকে রাখা ব্যক্তিদের ছাডা, অন্যান্য আইনে অটকে রাখা ব্যক্তিদের আইনজ্ঞদের পরামর্শ নেওয়ার অধিকার এবং ২৪ ঘণ্টার মধ্যে নিকটবর্তী ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে বিচারের জন্য উপস্থাপিত হওয়ার অধিকার দেওয়া হয়েছে।

সপ্তম অধ্যায়

রাষ্ট্র পরিচালনায় নির্দেশাত্মক নীতিসমূহ

(Directive Principles of State Policy)

সংবিধানের চতুর্থ অধ্যায়ে (Part IV) ৩৬ থেকে ৫১ অনুচ্ছেদের মধ্যে রাষ্ট্র পরিচালনায় নির্দেশাত্মক নীতিগুলি লিপিবদ্ধ হয়েছে। বৈষম্যমূলক সমাজব্যবস্থার নিরসণ কল্পে এক বিশেষ অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সমাজনৈতিক আদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে আগামী দিনের সমাজব্যবস্থাকে রূপ দেওয়ার আকাঙ্ক্ষা এই নীতিগুলির মধ্যে সুপরিস্ফুট। প্রকৃতপক্ষে এই নীতি-প্রণয়নের ক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার প্রভাব অনস্বীকার্য।

৩৭ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, যদিও এই নীতিগুলি আদালতের সাহায্যে প্রয়োগ করা যাবে না অর্থাৎ আদালতের বিচারগ্রাহ্য নয়, তথাপি এই নীতিগুলি দেশের শাসন সংক্রান্ত ব্যপারে 'মৌলিক' (Fundamental) বলে বিবেচিত হবে এবং রাষ্ট্র আইন তৈরি করার সময় এই নীতিগুলিকে কাজে পরিণত করার চেষ্টা করবে।[1] ৩৮ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, রাষ্ট্র সমাজনৈতিক এবং রাজনৈতিক ন্যায়ের ভিত্তিতে এক সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলায় চেষ্টা করবে। পরবর্তী অনুচ্ছেদটি ৩৮ অনুচ্ছেদের বিস্তৃতি বলে নেওয়া যেতে পারে। প্রকৃতপক্ষে অর্থনৈতিক সাম্যের আদর্শকে কাযকরী করার জন্য এগুলিকে আনুষঙ্গিক শর্ত বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। এগুলি হচ্ছে, পর্যাপ্ত পরিমাণ জীবিকাসংস্থানের অধিকার, উৎপাদনের উৎস এবং সম্পদগুলি কেন্দ্রীভূত না হয়ে সাধারণ কল্যাণের জন্য জাতীয় সম্পদের উপযুক্ত বণ্টন, স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে একই কাজের জন্য সমান মজুরির অধিকার এবং অর্থনৈতিক শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার।

৪০ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, রাষ্ট্র গ্রামপঞ্চায়েত গঠন করে সেগুলিকে প্রকৃত স্বায়ত্তশাসনশীল প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করার জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষমতা অর্পণের ব্যবস্থা অবলম্বন করবে। ৪১ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, রাষ্ট্র তার

1. Article 37 : The provisions contained in this, part shall not be enforceable by any court, but the principles therein laid down are nevertheless fundamental in the governance of the country and it shall be the duty of the State to apply these principles in making laws.

সামর্থ্যের মধ্যে শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করবে এবং বেকার, বার্ধক্য, অসুস্থতা প্রভৃতি অবস্থায় সরকারী সাহায্য পাবার ব্যবস্থা অবলম্বন করবে।

৪৩ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, রাষ্ট্র আইন প্রণয়ন, অর্থনৈতিক সংগঠন অথবা অন্য যে কোন উপায়ের মাধ্যমে শ্রমিকদের জন্য উপযুক্ত বেতনের ব্যবস্থা করবে এবং কর্মেব শর্তসমূহকে এমনভাবে সংগঠিত করবে যাতে তারা সুচারু জীবনযাত্রা, প্রয়োজনীয় অবসর এবং সামাজিক ও অন্যান্য সাংস্কৃতিক সুযোগ-সুবিধা লাভ করতে পারে।

সংবিধান চালু হওয়ার দশ বৎসরের মধ্যে রাষ্ট্র ১৪ বৎসরের নিম্নবয়স্ক বালক বালিকাদের জন্য অবৈতনিক এবং বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনেব ব্যবস্থা করবে। তপশীলভুক্ত জাতি ও সমাজের অন্যান্য দুর্বল শ্রেণীদের অর্থনৈতিক ও শিক্ষা সংক্রান্ত উন্নতি বিধান এবং সামাজিক অবিচার ও অন্যান্য প্রকার শোষণের কবল থেকে তাদের রক্ষা করাও রাষ্ট্রেব বিশেষ কর্তব্য বলে ঘোষণা করা হযেছে। গ্রামাঞ্চলে ব্যক্তিগত এবং যৌথ পরিচালনার ভিত্তিতে কুটিরশিল্পের প্রসার এবং কৃষি ও পশুপালন ব্যবস্থাকে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত ভাবে সংগঠন করাও রাষ্ট্রেব অন্যতম কর্তব্য বলে বিবেচিত হবে।

জীবনীশক্তির (level of nutrition), জীবনযাত্রার মান, জনস্বাস্থ্যের উন্নতি বিধান এবং স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর মাদকদ্রব্য বর্জনের ব্যবস্থার জন্য রাষ্ট্রকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যে সমস্ত স্থান ও জিনিসের আন্তর্জাতিক গুরুত্ব আছে, অথবা যেগুলি শিল্পকলা অথবা ইতিহাসের দিক থেকে উল্লেখ-যোগ্য সেগুলিকে সংরক্ষণ করার প্রচেষ্টাও রাষ্ট্রের অন্যতম কর্তব্য বলে বিবেচিত হবে।

রাষ্ট্র সরকারের প্রশাসনিক বিভাগ থেকে বিচার বিভাগকে পৃথক করার চেষ্টা করবে এবং সারা ভারতের নাগরিকদের জন্য একই প্রকার সিভিল কোড (civil code) প্রবর্তন করার চেষ্টা করবে।

পরিশেষে বলা হয়েছে, রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তাবিধানে বিভিন্ন জাতির মধ্যে ন্যায়সংগত ও মর্যাদাপুর্ণ সম্পর্ক স্থাপনে, আন্তর্জাতিক আইন ও চুক্তির প্রতি আস্থা স্থাপনে এবং শান্তিপুর্ণ উপায় আন্তর্জাতিক বিবাদ-বিসংবাদের নিষ্পত্তি করণে উৎসাহদানের চেষ্টা করবে।

রাষ্ট্র পরিচালনায় নির্দেশাত্মক নীতির পুর্বোক্ত অনুচ্ছেদগুলি প্রণয়নের ক্ষেত্রে কয়েকটি বিশেষ রাষ্ট্রনৈতিক আদর্শের প্রভাব সুস্পষ্ট। এই নীতিগুলির

অধিকাংশ বিধান সমাজতন্ত্রবাদের আদর্শে গঠিত হলেও মহাত্মা গান্ধীর কয়েকটি বিশেষ রাজনৈতিক আদর্শকেও এতে স্থান দেওয়া হয়েছে। স্ত্রী-পুরুষ ভেদ না করে প্রত্যেক নাগরিকের জন্য জীবিকা সংস্থানের অধিকার, জনকল্যাণের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রের বাস্তব সম্পদগুলির নিয়ন্ত্রণ, স্ত্রী-পুরুষ ভেদ না করে সমান কাজের জন্য সমান বেতনের অধিকার, রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক সামর্থ্যের মধ্যে যথাসম্ভব কর্মসংস্থান, শিক্ষা, এবং বৃদ্ধ ও অকর্মণ্য ব্যক্তিদের জন্য সরকারী ভাতা ইত্যাদি ক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক আদর্শ সুস্পষ্ট। অপরপক্ষে, সারা ভারত ব্যাপী গ্রামপঞ্চায়েতের প্রবর্তন, ব্যক্তিগত ও সমবায় মালিকানার ভিত্তিতে কুটিরশিল্পের প্রবর্তন ও সংরক্ষণ এবং অনুন্নত সম্প্রদায়কে সামাজিক অবিচার এবং অর্থনৈতিক শোষণের হাত থেকে রক্ষা করা ইত্যাদির ক্ষেত্রে গান্ধীজীর রাজনৈতিক আদর্শের প্রভাব সুস্পষ্ট।

বিভিন্ন রাজনৈতিক আদর্শের প্রভাব

অনেক সমালোচক বিভিন্ন দৃষ্টিভংগি থেকে এই নীতিগুলিকে সমালোচনা করেছেন। তার মধ্যে একটি বড় সমালোচনা হচ্ছে এই নীতিগুলিকে কাজে রূপ দিতে যদি সরকারকে বাধ্য করা না যায়, তাহলে এগুলিকে সংবিধানে স্থান দেওয়ার প্রয়োজন কি হতে পারে? এর উত্তরে বলা যেতে পারে যে, অনেক আদর্শকে বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে রূপায়িত করা সম্ভব না হলেও, আদর্শের মূল লক্ষ্য ও নীতিগুলি থেকে বিচ্যুত হওয়া উচিত নয়। তাছাড়া আমাদের দেশ গণতান্ত্রিক। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল বিভিন্ন সময়ে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতে পারে। রাজনৈতিক দলের পরিবর্তনের সংগে সংগে সরকারের কয়েকটি মৌলিক নীতির পরিবর্তন হলে, রাষ্ট্রের সামাজিক তথা অর্থনৈতিক প্রগতি ব্যাহত হতে পারে। এরূপ অবস্থায় রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশাত্মক নীতিগুলি থাকার জন্য যে কোন রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হোক না কেন এই সমস্ত নীতিগুলি সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য সেগুলিকে সহজে পরিবর্তন করা সম্ভব হবে না। তাতে রাষ্ট্র পরিচালনার নীতি সম্বন্ধে কিছুটা সমতা বজায় থাকবে। এই নীতিগুলি হয়ত কোন কারণে বাস্তবে রূপ দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না, কিন্তু এগুলি যেন সব সময় আইনসভার সদস্যদের মনে করিয়ে দেবে কোন্ অতি প্রয়োজনীয় আদর্শকে এখনও আইনের আকারে রূপ দিতে তাদের বাকী আছে। তাই রাষ্ট্র পরিচালনায় নীতিগুলি যে বাস্তবতা বিবর্জিত ভূয়া আদর্শ মাত্র—এ ধারণা আমাদের পোষণ

সমালোচনা

করা উচিত নয়। এই নীতিগুলির সবগুলি এখন পর্যন্ত বাস্তবে রূপায়িত না হলেও কিছু কিছু নীতিকে ইতিমধ্যেই প্রয়োগ করা হয়েছে। যেমন, সারা ভারতব্যাপী গ্রামপঞ্চায়েত প্রবর্তনের আদর্শ ইতিমধ্যে অনেকটা এগিয়ে গেছে। কোন কোন রাজ্যে শাসন বিভাগ থেকে বিচার বিভাগের পৃথকী-করণের পরিকল্পনাকেও কার্যকরী করা হযেছে। পরিশেষে উল্লেখযোগ্য যে, রাষ্ট্র পরিচালনায় নির্দেশাত্মক নীতিগুলির মত অনুরূপ নীতি পৃথিবীর আরও কয়েকটি রাষ্ট্রের সংবিধানেও স্থান পেয়েছে। বর্তমান আইরিশ সংবিধানে এবং ১৯৩১ সালের স্প্যানিশ সংবিধানে এই জাতীয় নীতির কথা বলা হয়েছে।

রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশাত্মক নীতিগুলিকে কার্যকরী করতে গিয়ে সরকারকে আজ আইন প্রণয়নের সংখ্যা বাড়াতে হয়েছে। এই কাজ করতে গিয়ে পার্লামেন্টের আইন অনেকক্ষেত্রে মৌলিক অধিকারগুলির সংগে অসংগতিপূর্ণ হচ্ছে সন্দেহ নেই। মৌলিক অধিকার এবং রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশাত্মক নীতির মধ্যে বিরোধ বাধলে সেক্ষেত্রে মৌলিক অধিকাবগুলিকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত বলে অনেকে মত প্রকাশ করেছেন। মাদ্রাজ রাজ্য বনাম সি আর শ্রীনিবাসনের মামলায় সুপ্রীমকোর্ট এই মত প্রকাশ করেন যে, রাষ্ট্রপরিচালনার নির্দেশাত্মক নীতিগুলিকে মৌলিক অধিকারের সংগে সংগতিপূর্ণ এবং তার পরিপুরক হিসেবে থাকতে হবে ("The directive principles of state policy have to conform to and run as subsidiary to the chapter of Fundamental Rights")। অপর পক্ষে আমাদের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী নেহেরু মৌলিক অধিকারের চাইতে রাষ্ট্রপরিচালনার নির্দেশাত্মক নীতিগুলিকেই অগ্রাধিকার দেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন।

অষ্টম অধ্যায়

রাষ্ট্রপতি

(President)

ভারতীয় ইউনিয়নের সর্বোচ্চ পদাধিকারী হচ্ছেন রাষ্ট্রপতি। সংবিধানের ৫৪ অনুচ্ছেদ অনুসারে রাষ্ট্রপতি একটি নির্বাচক মণ্ডলী দ্বারা পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হন। পার্লামেণ্টের উভয় কক্ষের নির্বাচিত সদস্যগণ এবং সমস্ত রাজ্য বিধানসভার নির্বাচিত সদস্যদের নিয়ে এই নির্বাচকমণ্ডলী গঠিত হয়। রাষ্ট্রপতিকে প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত না হওয়ার সংগত কারণ আছে। কারণটি হচ্ছে এই যে, মন্ত্রীসভা পরিচালিত শাসনব্যবস্থায় জনসাধারণের প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত মন্ত্রীসভার সদস্যরাই প্রকৃত ক্ষমতায় অধিকারী এবং রাষ্ট্রের প্রধান সেখানে নিয়মতান্ত্রিক প্রধান মাত্র। এই নিয়মতান্ত্রিক প্রধান যাঁর হাতে রাষ্ট্রের আসল ক্ষমতা ন্যস্ত নয়, প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে তাঁকে জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত হওয়ার বিধান অর্থহীন। তাঁকে জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচনের ব্যবস্থা করলে মন্ত্রীমণ্ডলীর ক্ষমতার প্রয়োগ ও পরিচালনা নিয়ে অযথা প্রতিদ্বন্দ্বিতার সৃষ্টি হতে পারে। তাছাড়া, নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রধানের নির্বাচনের জন্য এই বৃহৎ রাষ্ট্রে প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে এক বিরাট নির্বাচনযজ্ঞের অনুষ্ঠান করা অযথা খরচ সাপেক্ষও বটে।

নির্বাচন পদ্ধতি

রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের জন্য রাজ্যবিধান সভায় প্রত্যেক নির্বাচিত সদস্যদের ভোট সংখ্যা নির্ধারণের একটি পদ্ধতি নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। সংশ্লিষ্ট রাজ্যের মোট জনসংখ্যাকে উক্ত রাজ্যের বিধান সভায় মোট সদস্য সংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে যে ভাগফল পাওয়া যাবে তাকে আবার একহাজার দিয়ে ভাগ করলে যে ভাগফল পাওয়া যাবে সেইটিই হচ্ছে বিধান সভার প্রত্যেক নির্বাচিত সদস্যের মোট ভোট সংখ্যা। তবে দ্বিতীয় বার ভাগ করার পরে ভাগশেষ যদি পাঁচশতের বেশী হয় তাহলে ভাগফলের সংগে এক যোগ করে দেওয়া হবে। অনুরূপভাবে রাজ্যবিধানসভাগুলির সদস্যদের মোট ভোট সংখ্যাকে পার্লামেণ্টের উভয় পরিষদের নির্বাচিত সদস্যদের দ্বারা ভাগ করলে যে ভাগফল হবে সেইটিই হচ্ছে পার্লামেণ্টে প্রত্যেক নির্বাচিত সদস্যের মোট ভোট সংখ্যা। এক্ষেত্রেও ভাগশেষ পাঁচ শতের বেশী হলে ভাগফলের সংগে এক

যোগ করা হয়। রাজ্যসমূহের সমষ্টিগত ভোট এবং পার্লামেণ্টের নির্বাচিত সদস্যদের ভোট যাতে সমান হয় তার জন্যই এই ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়েছে। সমানুপাতিক নির্বাচন পদ্ধতিব মাধ্যমে একক হস্তান্তর যোগ্য ভোটের দ্বারা (Proportional representation by means of the single Transferable vote) এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ভোট দান প্রথা গোপন ব্যালেটের সাহায্যে পরিচালিত হবে। সাধারণতঃ একাধিক ব্যক্তির নির্বাচনের ক্ষেত্রে সমানুপাতিক নির্বাচন পদ্ধতিব ব্যবহার হয়। আমাদের সংবিধানে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনেব জন্য যে পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে সেটি পছন্দ নির্দেশক ভোটদান (Preferential Vote , পদ্ধতির সমতুল্য। ("The method of election really amounts to election by preferential vote and not proportional representation ")

যোগ্যতা

রাষ্ট্রপতিকে ভারতের নাগরিক এবং ৩৫ বৎসরের বেশী বয়স্ক অবশ্যই হতে হবে। তাছাড়া, রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হতে হলে লোকসভার সদস্য নির্বাচিত হবার যোগ্যতাও তাঁর থাকতে হবে। ৫৯ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, রাষ্ট্রপতি পার্লামেণ্টের কোন কক্ষের অথবা কোন রাজ্যের আইনসভার সদস্য হবেন না এবং এরূপ কোন সদস্য রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়ে থাকলে তিনি যেদিন থেকে রাষ্ট্রপতির পদ গ্রহণ করবেন সেই দিন থেকেই তাঁর সদস্য পদ ছেড়ে দিয়েছেন বলে ধরে নেওয়া হবে। রাষ্ট্রপতি কোন লাভজনক পদ গ্রহণ করতে পারবেন না।

অপসারণ পদ্ধতি

রাষ্ট্রপতি পাঁচ বৎসরের জন্য স্ব-পদে অধিষ্ঠিত থাকবেন। তিনি পুনঃনির্বাচিতও হতে পারবেন। সংবিধান বিরোধী কাজ করলে রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে ইমপীচমেণ্টের বিধান আছে। পার্লামেণ্টের উভয় কক্ষেব মধ্যে যে কোন কক্ষ ইমপীচমেণ্টের অভিযোগ আনতে পারে। যে কক্ষে ইমপীচমেণ্টের অভিযোগ আসবে তার এক চতুর্থাংশ সদস্যদের এই অভিযোগের প্রস্তাব সমর্থন করে ১৫ দিনের নোটিশ দিতে হবে। এই প্রস্তাব পাস হওয়ার পর উক্ত কক্ষের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের তাতে সমর্থন প্রয়োজন। যে পরিষদে এই প্রস্তাব পাস হবে, সেই পরিষদ তার সম্বন্ধে তদন্ত করতে পারবে না। অভিযোগকারী কক্ষ ছাড়া, অন্য কক্ষ এই অভিযোগের তদন্ত করবে। তদন্তকারী কক্ষের দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে যদি অভিযোগ সত্য বলে প্রমাণিত হয়, তাহলে রাষ্ট্রপতিকে তার পদ

থেকে অপসারিত করা চলবে। রাষ্ট্রপতিকে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য পেশ করার সুযোগ দিতে হবে।

সংবিধানে রাষ্ট্রপতির স্থান ও তাঁর ক্ষমতার স্বরূপ (Position of the President and the nature of his Powers)ঃ

আমাদের সংবিধানে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার স্বরূপ বিশ্লেষণ এক তর্কের বিষয়বস্তু। এমন কি আমাদের ভূতপূর্ব রাষ্ট্রপতি ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ স্বয়ং ১৯৬০ সালের ২৮শে নভেম্বর তারিখ দিল্লীতে Indian law Institute-এর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করতে গিয়ে তাঁর অভিভাষণে ইংলণ্ডের রাজার সংগে ভারতের রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার পার্থক্য কোথায় সে বিষয়ে অনুসন্ধান এবং গবেষণা করার জন্য আইনজ্ঞ ও সাংবিধানিক পণ্ডিতদের অনুরোধ জানান।

রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার স্বরূপ নির্ণয় প্রসংগে মূল প্রতিপাদ্য বিষয়টি হচ্ছে ; তাঁর ক্ষমতা কি ইংলণ্ডের রাজার ক্ষমতার অনুরূপ? অর্থাৎ, তিনি কি নিয়মতান্ত্রিক প্রধান মাত্র? তিনি যদি নিয়মতান্ত্রিক প্রধান মাত্র হন তাহলে তাঁকে ইংলণ্ডের রাজার মত মন্ত্রীসভার পরামর্শ অনুসারে চলতে হবে। অপর পক্ষে, মন্ত্রীসভার পরামর্শকে উপেক্ষা করে অথবা তা ব্যতিরেকে তাঁর চলার ক্ষমতা থাকলে তাঁকে নামসর্বস্ব রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে গণ্য করা চলে না। সেক্ষেত্রে তাঁর যথেষ্ট নিজস্ব ক্ষমতা আছে বলে ধরে নিতে হবে।

উপরোক্ত প্রশ্নের আলোচনা করতে হলে আমাদের প্রথমেই দেখতে হয় আমাদের সংবিধান রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা সম্বন্ধে কি বলছে। সংবিধানের ৫৩ (১) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, ইউনিয়নের শাসন সংক্রান্ত ক্ষমতা রাষ্ট্রপতি নিজে অথবা তাঁর অধীনস্থ কর্মাধ্যক্ষদের মাধ্যমে পরিচালিত করবেন। এক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতির মন্ত্রীদের পরামর্শ না নিয়ে স্বয়ং কাজ করার অবকাশ রয়েছে। সংবিধানের ৭৪ অনুচ্ছেদের (১) ধারায় বলা হয়েছে "রাষ্ট্রপতিকে তাঁর কার্যাবলী পরিচালনার ক্ষেত্রে সাহায্য করা ও পরামর্শ দেওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি মন্ত্রীপরিষদ থাকবে।" (There shall be a Council of Ministers with the Prime Minister at the head to aid and advise the President in the exercise of his functions.") এই অনুচ্ছেদটিতে রাষ্ট্রপতিকে কেবলমাত্র সাহায্য ও পরামর্শ দেওয়ার জন্যই মন্ত্রীপরিষদের কথা বলা হয়েছে। সাহায্য করা বা পরামর্শ দেওয়ার মধ্যে

বাধ্যতামূলক কিছু থাকতে পারে না। অর্থাৎ রাষ্ট্রপতি প্রয়োজন মনে করলে মন্ত্রীপরিষদের পরামর্শ উপেক্ষা করেও কাজ করতে পারেন। প্রকৃতপক্ষে ৭৪ অনুচ্ছেদের (১) ধারার মধ্যে এমন কোন ভাষা ব্যবহার করা হয়নি যার দ্বারা রাষ্ট্রপতিকে মন্ত্রী পরিষদদের পরামর্শ গ্রহণ করতে বাধ্য করা হয়েছে। সুতরাং স্পষ্টতঃই দেখা যাচ্ছে সংবিধান ভাষার দ্বারা রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা সংকুচিত বা খর্ব করেনি।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, সংবিধান ভাষার সাহায্যে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা সংকুচিত না করার জন্য আমরা তাঁকে নিয়মতান্ত্রিক বা নামসর্বস্ব প্রধান বলে জ্ঞান না করে প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী বলে বিবেচনা করব কি? এর উত্তর বলা যেতে পারে যে, সংবিধানের ভাষা সংবিধানের চরম কথা নয়। রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার আলোচনা প্রসংগে অধ্যাপক দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এক প্রবন্ধে[1] মেটল্যাণ্ড (Maitland) এবং বেজহট (Bagehot)-এর উদ্ধৃতির সাহায্যে দেখিয়েছেন যে, কোন দেশের সংবিধানকে বুঝতে হলে তার ভাষার দিকে তাকালেই চলবে না, তার সংবিধানিক নীতি (Constitutional morality) এবং প্রচলিত প্রথা ও রীতিনীতির দিকটিও লক্ষ্য করতে হবে। প্রকৃতিপক্ষে সংবিধানকে বুঝতে হলে তার বাহ্যিক আকৃতি (Outward show) ভেদ করে তার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য টিকেও (inner Verities) আবিষ্কার করার চেষ্টা করতে হবে। অবশ্য আমাদের সংবিধান বেশীদিন চালু হয়নি যার জন্য সাংবিধানিক রীতিনীতি গড়ে উঠতে হয়ত এখন সময় লাগবে। তবে পার্লামেণ্ট চালিত শাসনব্যবস্থায় কতকগুলি চিরাচরিত নিয়ম-কানুন আছে এবং সেগুলি আমাদের সংবিধানের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। তাছাড়া, সংবিধানিক পণ্ডিতদের আলোচনা, গণপরিষদের সদস্যদের উক্তি ইত্যাদির মাধ্যমে আমাদের রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার স্বরূপ বিশ্লেষণের চেষ্টা করতে হবে। অবশ্য রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা কিরূপ হবে সে নিয়ে গণপরিষদের সদস্যদের মধ্যে মতান্তরের অভাব ছিল না। অধ্যাপক কে. টি. সাহ্ আমাদের রাষ্ট্রপতিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির মত ক্ষমতাশালী করার স্বপক্ষে অভিমত প্রকাশ করেছিলেন। অপরপক্ষে, ডঃ আম্বেদকর, নেহেরু, সর্দার প্যাটেল, কে. এম. মুন্সী প্রভৃতি সদস্যরা ইংল্যাণ্ডের শাসনব্যবস্থার অনুকরণে আমাদের দেশে কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থার রূপ দেওয়ার স্বপক্ষে মত প্রকাশ করেছিলেন। এঁরাই ছিলেন গণপরিষদের

1. Political quarterly, Volum XXVI, No. 1, Jan. to March, 1955.

শক্তিশালী গোষ্ঠী। তাই এঁদের ধারণাই সংবিধানে শেষ পর্যন্ত রূপ পরিগ্রহ করেছে বলে আমরা ধরে নিতে পারি।

যদিও সংবিধানে বলা হয়েছে যে কেন্দ্রের শাসন সংক্রান্ত ক্ষমতা রাষ্ট্রপতি উপর ন্যস্ত হবে, তথাপি এই ক্ষমতা যে তাঁকে সংবিধান অনুসারে (In accordance with the Constitution) পরিচালিত করতে হবে একথারও সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে। সংবিধানে ৭৪ (১) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, "রাষ্ট্রপতিকে তাঁর কাজে সাহায্য করা ও পরামর্শ দেওয়ার জন্য প্রধান মন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি মন্ত্রীপরিষদ থাকবে।" (There shall be a Council of Ministers with the Prime Minister at the head to aid and advise the President in the exercise of his functions)। রাষ্ট্রপতি এই মন্ত্রীসভার পরামর্শ উপেক্ষা করলে মন্ত্রীসভা স্বভাবতই পদত্যাগ করবেন এবং সেই পদত্যাগের ফলে শাসনব্যবস্থার পরিচালনা ক্ষেত্রে যে অচল অবস্থার সৃষ্টি হবে তা স্পষ্টই সংবিধানবিরোধী। এই ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতিকে স্বভাবতই সংবিধান ভংগের অভিযোগে অভিযুক্ত হতে হবে। সেদিক থেকে বিচার করলে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, রাষ্ট্রপতি সাধারণতঃ মন্ত্রীসভার পরামর্শ অনুসারে পরিচালিত হবেন এবং সেই অর্থে তিনি ইংলণ্ডের রাজার মত অথবা ফ্রান্সের চতুর্থ রিপাবলিকের রাষ্ট্রপতির মত নিয়মতান্ত্রিক প্রধান মাত্র।

পার্লামেণ্ট চালিত শাসনব্যবস্থাব চিরাচরিত রীতিনীতি, সাংবিধানিক পণ্ডিতদের আলোচনা, গণপরিষদের সদস্যদের উক্তি ইত্যাদির মাধ্যমে আমাদের রাষ্ট্রপতির যথার্থ স্থান নির্ণয়ের চেষ্টা করা উচিত। অবশ্য রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা কিরূপ হবে সেই নিয়ে তিনটি বিশেষ ধরনের অভিমত সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। অধ্যাপক কে. টি. শাহ্ আমাদের রাষ্ট্রপতিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির মত সমান ক্ষমতাশালী করার সপক্ষে অভিমত প্রকাশ করেছিলেন। ডঃ আম্বেদকর, নেহেরু, সর্দার পেটেল, কে, এম্, মুন্সী প্রভৃতি সদস্যেরা ইংলণ্ডের শাসনব্যবস্থার অনুকরণে কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থাকে রূপ দেওয়ার স্বপক্ষে মত প্রকাশ করেছিলেন। এঁরাই ছিলেন গণপরিষদের সদস্যদের মধ্যে শক্তিশালী গোষ্ঠী এবং এঁদের ধারণাই সংবিধানে রূপ পরিগ্রহ করেছে বলে আমরা ধরে নিতে পারি। কয়েকজন কংগ্রেসী ও অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে অনেকে রাষ্ট্রপতিকে জাতীয় ঐক্যের প্রতীক হিসেবে কাজ করার সুযোগ দেওয়ার জন্য তাঁকে উপযুক্ত ক্ষমতায় ক্ষমতাশালী করার স্বপক্ষে মতপ্রকাশ করেছিলেন।

রাষ্ট্রপতির ক্ষমতাগুলিকে প্রধানতঃ পাঁচটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে, যথা—(১) শাসনসংক্রান্ত ক্ষমতা (Executive Powers), (২) জরুরী ক্ষমতা (Emergency Powers) (৩) আইনপ্রণয়ন সংক্রান্ত ক্ষমতা (Legislative Powers), (৪) অর্থ সংক্রান্ত ক্ষমতা (Financial Powers) এবং (৫) বিচার সংক্রান্ত ক্ষমতা (Judicial Powers)।

শাসন সংক্রান্ত ক্ষমতা (Executive Powers) : ভারতের রাষ্ট্রপতি মার্কিন রাষ্ট্রপতির মত ক্ষমতাশালী না হলেও সংবিধানের নির্দেশ অনুযায়ী তিনিই প্রশাসনিক প্রধান (Executive head) হিসেবে কাজ করবেন। কেন্দ্রের সমস্ত প্রশাসনিক কার্যাদি রাষ্ট্রপতির নামে পরিচালিত হবে। ৫৩ (১) অনুচ্ছেদ অনুসারে সকল সরকারী কর্মচারী তাঁর অধীন এবং শাসন সংক্রান্ত সমস্ত বিষয় তাঁর জানবার অধিকার আছে।

রাষ্ট্রপতি প্রধান মন্ত্রীকে নিয়োগ করেন এবং তাঁর পরামর্শক্রমেই অন্যান্য মন্ত্রীদের নিয়োগ করে থাকেন। রাষ্ট্রপতি সুপ্রীম কোর্টের এবং হাইকোর্টের বিচারপতি, রাজ্যের রাজ্যপাল, ভারতের অ্যাটর্নী জেনারেল (Attorney-General of India), কণ্ট্রোলার ও অডিটর জেনারেল (The Comptroller and Auditor-General of India), ফিনান্স কমিশন (Finance Commission), কেন্দ্রীয় পাবলিক সার্ভিস কমিশন (Union Public Service Commission), অন্যান্য রাজ্যের জন্য যুক্ত কমিশনগুলি, প্রধান নির্বাচন কমিশনার (The Chief Election Commissioner), নির্বাচন কমিশনের অন্যান্য সদস্যগণ, তপশীলভুক্ত জাতি ও উপজাতিদের জন্য বিশেষ কর্মচারী প্রভৃতিদের নিয়োগ করেন। রাষ্ট্রপতি যে কোন মন্ত্রী, রাজ্যপাল এবং অ্যাটর্নী জেনারেলকে পদচ্যুত করতে পারেন। অবশ্য এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, রাষ্ট্রপতি বর্তমানে নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্রপ্রধান। সুতরাং তাঁর বরখাস্ত করার ক্ষমতাও মন্ত্রীপরিষদের ইচ্ছা অনুসারেই প্রযুক্ত হবে বলে আশা করা যায়।

রাষ্ট্রপতি প্রতিরক্ষাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক। সংবিধানের ৫৩ (২) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, "ভারতের প্রতিরক্ষাবাহিনীর চূড়ান্ত পরিচালনার ভার রাষ্ট্রপতির হাতে ন্যস্ত থাকবে" এবং তা আইন অনুসারে পরিচালিত হবে (The Supreme Command of the defence forces of the Union shall be vested in the President and the exercise thereof shall be regulated by law)।

রাষ্ট্রপতি মন্ত্রীসভার পরামর্শ অনুসারে অন্যান্য রাষ্ট্রের সংগে সন্ধিচুক্তি ও অন্যান্য মীমাংসা সংক্রান্ত আলোচনায় অবতীর্ণ হতে পারেন। তবে এই জাতীয় পররাষ্ট্র সম্বন্ধীয় কার্যাবলী পার্লামেণ্টের অনুমোদন সাপেক্ষ।

জরুরী ক্ষমতা (**Emergency Powers**): আমাদের সংবিধানে তিন প্রকার জরুরী অবস্থার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যথা—(১) যুদ্ধ, বহিঃশত্রুর আক্রমণ, আভ্যন্তরীণ বিশৃংখলা অথবা তার সম্ভাবনাজনিত জরুরী অবস্থা। (২) রাজ্যের সংবিধানযন্ত্রের অচলঅবস্থা হেতু জরুরী অবস্থা এবং (৩) অর্থনৈতিক জরুরী অবস্থা। এই জরুরী অবস্থাগুলি নিরসণকল্পে রাষ্ট্রপতির হাতে প্রচুর ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে।

রাষ্ট্রপতি যদি মনে করেন যে যুদ্ধ, বহিঃশত্রুর আক্রমণ, আভ্যন্তরীণ বিশৃংখলা অথবা তার সম্ভাবনার জন্য ভারতের নিরাপত্তা ক্ষুন্ন হতে চলেছে তা হলে তিনি ঐ মর্মে একটি ঘোষণা জারী করবেন। এই ঘোষণা পার্লামেণ্টের উভয় কক্ষের সম্মতির জন্য উপস্থাপিত করতে হবে এবং দুই মাসের মধ্যে পার্লামেণ্টের সম্মতি না পেলে ঐ সময় অতিক্রান্ত হওয়ার সংগে সংগে তা বাতিল হয়ে যাবে।

জরুরী অবস্থা ঘোষিত হলে আমাদের সংবিধানের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো অনেকটা ক্ষুণ্ণ হয়। এক্ষেত্রে পার্লামেণ্টের রাজ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত বিষয় বস্তুগুলির উপরেও আইন তৈরী করার ক্ষমতা থাকবে এবং রাজ্যের আইন সভার আইন পার্লামেণ্টের এই মর্মে প্রণীত কোন আইনের সংগে অসংগতিপুর্ণ হলে, রাজ্যের আইনের অসংগতিপুর্ণ অংশটুকু বাতিল হয়ে যাবে এবং কেন্দ্রের আইনটি বলবৎ হবে। প্রশাসনিক ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও রাজ্য সরকারকে কেন্দ্রীয় সরকার প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিতে পারবে। জরুরী অবস্থায় সংবিধানে ১৯ অনুচ্ছেদে উল্লেখিত মৌলিক অধিকারগুলি স্থগিত থাকবে। ১৯ অনুচ্ছেদে উল্লেখিত এই অধিকারগুলি হচ্ছে:

(ক) বাক-স্বাধীনতা (খ) শান্তিপুর্ণভাবে জমায়েত হবার অধিকার (গ) সংঘগঠনের স্বাধীনতা (ঘ) সারা ভারতের যে কোন স্থানে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করার স্বাধীনতা (ঙ) ভারতের যে কোন স্থানে বসতি স্থাপনের স্বাধীনতা (চ) সম্পত্তির অধিকার সংরক্ষণ ও বিক্রয়ের স্বাধীনতা এবং (ছ) যে কোন বৃত্তি পরিচালনা বা জীবিকা গ্রহণের স্বাধীনতা।

নাগরিক অধিকার ভংগ হলে ক্ষুব্ধ নাগরিকের বিচারালয়ে অভিযোগের যে অধিকার সংবিধানে স্বীকার করা হয়েছে জরুরী অবস্থায় রাষ্ট্রপতি সেই অধিকার উপভোগ স্থগিত রাখতে পারেন। কেন্দ্র ও অংগ রাজ্যগুলির মধ্যে রাজস্ব সংক্রান্ত বিধানগুলির প্রয়োগও রাষ্ট্রপতি সাময়িকভাবে স্থগিত রাখতে পারেন।

প্রেসিডেন্টের জরুরী ক্ষমতার যৌক্তিকতা

জরুরী অবস্থায় একজন মাত্র ব্যক্তি অর্থাৎ রাষ্ট্রপতির হাতে এত অধিক ক্ষমতা ন্যস্ত হওয়ায় অনেকের মনে হতে পারে যে সংবিধানের জরুরী অবস্থা সংক্রান্ত বিধানগুলি অ-গণতান্ত্রিক। আসলে কি তাই? রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ক্ষুন্ন হলে নাগরিক জীবনের স্বাধীনতা ও অধিকারও ক্ষুন্ন হয়। রাষ্ট্রই নাগরিকের সর্ববিধ অধিকারের নিরাপত্তা বিধান করে। রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ক্ষুন্ন হলে নাগরিকের মৌলিক অধিকারও ক্ষুন্ন হবে—একথা আমরা নিঃসন্দেহে বলতে পারি। পৃথিবীর অন্যান্য স্বাধীন রাষ্ট্রেও বিপদকালীন অবস্থায় সরকার কর্তৃক মৌলিক অধিকার স্থগিত রাখার নিদর্শন বিরল নয়। গ্রেটব্রিটেনে পার্লামেন্ট যে কোন সময়ে যে কোন নাগরিক অধিকার স্থগিত রাখতে পারে অথবা নাকচ করে দিতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস জরুরী অবস্থায় হেভিয়াস কার্পাস সংক্রান্ত মৌলিক অধিকার স্থগিত রাখতে পারে। অবশ্য এই প্রসংগে উল্লেখযোগ্য যে, এই সমস্ত দেশে অধিকারগুলি স্থগিত রাখার অধিকার জনপ্রতিনিধিমূলক আইনসভাকে দেওয়া হয়েছে—শাসন বিভাগকে নয়। কিন্তু ভারতের ক্ষেত্রে শাসনবিভাগ জরুরী অবস্থা ঘোষণার সংগে সংগে স্বাভাবিকভাবেই এই অধিকারগুলির উপভোগ স্থগিত হয়ে যাবে। সেদিক থেকে বিচার করলে জরুরী অবস্থায় এই বিধানগুলিকে কিছুটা অ-গণতান্ত্রিক বলে বিবেচনা করা যেতে পারে।

সংবিধান অনুসারে রাজ্যের শাসনযন্ত্রের অচলতা হেতু জরুরী অবস্থা

সংবিধানের ৩৫৬ অনুচ্ছেদ অনুসারে কোন রাজ্যের রাজ্যপালের রিপোর্ট পেয়ে অথবা অন্য যে কোন সূত্রে অবগত হয়ে রাষ্ট্রপতি যদি মনে করেন যে, সেই রাজ্যে এমন এক অবস্থার উদ্ভব হয়েছে যার ফলে সংবিধানের নিয়ম অনুসারে সেখানকার শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করা সম্ভব নয়; তাহলে সেই মর্মে তিনি একটি ঘোষণা জারী করবেন। এই ঘোষণার দ্বারা সেই রাজ্যের কেবলমাত্র আইনসভা এবং হাইকোর্টের ক্ষমতা ব্যতীত সরকারের অন্যান্য যাবতীয়

কার্যাবলী এবং রাজ্যপাল অথবা যে কোন কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা রাষ্ট্রপতি স্বয়ং গ্রহণ করতে পারেন। তাছাড়া, সেই রাজ্যের আইনসভার ক্ষমতা কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টের দ্বারা অথবা তার নির্দেশ অনুযায়ী পরিচালিত হবে বলে ঘোষণা করতে পারেন।

এই প্রসংগে উল্লেখযোগ্য যে ১৯৩৫ সালের ভারত-শাসন আইনে ৯৩ ধারা অনুসারে কোন প্রদেশের শাসনব্যবস্থা অচল হলে সেখানকার আইন প্রণয়ন-সংক্রান্ত এবং শাসন-সংক্রান্ত ক্ষমতা উক্ত প্রদেশের গভর্ণরের হাতে ন্যস্ত করা হয়েছিল, কিন্তু বর্তমান সংবিধানের বিধান অনুসারে কোন অংগরাজ্যের শাসনব্যবস্থা সংবিধানের নিয়ম অনুসারে পরিচালিত হওয়া অসম্ভব হলে তার শাসন-সংক্রান্ত ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির উপর ন্যস্ত হয়েছে এবং আইন প্রণয়ন-সংক্রান্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টের উপর অর্পণ করা হয়েছে। এই প্রসংগে উল্লেখযোগ্য যে, প্রথম প্রকারের আপৎকালীন অবস্থায় রাষ্ট্রপতি মৌলিক অধিকার ভংগের বিরুদ্ধে আদালতে নালিশ করার অধিকারকে স্থগিত রাখতে পারেন, কিন্তু দ্বিতীয় প্রকার অবস্থায়—অর্থাৎ কোন অংগরাজ্যে সংবিধান অনুসারে শাসনব্যবস্থা অচল হলে রাষ্ট্রপতি মৌলিক অধিকার ভংগের বিরুদ্ধে আদালতে নালিশ করার অধিকারে হস্তক্ষেপ করতে পারেন না। দ্বিতীয়তঃ, আপৎকালীন অবস্থায় কেন্দ্রের রাজ্যসরকারকে প্রশাসনিক নির্দেশ দেবার অধিকার থাকলেও রাজ্যের সরকারী কাঠামোকে বাতিল করা হয় না। অর্থাৎ, আইনসভাসহ রাজ্যসরকারের শাসনযন্ত্র যথারীতি কাজ করে যায়, শুধু কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতাটি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় মাত্র। কিন্তু দ্বিতীয় প্রকার অবস্থায়, অর্থাৎ অংগরাজ্যের শাসনব্যবস্থা সংবিধান অনুসারে পরিচালিত না হলে—অংগরাজ্যের শাসনযন্ত্রকে বাতিল করে কেন্দ্রীয় সরকার—রাষ্ট্রপতি এবং কেন্দ্রীয় আইনসভা সেই রাজ্যের সরকার পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি রাজ্যের যে কোন ক্ষমতা স্বয়ং গ্রহণ করতে পারেন এবং রাজ্যের আইনসভার কার্যাবলী পার্লামেন্ট কর্তৃক অথবা পার্লামেন্টের আদিষ্ট কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পরিচালিত হয়।

অর্থনৈতিক জরুরী অবস্থা

সংবিধানে উল্লেখিত জরুরী অবস্থা হচ্ছে অর্থনৈতিক জরুরী অবস্থা। রাষ্ট্রপতি যদি মনে করেন যে ভারতের অথবা তার কোন অংশের অর্থনৈতিক ভিত্তি (Financial Stability or Credit of India) ক্ষুন্ন হতে চলেছে তাহলে তিনি সেই মর্মে এক ঘোষণা জারী

করবেন। এই ঘোষণা পার্লামেণ্টের উভয় কক্ষের সম্মতির জন্য উপস্থাপিত হবে এবং পার্লামেণ্টের উভয় কক্ষ কর্তৃক সমর্থিত না হলে ছু' মাস পরে তা বাতিল হয়ে যাবে। অর্থনৈতিক জরুরী অবস্থাকালীন কেন্দ্রীয় শাসন কর্তৃপক্ষ যে কোন অংগরাজ্যেকে কয়েকটি অর্থনৈতিক বিধি-নিষেধ সম্বন্ধে নির্দেশ দিতে পারেন। এই নির্দেশ কোন অংগরাজ্যের যে কোন শ্রেণীর ব্যক্তির বেতন ও ভাতা কমাবার নির্দেশ হতে পারে এবং রাজ্যের আইন সভা কর্তৃক পাস হওয়া অর্থসংক্রান্ত বিল রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য সংরক্ষণের নির্দেশও হতে পারে।

আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত ক্ষমতা (Legislative Powers): সমস্ত বিল পার্লামেণ্টের উভয় কক্ষ কর্তৃক পাস হওয়ার পর রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য উপস্থাপিত হতে হবে। অর্থ সংক্রান্ত বিল ছাড়া অন্য যে কোন বিল রাষ্ট্রপতি প্রথমে সম্মতি নাও দিতে পারেন, কিন্তু ঐ বিল পার্লামেণ্টের উভয় কক্ষ কর্তৃক পুনরায় পাস হলে রাষ্ট্রপতিকে তাতে সম্মতি দিতেই হবে। সমস্ত প্রকার অর্থ বিল (money bill) ও ব্যয় বরাদ্দের দাবী রাষ্ট্রপতির পূর্ব সম্মতি ব্যতিরেকে পার্লামেণ্টে উত্থাপিত করা যায় না। পার্লামেণ্টের কোন কক্ষের অধিবেশনের সময় ছাড়া, অন্য যে কোন সময় রাষ্ট্রপতি অর্ডিন্যান্স জারী করতে পারেন। এই অর্ডিন্যান্স পার্লামেণ্ট প্রণীত আইনের মতই কার্যকরী হবে। এইরূপ অর্ডিন্যান্স পার্লামেণ্টের উভয় কক্ষের সম্মুখে তাদের সম্মতির জন্য উপস্থাপিত হবে এবং পার্লামেণ্টের অধিবেশনের ছ' সপ্তাহ পরেই তার আয়ুষ্কাল শেষ হয়ে যাবে। অবশ্য পার্লামেণ্ট সম্মতি না দিলে, এই অসম্মতিসূচক প্রস্তাব পাস হওয়ার সংগে সংগেই এই অর্ডিন্যান্স বাতিল হয়ে যাবে।

অর্থ-সংক্রান্ত ক্ষমতা (Financial Powers): প্রত্যেক আর্থিক বৎসরের প্রারম্ভে রাষ্ট্রপতি সেই বৎসরের একটি আনুমানিক আয় এবং ব্যয়ের বিবরণ পার্লামেণ্টের সম্মুখে উপস্থাপিত করাবেন। রাষ্ট্রপতির অনুমতি ব্যতিরেকে কোনরূপ ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব পার্লামেণ্টে উপস্থাপিত করা যায় না। রাজস্ব কমিশন (Finance Commission) নিয়োগ করাও রাষ্ট্রপতির অন্যতম কর্তব্য। এই কমিশনের সুপারিশ এবং তার উপর গৃহীত ব্যবস্থা সম্বন্ধে পার্লামেণ্টে বিবরণ উপস্থাপিত করানও রাষ্ট্রপতির কর্তব্য হিসেবে বর্ণিত হয়েছে।

বিচার-সক্রান্ত ক্ষমতা (Judicial Powers): রাষ্ট্রপতি প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তির দণ্ড মকুব (Commutation) করে অন্য দণ্ড দিতে পারেন। কেন্দ্রের প্রশাসনিক ক্ষমতার সংগে জড়িত আইন ভংগের ক্ষেত্রে এবং কোর্ট

মার্শালের দণ্ডাজ্ঞার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপতি অপরাধীকে মার্জনা (pardon) করতে পারেন, দণ্ড দান মুলতুবি (reprieve) রাখতে পারেন অথবা দণ্ড ভোগের কাল কমিয়ে (remission) দিতে পারেন।

প্রয়োজন বোধে রাষ্ট্রপতি সংবিধানের ব্যাখ্যা সংক্রান্ত প্রশ্নে অথবা জনস্বার্থের সংগে জড়িত যে কোন প্রশ্নে সুপ্রীম কোর্টের পরামর্শ গ্রহণ করতে পারেন।

ভারতের রাষ্ট্রপতি ও মার্কিন রাষ্ট্রপতি (The President of India and the President of U. S. A.):

মার্কিন রাষ্ট্রপতির সংগে ভারতের রাষ্ট্রপতির তুলনা প্রসংগে প্রথমেই নির্বাচন পদ্ধতির উল্লেখ করতে হয়। মার্কিন রাষ্ট্রপতি পরোক্ষভাবে জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত এক নির্বাচনীসংস্থা কর্তৃক নির্বাচিত হন, কিন্তু ভারতের রাষ্ট্রপতি পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হলেও এই নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করে এমন এক নির্বাচকমণ্ডলী যারা হচ্ছেন পার্লামেণ্টের উভয় কক্ষের এবং রাজ্য বিধানসভায় নির্বাচিত সদস্য।

ভারতের রাষ্ট্রপতি পুনর্নির্বাচিত হতে পারেন, কিন্তু মার্কিন রাষ্ট্রপতি মাত্র দ্বিতীয়বার নির্বাচিত হতে পারেন। মার্কিন সংবিধানের দ্বাবিংশ সংশোধনের দ্বারা রাষ্ট্রপতির দ্বিতীয় বারের বেশী নির্বাচিত হওয়া নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

মার্কিন রাষ্ট্রপতির অপসারণের জন্য হাউস অব্ রিপ্রেসেন্টেটিভস্ (House of Representatives)-কে অভিযোগ আনতে হয় এবং অপর কক্ষ সিনেট (Senate)-কে তার বিচার করতে হয়। কিন্তু ভারতের ক্ষেত্রে পার্লামেণ্টের উভয় কক্ষের যে কোন কক্ষ অভিযোগ আনবে, এবং অপর কক্ষ তার তদন্ত করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

ক্ষমতার দিক থেকেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির সংগে ভারতের রাষ্ট্রপতির যথেষ্ট পার্থক্য আছে। মার্কিন সংবিধান রাষ্ট্রপতিকে শুধু রাষ্ট্রের প্রধান পদাধিকারই করেনি, সমগ্র শাসনব্যবস্থার কর্তৃত্ব ও দায়িত্ব তাঁরই উপর ন্যস্ত হয়েছে। শাসনব্যবস্থা পরিচালনায় সেখানে একটি মন্ত্রীপরিষদ আছে বটে তবে তাঁরা কেউই আইন পরিষদের সদস্য নন। তাঁরা রাষ্ট্রপতিকে সরকার পরিচালনা ব্যাপারে সাহায্য করেন বটে তবে রাষ্ট্রপতি তাঁদের উপদেশ গ্রহণ নাও করতে পারেন। সংক্ষেপে বলা যায় যে, তাঁরা রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত এক শ্রেণীর উচ্চপদস্থ কর্মচারীমাত্র। শাসনব্যবস্থা পরিচালনার আসল কর্তৃত্ব

রাষ্ট্রপতির। কিন্তু ভারতের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি নিয়মতান্ত্রিক প্রধানমাত্র। এখানে শাসনব্যবস্থার প্রকৃত ক্ষমতা মন্ত্রীপরিষদই পরিচালনা করে। এই মন্ত্রীসভার সদস্যরা আইনসভার সদস্য এবং এর প্রতি দায়িত্বশীল। আইন-সভায় প্রতি দায়িত্বসম্পন্ন মন্ত্রীসভার পরামর্শ ও সাহায্য রাষ্ট্রপতিকে অনিবার্য ভাবেই গ্রহণ করতে হয। অবশ্য ভারতের ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির কেউই আইন পরিষদের সদস্য নন।

অবশ্য কতকগুলি বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্র ভারতের রাষ্ট্রপতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির চাইতে বেশী ক্ষমতা ভোগ করেন। ভারতের রাষ্ট্রপতি রাজ্যের রাজ্যপালদের নিয়োগ করেন, কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গভর্ণরেরা জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত হন। জরুরী অবস্থায় ভারতের রাষ্ট্রপতি রাজ্যের শাসন-ব্যবস্থাকে সাময়িকভাবে রহিত করে এবং কতকগুলি মৌলিক অধিকারগুলিকে স্থগিত রেখে সমগ্র শাসনব্যবস্থা নিজের হাতে গ্রহণ করতে পারেন। অর্থাৎ, এই সময় অংগরাজ্যের সমগ্র শাসনব্যবস্থা কেন্দ্রেব পরিচালনায় নিযন্ত্রিত হবে, কিন্তু মুল রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থাকে এইভাবে রহিত করার ক্ষমতা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির নেই।

মার্কিন যুক্তবাষ্ট্র ও ভারতের বাষ্ট্রপতির আইন সংক্রান্ত ক্ষমতার ব্যাপারে উল্লেখ করতে হয় যে, উভয় দেশেই রাষ্ট্রপতির সম্মতি ব্যতিরেকে আইনসভা প্রণীত কোন বিল আইনে পরিণত হতে পারে না। উভযেরই আইনসভা প্রণীত আইনকে সাময়িক ভাবে নাকচ (veto) করে দেওয়ার ক্ষমতা রয়েছে। তবে ভারতের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতির নাকচ করা বিল, পার্লামেণ্টের দ্বারা পুনরায় সাধারণ সংখ্যাধিক্যে পাস হতে পারবে। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্রে এজন্য দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যেব সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রয়োজন। তাছাড়া, অর্থনৈতিক জরুরী আবস্থায় রাষ্ট্রপতি সকল শ্রেণীর কর্মচারী, এমনকি সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিদের বেতনও কমিয়ে দিতে পারেন কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি এ প্রকারের কোন ক্ষমতা ভোগ করেন না।

এই সমস্ত কয়েকটি ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির চাইতে আমাদের রাষ্ট্রপতি কিছু ক্ষমতা ভোগ করলেও আমাদের ভুললে চলবে না যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি পৃথিবীর সমস্ত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পদাধিকারীদের চাইতে বেশী ক্ষমতাশালী। কিন্তু ভারতের রাষ্ট্রপতি একটি শক্তিশালী মন্ত্রীসভার নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত একটি নিয়মতান্ত্রিক প্রধানমাত্র।

উপরাষ্ট্রপতি (Vice-President) :

ভারতের উপরাষ্ট্রপতি পরোক্ষভাবে একক হস্তান্তরযোগ্য ও সমানুপাতিক নির্বাচন পদ্ধতির মাধ্যমে নির্বাচিত হন। এই নির্বাচনে রাজ্যের বিধানসভার প্রতিনিধিরা অংশ গ্রহণ করেন না। পার্লামেণ্টের দুই কক্ষের সদস্যরা এক মিলিত বৈঠকে উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচিত করেন।

উপরাষ্ট্রপতিও পাঁচ বৎসরের জন্য স্ব-পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। রাজ্যসভার অধিকাংশ সদস্যের প্রস্তাব ক্রমে এবং লোকসভার সম্মতিক্রমে তাঁকে অপসারণ করা যেতে পারে।

সংবিধানে রাষ্ট্রপতির পরেই উপরাষ্ট্রপতির স্থান। তিনি পদাধিকার বলে রাজ্যসভার অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। রাষ্ট্রপতির মৃত্যু ঘটলে, পদত্যাগ করলে, পদ থেকে অপসারিত হলে অথবা অন্য যে কোন কারণে তাঁর পদ শূন্য হলে উপরাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রপতির কাজ করেন। অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে রাষ্ট্রপতি তাঁর কার্য পরিচালনায় অক্ষম হলে উপরাষ্ট্রপতি তাঁর কাজ পরিচালনা করবেন। উপরাষ্ট্রপতি যখন রাষ্ট্রপতির কাজ পরিচালনা করেন, তখন রাজ্যসভার অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন না। এই সময় রাজ্যসভার সহ-সভাপতি রাজ্যসভার কাজ পরিচালনা করেন।

মন্ত্রীসভার কার্যাবলী (Functions of Council of Ministers) :

সংবিধানে মন্ত্রীপরিষদ (Council of Ministers) শব্দটির উল্লেখ আছে মাত্র। সেখানে মন্ত্রীদের কোন শ্রেণীবিভাগ নেই। কিন্তু বর্তমানে মন্ত্রীদের তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়; যথা—কেবিনেটভুক্ত মন্ত্রীমণ্ডলী (Cabinet Ministers), রাষ্ট্রমন্ত্রী (State Ministers) এবং উপমন্ত্রী (Deputy Ministers)। এই তিন শ্রেণীর মন্ত্রীগণ ছাড়া, কয়েকজন পরিষদ সচিব (Parliamentary Secretaries)-ও আছেন।

কেবিনেটভুক্ত মন্ত্রীমণ্ডলী সরকারের গুরুত্বপূর্ণ বিভাগগুলি পরিচালনা করেন এবং সর্বাধিক মর্যাদার অধিকারী। পররাষ্ট্র, স্বরাষ্ট্র, অর্থ, রেলওয়ে, যানবাহন, ডাক ও তার, শিল্প ও বাণিজ্য, শিক্ষা, আইন, খাদ্য, কৃষি ও জ্বালানী, ইস্পাত ও গুরুভার প্রভৃতি বিভাগগুলি বিভিন্ন কেবিনেটভুক্ত মন্ত্রীরা পরিচালনা করেন। রাষ্ট্রমন্ত্রীরা (Ministers of State) যদিও কেবিনেট

সদস্যভুক্ত নন, তথাপি তাঁরা মন্ত্রীমণ্ডলীর প্রয়োজনীয় মর্যাদা পেয়ে থাকেন। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, গ্রামোন্নয়ন, স্বাস্থ্য প্রভৃতি বিভাগগুলি পরিচালনার ভার একজন করে রাষ্ট্রমন্ত্রীর হাতে ন্যস্ত থাকে। মন্ত্রীমণ্ডলীর তৃতীয় স্তরে আছেন উপমন্ত্রীরা (Deputy Ministers)।

আমরা রাষ্ট্রপতির সংগে মন্ত্রীপরিষদের সম্বন্ধ আলোচনা করার সময় দেখেছি যে সংবিধানে এমন কোন ভাষা নেই যাতে নাকি প্রেসিডেণ্টের ক্ষমতা কতকগুলি কথার দ্বারা সংকুচিত করা হয়েছে। সংবিধানের ভাষা অনুসারে মন্ত্রীপরিষদের কাজ রাষ্ট্রপতিকে তাঁর কার্যাবলী পরিচালনা করতে সাহায্য করা এবং পরামর্শ দেওয়া (aid and advise) মাত্র। কিন্তু সংবিধানের ভাষায় মন্ত্রীপরিষদের কাজ রাষ্ট্রপতিকে সাহায্য করা এবং পরামর্শ দেওয়া হলেও, পার্লামেণ্টচালিত শাসনব্যবস্থার নিয়ম অনুসারে শাসনব্যবস্থা পরিচালনায় প্রকৃত কর্তৃত্ব এবং দায়িত্ব মন্ত্রীপরিষদের হাতেই ন্যস্ত। রাষ্ট্রপতি ইংলণ্ডের রাজা বা রাণীর মত নিয়মতান্ত্রিক প্রধান (titular head) মাত্র এবং মন্ত্রী পরিষদই (Council of Ministers) আসলে সমগ্র শাসনব্যবস্থার নিয়ামক এবং পরিচালক। গ্রেটব্রিটেনের শাসনতান্ত্রিক নিয়ম অনুসারে মন্ত্রীমণ্ডলীই শাসনব্যবস্থার প্রকৃত পরিচালক। সেখানে মন্ত্রীমণ্ডলী জনপ্রতিনিধিমূলক পার্লামেণ্টের কাছে শাসনকার্য পরিচালনার জন্য দায়ী থাকেন। কিন্তু এই দায়িত্ব প্রথাগত নিয়মেব ভিত্তিতে (Convention) প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু আমাদেব মন্ত্রীমণ্ডলীব পার্লামেণ্টের প্রতি দায়িত্বের কথা সংবিধানে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। সংবিধানের ৭৫ (৩) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, মন্ত্রীপরিষদ যৌথভাবে লোকসভার নিকট দায়ী থাকবেন (The Council of Ministers shall be collectively responsible to the House of the People)। পার্লামেণ্ট চালিত শাসনব্যবস্থার প্রচলিত নিয়ম এবং জন-প্রতিনিধিমূলক আইনসভার কাছে মন্ত্রীপরিষদের দায়িত্বের উল্লেখ থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, আমাদের শাসনব্যবস্থা পরিচালনার প্রকৃত দায়িত্ব এবং কর্তৃত্ব মন্ত্রীপরিষদের।

পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে, মন্ত্রীপরিষদই সমগ্র শাসনব্যবস্থার মধ্যমণি। সরকারের নীতি নির্ধারণ এবং তাকে বাস্তবে রূপ দেওয়া মন্ত্রীমণ্ডলীর প্রধান কাজ। মন্ত্রীপরিষদের সদস্যভুক্ত ব্যক্তিরা সাধারণতঃ কোন রাজনৈতিক দলের সদস্য এবং দেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি।

যে নীতি ও আদর্শ তাঁদের তরফ থেকে জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করা হয় সেগুলিকে বাস্তবে রূপায়িত করবার দায়িত্ব মন্ত্রীমণ্ডলীর। তাই বিঘোষিত নীতির পরিপ্রেক্ষিতে সেগুলিকে বাস্তবে রূপায়িত করণের জন্য মন্ত্রীসভায় তার বিভিন্ন দিক আলোচনা করে সে সম্বন্ধে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাই মন্ত্রীমণ্ডলীর অন্যতম প্রধান কাজ। বৈদেশিক সম্পর্ক, দেশরক্ষা, অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রভৃতি বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত মন্ত্রীসভায় আলোচনার পর গৃহীত হয়। শাসনব্যবস্থা পরিচালনাকালীন কোন নতুন সমস্যার উদ্ভব হলে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মন্ত্রীসভায় আলোচনার মাধ্যমেই প্রয়োজনীয় নীতি স্থির করেন। বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে মতবিরোধ উপস্থিত হলে মন্ত্রীসভায় আলোচনার মাধ্যমে তার সামঞ্জস্য বিধান করা হয়।

নীতি নির্ধারণ

নির্ধারিত নীতিগুলিকে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য আইন প্রণয়নের প্রয়োজন হতে পারে। আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রেও মন্ত্রীসভার ভূমিকাই সমধিক গুরুত্বপূর্ণ। মন্ত্রীসভার নির্দেশ অনুসারে আইনের খসড়া তৈরী হয় এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীরাই আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্যে বিলগুলি পার্লামেণ্টে উত্থাপন করে থাকেন। মন্ত্রীদের উত্থাপিত বিলগুলি পার্লামেণ্ট কর্তৃক গৃহীত হয়ে অতি সহজেই আইনে পরিণত হয়, কারণ মন্ত্রীসভার সদস্যরা এবং পার্লামেণ্টের অধিকাংশ সদস্য সাধারণতঃ এক রাজনৈতিক দলের অন্তর্ভুক্ত। মন্ত্রীসভায় সদস্যরা ছাড়া, পার্লামেণ্টের অন্যান্য সদস্যেরাও বিল উত্থাপন করতে পারেন বটে, তবে মন্ত্রীসভার সমর্থনপুষ্ট না হলে তা আইনে পরিণত হওয়ায় সম্ভাবনা কম।

আইন প্রণয়ন

পার্লামেণ্ট কর্তৃক প্রণীত আইন অনুসারে সমগ্র প্রশাসনিকব্যবস্থাকে পরিচালিত করা মন্ত্রীসভার আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য। সরকারের বিভিন্ন কাজের জন্য পৃথক পৃথক দপ্তর থাকে। দপ্তরগুলি যাতে পার্লামেণ্টের নির্ধারিত নীতি অনুসারে পরিচালিত হয় সে দিকেও মন্ত্রীসভাকে লক্ষ্য রাখতে হয়। বর্তমান সরকারের জনকল্যাণমুলক নীতির পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন বিভাগগুলিকে উপযুক্ত ভাবে পরিচালনা করা এক বিরাট সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে। মন্ত্রীসভা তথা পার্লামেণ্ট প্রণীত অনেক কল্যাণকামী পরিকল্পনাই আজ দপ্তরশাহী প্রশাসনিক ব্যবস্থার চাপে বানচাল হতে চলেছে। সরকার তাই প্রশাসনিক ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন

প্রশাসনিক ব্যবস্থার পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ

করতে চলেছেন। মন্ত্রীসভার কর্মতৎপরতার উপরই এর সাফল্য অনেকাংশে নির্ভর করছে—এটি অবশ্যই স্বীকার করতে হবে। তাছাড়া, পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্রের রীতি অনুসারে মন্ত্রীসভাকেই পার্লামেণ্টের কাছে দায়ী থাকতে হয়। স্থায়ী প্রশাসনিক কর্মচারীদের উপযুক্তভাবে পরিচালিত করতে না পারলে মন্ত্রীমণ্ডলী পার্লামেণ্টের কাছে প্রায়োজনীয় দায়িত্ব পালনে সক্ষম হবেন না।

আইনকে কার্যকরী করার জন্য নিয়ম প্রণয়ন

সময়ের স্বল্পতা, আইনের সংখ্যাধিক্য ও জটিলতা ইত্যাদি কারণে পার্লামেণ্টের পক্ষে অনেক সময় প্রয়োজনীয় বিস্তৃতির আকারে আইন প্রণয়ন সম্ভব হয় না। তাই পার্লামেণ্টকে আজ অধিকাংশ ক্ষেত্রে আইনের কাঠামটুকুই প্রণয়ন করতে হয়। সেকারণে প্রত্যেকটি আইন কার্যকরী করার জন্য তার অন্তর্ভুক্ত প্রয়োজনীয় বিস্তার সংবলিত নিয়মকানুন প্রবর্তনের প্রয়োজনীয়তাও এসে পড়ে। মন্ত্রীসভার নির্দেশ ও ইংগিত অনুসারেই এই সব নিয়মকানুন প্রণীত হয়।

প্রধান মন্ত্রী (Prime Minister : his position and powers) :

আমাদের শাসনব্যবস্থা পার্লামেণ্টচালিত শাসনব্যবস্থা হওয়ায় এখানে প্রধান মন্ত্রীই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ পদের অধিকারী। ইংল্যাণ্ডে প্রধান মন্ত্রীর পদটি কোন আইনের দ্বারা সৃষ্ট হয়নি, প্রথাগত রীতিনীতির ভিত্তিতেই এই পদটি গড়ে উঠেছে। কিন্তু ভারতের সংবিধানে প্রধান মন্ত্রীর পদের সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে।

প্রধান মন্ত্রী হলেন আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা। তাঁকে রাষ্ট্রপতি প্রথমে নিয়োগ করেন এবং তাঁরই পরামর্শ মত অন্যান্য মন্ত্রীরা রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন। তিনি সাধারণতঃ লোকসভারই সদস্য হবেন আশা করা যায়, কারণ মন্ত্রীপরিষদের দায়িত্ব লোকসভারই কাছে, রাজ্যসভার কাছে নয়। অবশ্য রাজ্যসভার সদস্যদের ভেতর থেকে মন্ত্রীসভার সদস্য নিযুক্ত হওয়ার কোন সংবিধানগত বাধা নেই।

ইংল্যাণ্ডের প্রধানমন্ত্রীকে *Primus interpares* অর্থাৎ সম-অবস্থা-সম্পন্ন ব্যক্তিদের মধ্যে প্রধান বলা হয়। কিন্তু বর্তমানে তাঁর ক্ষমতা তার চাইতেও বেশী বলা যেতে পারে। ভারতে প্রধান মন্ত্রীর ক্ষেত্রেও সেই একই কথা প্রযোজ্য। প্রধান মন্ত্রী আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হওয়ার জন্য এই

ক্ষমতা ভোগ করেন। দলীয় নীতি নির্ধারণে তাঁর প্রভাব অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ। বর্তমানে আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠদল কংগ্রেসের সমাজতান্ত্রিক আদর্শের নীতি নির্ধারণে আমাদের পরলোকগত প্রধানমন্ত্রী নেহেরুর প্রভাব অনস্বীকার্য। পার্লামেণ্টের ভিতরে ও বাইরে প্রধান মন্ত্রী যে বক্তৃতা বা অভিমত প্রকাশ করেন জনমতের উপর তার প্রভাব অপরিসীম। সভা-সমিতি, সাংবাদিক সম্মেলন প্রভৃতিতে তিনি সরকারের নীতি বিশ্লেষণ এবং ব্যাখ্যা করে জনমতকে স্বীয় দলের স্বপক্ষে পুঞ্জীভূত করার চেষ্টা করেন। স্বভাবতই ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত রাজনৈতিক দলকে প্রধান মন্ত্রীর নেতৃত্বের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল হতে হয়।

অন্যান্য মন্ত্রীদের মন্ত্রীত্বপদে অবস্থানের জন্য প্রধান মন্ত্রীর আস্থাভাজন হতে হয়। যদিও সাংবিধানিক নিয়ম অনুসারে রাষ্ট্রপতির সম্মতিসূচক অবস্থার (Pleasure) মধ্যে তাঁরা নিজ নিজ পদে বহাল থাকেন, বাস্তবে কিন্তু এই বহাল থাকা প্রধান মন্ত্রীর আস্থাভাজন হওয়ার উপর নির্ভরশীল। প্রধান মন্ত্রীর সভাপতিত্বে মন্ত্রীসভা গুরুত্বপুর্ণ সিদ্ধান্তগুলি গ্রহণ করেন। পররাষ্ট্রনীতি, দেশরক্ষা, সরকারী আয়-ব্যয়ের নীতি নির্ধারণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীর সিদ্ধান্ত শেষ পর্যন্ত মন্ত্রীসভার সিদ্ধান্তরূপে আইনসভা তথা জনসাধারণের সম্মুখে উপস্থাপিত হয়। মন্ত্রীসভার মধ্যে কোন মতবিরোধ দেখা দিলে তার সহজ সমাধান প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিত্বের উপর নির্ভর করে।

শুধু তাই নয়, আমাদের সংবিধানে প্রধান মন্ত্রীকে এমন কতকগুলি ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে যার ফলে আমাদের প্রধান মন্ত্রী একদিক থেকে ইংল্যাণ্ডের প্রধান মন্ত্রীর চাইতেও অধিক ক্ষমতাশালী। ইংল্যাণ্ডের নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রে রাজার সংগে প্রধান মন্ত্রীর সম্পর্কটি প্রথাগত নিয়মের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে। আমাদের দেশে এই জাতীয় প্রথাগত নিয়ম গড়ে উঠবে আশা করলেও আমাদের ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে রাষ্ট্রের প্রধান পদাধিকারী রাষ্ট্রপতি তাঁর নির্বাচনের জন্য প্রধান মন্ত্রীর উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজনৈতিক দলের নেতা হিসেবে প্রধান মন্ত্রী রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে যে ভূমিকা অবলম্বন করেন তাতে রাষ্ট্রপতির পক্ষে ইংল্যাণ্ডের রাজা বা রাণীর মত সম্পূর্ণভাবে দলীয় প্রভাবমুক্ত হয়ে নিরপেক্ষ শাসনতান্ত্রিক প্রধান হিসেবে শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করা সম্ভব নয়। জরুরী অবস্থাকালীন রাষ্ট্রপতি যে ক্ষমতা ভোগ করেন, প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শেই তা করা হয়ে থাকে। সুতরাং জরুরী অবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা বৃদ্ধির ফলে প্রধান মন্ত্রীর কর্তৃত্বের

পরিধিই পরোক্ষভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। তাছাড়া, ভারতের প্রধান মন্ত্রীকে সংবিধান অনুসারে এমন কতকগুলি ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে যে জাতীয় ক্ষমতার জন্য ইংল্যাণ্ডের প্রধান মন্ত্রীকে প্রথাগত নিয়মের উপর নির্ভর করতে হয়। ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে মন্ত্রীপরিষদের যাবতীয় সিদ্ধান্ত রাষ্ট্রপতির গোচরীভূত করতে হয়। দ্বিতীয়তঃ, এই সমস্ত বিষয়ে রাষ্ট্রপতি যে সমস্ত বিষয় জানতে চাইবেন সেগুলিও প্রধানমন্ত্রীর মাধ্যমে জ্ঞাত করান হয়। কোন মন্ত্রী কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে সেটি যদি মন্ত্রীসভা কর্তৃক বিবেচিত না হয় তাহলে রাষ্ট্রপতির নির্দেশক্রমে মন্ত্রীসভায় আলোচনার জন্য সেখানে উপস্থাপিত করাও প্রধান মন্ত্রীর আর একটি কর্তব্য।

মন্ত্রীসভার সংগে পার্লামেন্টের প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রধান মন্ত্রীর কৃতিত্বের উপর নির্ভর করে। প্রধান মন্ত্রীই সাধারণতঃ পার্লামেন্টের সম্মুখে সরকারের গুরুত্বপূর্ণ নীতি ও সিদ্ধান্তগুলি বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করে বিবৃতি দেন। মন্ত্রীসভায় কোন সদস্যকে প্রশ্ন করা হলে, প্রধানমন্ত্রী নিজে সে প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন, অথবা প্রয়োজন বোধে যে কোন মন্ত্রীকে তিনি সমালোচনার সম্মুখীন করতে পারেন। প্রকৃতপক্ষে মন্ত্রীসভা ও পার্লামেন্টের মধ্যে প্রয়োজনীয় সংহতি ও সহযোগিতা বজায় রাখাও প্রধানমন্ত্রীর অন্যতম প্রধান কর্তব্য। এই সংহতিব জন্যই চৈনিক আক্রমণের সময় পরলোকগত প্রধানমন্ত্রী নেহেরুকে তাঁর ইচ্ছাব বিরুদ্ধে প্রাক্তন প্রতিরক্ষামন্ত্রী কৃষ্ণমেননের পদত্যাগপত্র গ্রহণ করতে হয়েছিল। পার্লামেণ্টারী পার্টি ও রাজনৈতিক দলে প্রধানমন্ত্রীর প্রভাব ও নেতৃত্বের উপরই এই সংহতি অনেকাংশে নির্ভর করে।

পরিশেষে উল্লেখ করতে হয় যে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তিনি কি পরিমাণ ক্ষমতা পরিচালনা করবেন, সেটি নির্ভর করে তাঁর ব্যক্তিত্বের উপর। ডঃ শ্যামাপ্রসাদ, কে. সি. নিয়োগী, চিন্তামন দেশমুখ প্রভৃতি নির্দলীয় ব্যক্তিদের নিয়েও নেহেরু মন্ত্রীসভা গঠন করে সম্পূর্ণ কৃতিত্বের সংগেই সমগ্র শাসনব্যবস্থার মধ্যমণি হয়ে শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করেছেন। বৈদেশিক শাসনব্যবস্থা অপসারিত হওয়ার পর আমাদের শিশুরাষ্ট্রে মন্ত্রীসভাচালিত শাসনব্যবস্থার সাফল্যের পিছনে ছিল নেহেরুর মত একজন বরেণ্য রাষ্ট্রনেতার মহান ও বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব। তাঁর তিরোধানের পর সমগ্র জাতির সম্মুখে উপস্থিত হয়েছে এক বিরাট অগ্নিপরীক্ষা। আমাদের রাজনৈতিক ধীশক্তি ও চেতনার উপরই নির্ভর করছে সেই পরীক্ষার সাফল্য।

মন্ত্রীসভা ও পার্লামেণ্ট (Relation between the Council of Ministers and the Parliament)ঃ

পার্লামেণ্ট চালিত শাসনব্যবস্থায় মন্ত্রীসভার সংগে পার্লামেণ্টের ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র বিদ্যমান। এই শাসনব্যবস্থার নিয়ম অনুসারে মন্ত্রীসভার সদস্যদের আইনসভার সদস্য হতে হয় এবং তাঁদের আইনসভার কাছে দায়ীও থাকতে হয়। আমাদের সংবিধানের ৭৪ (১) অনুচ্ছেদে এরূপ একটি মন্ত্রীসভার (Council of Ministers) অবস্থিতির কথা বলা হয়েছে। ৭৫ (৫) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, কোন মন্ত্রী যদি উপর্যুপরি ছয় মাস পার্লামেণ্টের কোন কক্ষের সদস্য না হন তাহলে উক্ত ছয় মাস অতিক্রান্ত হবার পরে তাঁকে পদত্যাগ করতে হয়। (A Minister who for any period of six consecutive months is not a member of either House of Parliament shall at the expiration of that period cease to be a Minister)। ৭৫ (৩) অনুচ্ছেদে মন্ত্রীসভাকে যৌথভাবে লোকসভার কাছে দায়ী করা হয়েছে (The Council of Ministers shall be collectively responsible to the House of the People)। পার্লামেণ্টের প্রতি মন্ত্রীসভার এই দায়িত্বকে কিভাবে কার্যকরী করা হবে সে সম্বন্ধে কোন উল্লেখ আমাদের সংবিধানে নেই। ইংলণ্ডে পার্লামেণ্টের সদস্যরা মন্ত্রীদের প্রশ্ন করে অথবা স্থগন (adjourment) সভায় প্রস্তাব এনে এবং প্রয়োজনবোধে মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে অনাস্থাসূচক প্রস্তাব এনে এই দায়িত্বকে কার্যকরী করেন। কোন মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব পাস হলে সেখানে মন্ত্রীসভা সাধারণতঃ পদত্যাগ করে থাকেন। প্রথাগত নিয়মের ভিত্তিতেই তা কার্যকরী করা হয়। কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় এই যে, পার্লামেণ্টে অনাস্থাসূচক প্রস্তাব পাস হলে মন্ত্রীসভাকে পদত্যাগ করতেই হবে এমন কোন বিধান আমাদের লিখিত সংবিধানে নেই। সংবিধানে ৭৫ (২) অনুচ্ছেদে শুধু মাত্র বলা হয়েছে, 'The Ministers shall hold office during the pleasure of the President'। অর্থাৎ, একমাত্র রাষ্ট্রপতিই ইচ্ছা করলে তাদের বরখাস্ত করতে পারেন। সুতরাং আমরা ধরে নিতে পারি যে, পার্লামেণ্টের প্রতি মন্ত্রীসভার দায়িত্বকে শেষ পর্যন্ত কার্যকরী করার বিধান রাষ্ট্রপতির এই বরখাস্ত (dismiss) করার ক্ষমতার মধ্যেই নিহিত আছে। পার্লামেণ্টের আস্থার অভাব ঘটলে একমাত্র রাষ্ট্রপতিই মন্ত্রীদের অপসারিত করতে পারেন। আয়ার্ল্যাণ্ড এবং জাপানের

সংবিধানে মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে আইন সভার অনাস্থাসূচক প্রস্তাব পাস হলে তাদের পদত্যাগ করতে হবে এইরূপ বিধানের উল্লেখ আছে। কিন্তু আমাদের সংবিধানে এরূপ সুস্পষ্ট উল্লেখ কেন নেই—এ প্রশ্ন স্বভাবতই আমাদের মনে আসতে পারে। এমনকি এর উল্লেখ না থাকা কিছুটা অগণতান্ত্রিক এবং সংবিধানের ত্রুটি বলেও মনে হতে পারে। তবে আমাদের সংবিধান প্রণেতারা যে উদ্দেশ্য নিয়ে মন্ত্রীসভার এই পদত্যাগের কথাটি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেননি তার যৌক্তিকতা অস্বীকার করাও উপায় নেই। প্রথমতঃ, নিয়ম-কানুনকে ভিত্তি করে যে সমস্ত বলিষ্ঠ বিধি গ্রেটব্রিটেনের সংবিধানে গড়ে উঠেছে প্রতিটি ক্ষেত্রে অন্ধভাবে তার অনুকরণ করে কাগজে-কলমে লিপিবদ্ধ করা সম্ভব নয় এবং বাঞ্ছনীয়ও নয়। পার্লামেণ্টের আস্থা হারালে মন্ত্রীসভা পদত্যাগ করবেন একথা সংবিধানে উল্লেখ না থাকলেও আমাদের সংবিধান প্রণেতাদের মত আমরাও আশা করতে পারি যে এমতঅবস্থায় মন্ত্রীসভার পদত্যাগ করার বলিষ্ঠ প্রথাগত নিয়মটি ধীরে ধীরে আমাদের দেশেও গড়ে উঠবে। আমাদের শিশুরাষ্ট্রে এই প্রথাটি গড়ে না ওঠা পর্যন্ত কোন শাসনতান্ত্রিক বিপর্যয়ের হাত থেকে দেশকে নিষ্কৃতি দেবার জন্যই রাষ্ট্রপতির হাতে মন্ত্রীদের অপসারিত করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে।

পার্লামেণ্টের প্রতি মন্ত্রীসভার দায়িত্বের আরও কয়েকটি আনুষংগিক বৈশিষ্ট্য আছে। মন্ত্রীসভার কোন সিদ্ধান্ত যখন আইনসভায় উপস্থাপিত হয়, তখন মন্ত্রীসভায় সকল সদস্যদের তা সমর্থনের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। কোন বিষয় মন্ত্রীসভায় আলোচনাকালীন মন্ত্রীরা তাঁদের মতামত স্বাধীনভাবে ব্যক্ত করতে পারেন, কিন্তু তার সিদ্ধান্ত যখন মন্ত্রীসভা কর্তৃক আইনসভায় উপস্থাপিত হবে তখন সকল মন্ত্রীকে তা সমর্থক করতে হবে। অর্থাৎ মন্ত্রীসভার সদস্য থাকা কালীন তাঁরা আইনসভায় অথবা জনসাধারণের সম্মুখে মন্ত্রীসভার কোন সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করতে পারেন না। কোন মন্ত্রী যদি একান্তই মন্ত্রীসভার সিদ্ধান্ত মেনে নিতে না পারেন, তবে তিনি পদত্যাগ করতে পারেন। কিন্তু মন্ত্রীসভার সদস্য থাকলে উক্ত সভার অধিবেশনের বাইরে বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করা পার্লামেণ্ট পরিচালিত শাসনব্যবস্থার নীতিবিরুদ্ধে। ভারতের সংগে পাকিস্থানের সম্পর্কজনিত প্রশ্নে মন্ত্রীসভার সংগে একমত না হওয়ার জন্য ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং কে. সি. নিয়োগী মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগ করেন। প্ল্যানিং কমিশনের নিয়োগের ব্যাপারে মন্ত্রীসভার অভিমত গ্রহণ

করতে না পারার জন্যই ডঃ জন মাথাইকে শেষ পর্যন্ত পদত্যাগ করতে হয়েছিল। কোন বিশেষ মন্ত্রীর ব্যক্তিগত দুর্নীতির দায়িত্ব অবশ্য মন্ত্রীসভা গ্রহণ করে না। এক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতিকে উক্ত মন্ত্রীকে বরখাস্ত করতে বলতে পারেন অথবা তাঁকে পদত্যাগ করতে অনুরোধ করতে পারেন।

উপসংহারে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, রাজনৈতিক দলপ্রথার উদ্ভবের জন্যই আজ মন্ত্রীসভার পক্ষে আইনসভার কাছে দায়িত্বশীল থাকা সম্ভব হয়। মন্ত্রীসভার সদস্যেরা এবং আইনসভার অধিকাংশ সদস্য একই রাজনৈতিক দলভুক্ত হওয়ায় মন্ত্রীদের পক্ষে তাদের আস্থার পরিমাপ করা এবং শাসনক্ষমতায় আসীন থাকা সম্ভব হয়। এই দলীয় প্রথা অবশ্য পার্লামেণ্ট চালিত শাসনব্যবস্থায় মন্ত্রীসভাকেই সমগ্র শাসনব্যবস্থার একমাত্র নিয়ন্ত্রণকারীতে পর্যবসিত করেছে। মন্ত্রীসভার তরফ থেকে যে কোন প্রস্তাব বা সিদ্ধান্ত আইনসভায় পেশ করলে আইনসভার অধিকাংশ সদস্যেরা তাকে অন্ধভাবে সমর্থন জানায়। যে আইনসভা জনপ্রতিনিধিমুলক সংস্থা হিসেবে মন্ত্রীসভাকে নিয়ন্ত্রিত করার কথা, সেই মন্ত্রীসভাই আজ কার্যতঃ আইনসভাকে পরিচালিত করছে। আধুনিক রাজনৈতিক দলপ্রথার কঠোর নিয়মানুবর্তীতা ও কাজের পরিধিবৃদ্ধি হেতু আলোচনা সংক্ষিপ্তকরণের প্রয়োজনীয়তা, নির্বাচনী ক্ষেত্রের বিস্তৃতি, প্রধানমন্ত্রীর পার্লামেণ্ট ভেংগে দেওয়ার জন্য পরামর্শ দেওয়ার ক্ষমতা ইত্যাদি মন্ত্রীসভাকে এই সুবিধাজনক অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত করেছে। আমাদের বিরাট ভৌগলিক এলাকা সম্পন্ন ভারত যুক্তরাষ্ট্রে স্বভাবতই পার্লামেণ্টের সদস্য সংখ্যা হবে অন্যান্য রাষ্ট্রের তুলনায় বেশী। তাছাড়া, সমাজতান্ত্রিক নীতিকে কার্যকরী করতে গিয়ে আইনসভার কাজের পরিধিও অবশ্যই দিন দিন বেড়ে চলবে। এমতাবস্থায় কোন বিশেষ রাজনৈতিক দল এককভাবে পার্লামেণ্টে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করলে, মন্ত্রীসভাই যে প্রকৃতপক্ষে পার্লামেণ্টের আসল নিয়ন্ত্রণকারী হবে তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই।

রাষ্ট্রপতি ও মন্ত্রীসভার মধ্যে সম্পর্ক (Relation between the President and the Council of Ministers) ঃ আমাদের সংবিধানে রাষ্ট্রপতির সংগে মন্ত্রীসভার যে সম্পর্কের উল্লেখ আছে তার যথার্থ স্বরূপটি নিয়ে অনেক তর্কের অবতারণা হয়েছে। আমাদের শাসনব্যবস্থা পার্লামেণ্ট কর্তৃক পরিচালিত হলেও রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পদাধিকারীকে নামসর্বস্ব রাষ্ট্রপ্রধান বলে মনে করা সংগত হবে না। সংবিধানের ভাষায় কোথাও রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা

সংকুচিত করা হয়নি। ৭৪ অনুচ্ছেদের (১) ধারায় যে মন্ত্রীপরিষদের অবস্থিতির কথা বলা হয়েছে তাতে রাষ্ট্রপতিকে সাহায্য করা ও পরামর্শ দেওয়াই (aid and advise) তাদের কাজ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সাহায্য ও পরামর্শের মধ্যে বাধ্যতামুলক কিছু থাকতে পারেনা, সুতরাং রাষ্ট্রপতি প্রয়োজনবোধে তাদের পরামর্শ উপেক্ষা করতেও পারেন। তবে সংবিধানের ভাষাই তার চরম ও শেষ কথা নয়। যে কোন সংবিধান অনুসারে শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হওয়া কালীন কতকগুলি প্রয়োজনীয় নিয়মকানুন আপনা থেকেই গড়ে ওঠে। শাসনব্যবস্থায় অধিষ্ঠিত বিভিন্ন বিভাগ এবং উচ্চপদাধিকারীর পারস্পরিক সহযোগীতার ভিত্তিতে গড়ে উঠা এই নিয়মকানুনগুলি সংবিধানে অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ স্থান দখল করে থাকে। পার্লামেণ্টপরিচালিত শাসনব্যবস্থার প্রয়োজনীয় শর্ত অনুসারে রাষ্ট্রপতি শাসনব্যবস্থার সর্বোচ্চপদাধিকারী হিসেবে মন্ত্রীসভার পরামর্শকে উপেক্ষা না করে নিয়মতান্ত্রিক প্রধান হিসেবেই ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকবেন—এ আশা আমরা করতে পারি এবং এই জাতীয় প্রথাগত নিয়ম ইতিমধ্যেই আমাদের দেশে গড়ে উঠতে শুরু করেছে। অবশ্য সাংবিধানিক কাঠামোটি এমনভাবে রচিত হয়েছে যে, যার ফলে কোন রাষ্ট্রপতির পক্ষে দীর্ঘকাল ধরে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ উপেক্ষা করা সম্ভব হবে না। কারণ এক্ষেত্রে পার্লামেণ্টের অধিকাংশ সদস্যের উপর প্রভাবসম্পন্ন মন্ত্রীপরিষদ পদত্যাগ করলে রাষ্ট্রপতির পক্ষে অন্য মন্ত্রীসভা গঠন করা সম্ভব হবে না।

এই প্রসংগে উল্লেখযোগ্য যে, ইংলণ্ডে রাজা বা রাণীর সীমাবদ্ধ ক্ষমতা প্রথাগত নিয়মের মাধ্যমে গড়ে ওঠার ফলে বর্তমানে তিনি নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্র-প্রধানে পরিণত হয়েছেন। ভারতের রাষ্ট্রপতি সর্বপ্রকার ক্ষমতা রহিত হয়ে মন্ত্রীসভার নিয়ন্ত্রণাধীন রাষ্ট্রপ্রধান হওয়া উচিত কিনা সে প্রশ্নটিও ভেবে দেখার বিষয়। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাসম্পন্ন সার্বভৌম ভারত রাষ্ট্রের জন্মের শুরু থেকে তাকে রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনার দায়িত্ব যাঁদের উপর বর্তাবে তাঁদের যোগ্যতা ও কর্মপটুতার পরীক্ষানিরীক্ষণের প্রয়োজনীয়তা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে। হয়ত বা সেই কথাই চিন্তা করে আমাদের সংবিধান প্রণেতারা এমন কতকগুলি ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির হাতে রেখেছিলেন, যার ফলে তাঁর নিজস্ব বিচারবোধ এবং কর্মতৎপরতা অনুসারে শাসনব্যবস্থা পরিচালনার সুযোগ হয়ত রয়ে গেছে। প্রধানমন্ত্রী এবং তাঁর পরামর্শক্রমে মন্ত্রীসভার অন্যান্য সদস্যদের নিয়োগ, তাদের পরামর্শ অনুসারে কাজ করা এবং ক্ষেত্র বিশেষে

তাদের ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তকে মন্ত্রীসভায় উপস্থাপিত করে সে সম্বন্ধে তাঁদের আলোচনা এবং পুনর্বিবেচনা করতে বাধ্য করা—এমন কি মন্ত্রীসভার সদস্যদের ক্ষমতায় অবস্থান বিষয়ক নানা গুরুত্বপুর্ণ বিষয়ে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা সংবিধানের ভাষায় নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। উক্ত ক্ষমতাগুলির মধ্যে কতকগুলিতে তাঁকে প্রতিষ্ঠিত ঘটনারূপে মেনে নিতে হয়, কিন্তু কতকগুলি বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে তাঁর নিজস্ব বিচারশক্তি এবং সিদ্ধান্তকে প্রয়োগ করার সুযোগ রয়েছে। তাই বলে একথা যেন আমার আদৌ মনে না করি যে, রাষ্ট্রপতি মন্ত্রীসভার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তার সিদ্ধান্তকে সর্বাবস্থায় কার্যকরী করতে সক্ষম। রাষ্ট্রপতির নির্বাচন লোকসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নির্বাচন। সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতৃত্বস্থানীয় মন্ত্রীমণ্ডলীকে উপেক্ষা করা তাঁর পক্ষে আদৌ সম্ভব নয়। তাছাড়া, মন্ত্রী পরিষদের উপদেশ ও সাহায্য উপেক্ষা করলে সংবিধান অনুসারে শাসনব্যবস্থা পরিচালনার ব্যাপারে যে বিপর্যয় সৃষ্টি হবে তার জন্য তাঁর ইম্‌পীচমেণ্টেরও সম্মুখীন হবাব সম্ভাবনা আছে। এ মত অবস্থায় আমরা ধরে নিতে পারি যে, রাষ্ট্রপতি পার্লামেণ্ট পরিচালিত শাসনব্যবস্থায় চিরাচরিত নিয়ম অনুসারে নিয়মতান্ত্রিক প্রধান হিসেবেই কাজ করবেন এবং ভাষায় প্রকাশ না করলেও সংবিধান প্রণেতাদের উদ্দেশ্যও ছিল তাই।

নবম অধ্যায়

পার্লামেণ্ট

(Parliament)

১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনের দ্বারাই ভারতে প্রথম দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা গঠিত হয়। এই আইনে উচ্চতন কক্ষ, Council of State-এর মোট সদস্য সংখ্যা ছিল ৬০ জন। এই সদস্যদের মধ্যে ৩৩ জন ছিলেন নির্বাচিত সদস্য এবং বাকী সদস্যেরা ছিলেন মনোনীত। কেন্দ্রীয় আইন সভার নিম্নতন কক্ষে মোট সদস্য সংখ্যা ছিল ১৪৫ জন। এঁদের মধ্যে ১০৩ জন সদস্য ছিলেন নির্বাচিত এবং বাকী সদস্যরা গভর্ণর জেনারেল কর্তৃক মনোনীত হতেন। তদানীন্তন প্রদেশগুলি থেকে মুসলমান, অমুসলমান, শিখ, অসাম্প্রদায়িক ("Non-Communal"[1]) নির্বাচক শ্রেণী এবং ইউরোপীয় সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক পৃথক ভাবে আসন সংরক্ষিত ছিল।

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনেও দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট আইনসভার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। এই আইনে নিম্নতন কক্ষকে বলা হত House of Assembly এবং উচ্চতন কক্ষের নামকরণ করা হয়েছিল Council of State. Council of State-এর মোট সদস্য সংখ্যা ২৬০ জন। এই ২৬০ জন সদস্যের মধ্যে ১৫৬ জন ব্রিটিশ শাসিত প্রদেশগুলি থেকে প্রত্যক্ষভাবে এবং বাকী ১০৪ জন সদস্য মিত্র রাজ্যগুলির নৃপতিদের দ্বারা নিযুক্ত হওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। প্রদেশগুলি থেকে ১৫৬ জন সদস্যদের মধ্যে ৬ জনকে গভর্ণর জেনারেল কর্তৃক মনোনয়নের ব্যবস্থা করা হয়। যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভায় (House of Assembly) মোট ৩৭৫ জন সদস্যের মধ্যে ২৫০ জন সদস্য সম্প্রদায়গত ভিত্তিতে ব্রিটিশ-শাসিত প্রদেশগুলির আইনসভাব সদস্যদের দ্বারা পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হওয়ার এবং বাকী ১২৫ জন দেশীয় নৃপতিবর্গের দ্বারা নিযুক্ত করার ব্যবস্থা করা হয়।

বর্তমান সংবিধানে ভারতের কেন্দ্রীয় আইনসভা হচ্ছে পার্লামেণ্ট। রাষ্ট্রপতি এবং দুটি কক্ষ নিয়ে পার্লামেণ্ট। পার্লামেণ্টের উচ্চতন কক্ষকে **রাজ্যসভা** (Council of States) এবং নিম্নতন কক্ষকে **লোকসভা** (House of the People) বলা হয়েছে।

---

1. Simon Report Vol. I, P. 167.

রাজ্যসভা (Council of States):

পার্লামেণ্টের উচ্চতন কক্ষ রাজ্যসভা (Council of States) একটি স্থায়ী কক্ষ—অর্থাৎ একে ভেংগে দেওয়া যেতে পারবে না। এই কক্ষের এক-তৃতীয়াংশ সদস্য প্রতি দুই বৎসর অন্তর অবসর নেন। এই কক্ষের সদস্য সংখ্যা ২৫০ এর বেশী হবে না। এঁদের মধ্যে ১২ জন সদস্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত হবেন। মনোনীত সদস্যদের সাহিত্য, বিজ্ঞান, চারুকলা, সমাজসেবা প্রভৃতি কোন না কোন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হতে হবে। রাজ্য সভায় সদস্যবৃন্দ অপ্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হবেন। প্রত্যেক রাজ্য বিধানসভার সদস্যেরা একক হস্তান্তর যোগ্য সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে রাজ্যসভায় প্রতিনিধি নির্বাচন করবেন। কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির সদস্যেরা একই পদ্ধতিতে এক বিশেষ নির্বাচনী সংস্থার মাধ্যমে এই সভার সদস্য নির্বাচিত করবেন। সংবিধানের ৮০ অনুচ্ছেদের (২) ধারা অনুসারে প্রত্যেক রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির প্রতিনিবি সংখ্যা চতুর্থ সিডিউলে (Fourth Schedule) দেখান হয়েছে। এই তালিকা অনুসারে অন্ধ্র প্রদেশ থেকে ১৮ জন, আসাম থেকে ৭, বিহার থেকে ২২, গুজরাট থেকে ১১, কেরালা থেকে ৯, মধ্যপ্রদেশ থেকে ১৬, মাদ্রাজ থেকে ১৮, মহারাষ্ট্র থেকে ১৯, মহীশূর থেকে ১২, উড়িষ্যা থেকে ১০, পাঞ্জাব থেকে ১১, রাজস্থান থেকে ১০, উত্তর প্রদেশ থেকে ৩৪, পশ্চিম বাংলা থেকে ১৬, জম্মু ও কাশ্মীর থেকে ৪, নাগাল্যাণ্ড থেকে ১, দিল্লী থেকে ৩, হিমাচল প্রদেশ থেকে ২, মণিপুর থেকে ১, ত্রিপুরা থেকে ১ এবং পণ্ডিচেরী থেকে ১ জন অর্থাৎ মোট ২২৬ জন প্রতিনিধি নির্বাচিত হবেন।

রাজ্যসভার গঠন ও কার্যকাল

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সুইজারল্যাণ্ড প্রভৃতি যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় আইনসভার দ্বিতীয় কক্ষে প্রত্যেক অংগরাজ্যগুলি থেকে সমান সংখ্যক প্রতিনিধি নেওয়া হয়। কোন এক বিশেষ এলাকা তার সংখ্যাগরিষ্ঠতার জন্য অন্যান্য এলাকাগুলির উপর তার সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিতে সক্ষম হলে যুক্তরাষ্ট্রের উদ্দেশ্য অনেকটা ব্যাহত হয়। অনেক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী তাই অংগরাজ্যগুলি থেকে আইন সভার দ্বিতীয় কক্ষে সমান সংখ্যক প্রতিনিধি নেওয়ার ব্যবস্থাকে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থার সাফল্যের এক অন্যতম প্রয়োজনীয় শর্ত বলে মনে করেন। ভারতের ক্ষেত্রে স্পষ্টতই এই ব্যবস্থার ব্যতিক্রম ঘটেছে।

রাজ্যসভার সদস্য হতে হলে কোন ব্যক্তিকে (১) ভারতীয় নাগরিক হতে হবে, (২) অন্ততঃ পক্ষে ত্রিশ বৎসর বয়স্ক হতে হবে এবং পার্লামেণ্ট

সময় সময় যে যোগ্যতা আইন অনুসারে ঠিক করবেন, তার অধিকারী হতে হবে।

ভারতের উপরাষ্ট্রপতি পদাধিকার বলে রাজ্যসভার সভাপতি। রজ্যসভার সদস্যগণ তাঁদের মধ্য থেকে একজনকে সহ-সভাপতি নির্বাচন করবেন।

লোকসভা (House of the People):

সংবিধানের ৮১ অনুচ্ছেদ অনুসারে লোকসভার সদস্য সংখ্যা ৫০০ শতের বেশী হবে না এবং তারা অংগরাজ্যের নির্বাচনী এলাকাগুলি থেকে প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হবেন। তাছাড়া, পঁচিশ জন সদস্য কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলি থেকে (Union Territories) পার্লামেণ্ট যে ভাবে আইনের দ্বারা নির্দিষ্ট করে দেবেন, সেইভাবে নির্বাচিত হবেন। কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির সদস্যদের নির্বাচনের ক্ষেত্রে আন্দামান নিকোবর এবং লাক্কাদিব মিনিকয় ও আমিনিদিবি দ্বীপপুঞ্জের সদস্যরা ছাড়া, অন্যান্য অঞ্চলের সদস্যরা প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হন। পূর্বোক্ত দ্বীপপুঞ্জ-গুলির সদস্যরা রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত হন। জম্মু ও কাশ্মীরের প্রতিনিধিরা ঐ রাজ্যের আইনসভার সুপারিশ ক্রমে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন। রাষ্ট্রপতি যদি মনে করেন যে অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায় লোকসভায় উপযুক্ত প্রতিনিধিত্ব পায়নি তাহলে তিনি এই সম্প্রদায় থেকে দুজন সদস্য মনোনীত করতে পারেন।

কোন্ রাজ্য থেকে কতজন প্রতিনিধি নির্বাচিত হবেন সংবিধানে তার উল্লেখ না থাকলেও এ সম্বন্ধে কতকগুলি নিয়ম লিপিবদ্ধ হয়েছে। সংবিধানের ৮১ অনুচ্ছেদের (২) ধারার (ক) উপধারা অনুসারে প্রত্যেক রাজ্যের জন্য লোক-সভায় এমন সংখ্যক আসন নির্দিষ্ট হবে যাতে প্রত্যেক রাজ্যের নির্বাচিত সদস্যের সংগে জনসংখ্যার অনুপাত সকল রাজ্যের ক্ষেত্রেই যতদূর সম্ভব সমান হয়। তাছাড়া, প্রত্যেক রাজ্যকে এমন কতকগুলি নির্বাচনী এলাকায় ভাগ করা হবে যাতে নাকি প্রত্যেক এলাকার জনসংখ্যার সংগে তার নির্দিষ্ট আসন সংখ্যার অনুপাত উক্তরাজ্যের অনুরূপ এলাকাগুলির সংগে সমান হয়।

৩২৬ অনুচ্ছেদ অনুসারে প্রাপ্ত বয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচনী এলাকাগুলি থেকে লোকসভায় প্রতিনিধি নির্বাচিত হবেন। ২১ বৎসর অথবা তার বেশী বয়স্ক ভারতীয় নাগরিক মাত্রই ভোট দেবার অধিকারী। অবশ্য পাগল, দেউলিয়া অথবা ফৌজদারী মামলায় দণ্ডপ্রাপ্ত কয়েকটি বিশেষ শ্রেণীর লোককে ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়।

৮৪ অনুচ্ছেদ অনুসারে লোকসভায় নির্বাচন প্রার্থী হতে হলে যে কোন ব্যক্তিকে ভারতীয় নাগরিক হতে হবে এবং তার বয়স অন্ততঃ পক্ষে ২৫ বৎসর হওয়া প্রয়োজন। এ ছাড়া, এতদুদ্দেশ্যে পার্লামেণ্ট আইন করে যে সমস্ত গুণাবলী ঠিক করে দেবেন তার অধিকারী হতে হবে।

৩৩০ অনুচ্ছেদ অনুসারে অনুন্নত এবং তপশীলভুক্ত জাতির জন্য আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সংবিধান চালু হওয়ার সময় থেকে দশ বৎসরের জন্য এরূপ আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা ছিল। ১৯৫৯ সালে সংবিধানের অষ্টম সংশোধনের ফলে এই সময় বাড়িয়ে কুড়ি বৎসর পর্যন্ত করা হয়েছে।

লোকসভার কার্যকাল পাঁচ বৎসর। অবশ্য ক্ষেত্র বিশেষে রাষ্ট্রপতি এই সময় অতিক্রান্ত হওয়ার আগে লোকসভা ভেংগে দিয়ে নতুন নির্বাচনের আদেশ দিতে পারেন।

রাজ্যসভার বৈশিষ্ট্য এবং তার যৌক্তিকতা সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা (A general discussion on Council of States as a Second Chamber, its utility and other peculiarities) ঃ

আইন প্রণয়নের কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট আইন-সভা আদৌ প্রয়োজন কিনা তা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের এক তর্কের বিষয়বস্তু। দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট আইনসভার স্বপক্ষে বলা হয় যে, জনপ্রতিনিধিমূলক নিম্নতন কক্ষের ক্ষিপ্রকারিতার সহিত আইন প্রণয়নের একটি সাধারণ প্রবণতা দেখা যায়। কিন্তু যে আইন দেশের সাধারণ মানুষের ভাল-মন্দের সংগে জড়িত, তা ক্ষিপ্রকারিতার সহিত প্রণীত হওয়া আদৌ বাঞ্ছনীয় নয়। আইনসভার দুটি কক্ষ থাকলে, উচ্চতন কক্ষ কর্তৃক সেটি ধীরভাবে পুনর্বিবেচিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। দুটি কক্ষের বিধিনির্দিষ্ট নিয়মের মাধ্যমে আইন পূর্ণাংগ রূপ নিতে যে সময় অতিবাহিত হয় তার মধ্যে জনসাধারণও উক্ত আইন সম্বন্ধে তাদের মতামত ব্যক্ত করার সুযোগ পায়। তাছাড়া, আইনসভার একটি কক্ষ থাকলে, রাষ্ট্রের সকল সম্প্রদায়ের উক্ত কক্ষে প্রতিনিধি প্রেরণ করা সম্ভব হয় না। প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে পরিচালিত নির্বাচন ব্যবস্থায় কেবলমাত্র সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ই এক্ষেত্রে প্রতিনিধি প্রেরণের সুযোগ লাভ করে। কিন্তু সকল সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্বের সুযোগ না থাকলে গণতন্ত্রের

দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট আইনসভাব যুক্তি

উদ্দেশ্য অনেকটা ব্যাহত হয়। তাই একাধিক শ্রেণী ও সম্প্রদায় সম্পন্ন রাষ্ট্রে সকল শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্বের সুযোগের জন্য দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট আইন সভার প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ করা হয়। আইন প্রণয়নের কাজে দেশের জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তিদেব সাহায্য ও পরামর্শ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তার খাতিরেও অনেক সময় দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট আইনসভার অপরিহার্যতার কথাও বলা হয়। বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট আইন সভা অপরিহার্য বলে অনেক সময় যুক্তি দেখান হয়। কারণ, যুক্তরাষ্ট্রে জাতীয় ঐক্যের যেমন প্রয়োজনীয়তা আছে, ছোট-বড নির্বিশেষে সংশ্লিষ্ট অংগরাজ্যগুলির তেমনি স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রাখাব প্রয়োজনীয়তাও তেমনি অনস্বীকার্য। যুক্তরাষ্ট্রে উচ্চতন কক্ষের গঠন প্রণালীর মধ্যে সংশ্লিষ্ট অংগরাজ্যগুলির অংগরাজ্য হিসেবে তাদের স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্যকে সংবক্ষণ করার প্রচেষ্টা দেখা যায়।

দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট আইনসভার স্বপক্ষে এই জোড়াল যুক্তিগুলি থাকা সত্ত্বেও আমাদের স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে হ্যারোল্ড ল্যাস্কির মত চিন্তাশীল রাষ্ট্রবিজ্ঞানী এই প্রথার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেছেন। অধ্যাপক ল্যাস্কির মতে গ্রেটব্রিটেনেব পার্লামেণ্ট দুটি কক্ষ বিশিষ্ট হওয়ার উদাহরণ থেকেই অন্যান্য রাষ্ট্রের আইনসভাগুলিকেও দুটি কক্ষ বিশিষ্ট করা হয়েছে। কিন্তু ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের দুটি পৃথক কক্ষের অস্তিত্ব একটি ঐতিহাসিক আকস্মিক ঘটনা মাত্র (historical accident)। এই অভিমতের দ্বারা ল্যাস্কি বলতে চেয়েছেন যে, কেবলমাত্র অবস্থিতিব জন্যই কোন রাষ্ট্রনৈতিক ঘটনার যাথার্থ প্রতিপন্ন হয় না। কায়েমী স্বার্থ ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের তরফ থেকে প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত এই কক্ষ জনপ্রতিনিধিমূলক নিম্নতন কক্ষের দ্রুত এবং প্রগতিমূলক আইন প্রণয়ণের বিরুদ্ধে প্রায়শই প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে।

বিভিন্ন শ্রেণী ও সম্প্রদায় সমন্বিত ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট আইন সভার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য বলেই ধরে নেওয়া হয়েছিল। গণপরিষদে এই প্রসংগে আলোচনাকালে উক্তপরিষদের অন্যতম সদস্য শ্রীগোপালস্বামী আয়েঙ্গার স্পষ্ট ভাবেই বলেছিলেন, "এই প্রসংগে বিশেষভাবে যুক্তির অবতারণা করার কোন প্রয়োজন নেই"।[1] শ্রীআয়েঙ্গার ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোতে

1. "After all no elaborate justification was needed"
CAD, Vol. IV, P. 927.

দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট আইনসভার অপরিহার্যতার কথা উল্লেখ করে বলেছিলেন, "পৃথিবীর যেখানেই উল্লেখযোগ্য যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত আছে সেখানেই দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট আইন সভার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়েছে।"[1] অবশ্য রাজ্যসভার গঠন প্রণালীর দিকে লক্ষ্য করলে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যকে যথাযথ ভাবে রক্ষা করার জন্যই এই কক্ষের প্রবর্তন করা হয়েছে—এমন কথা আমরা বলতে পারি না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দ্বিতীয় কক্ষ অর্থাৎ সিনেটে প্রত্যেক অংগ রাষ্ট্র থেকে সমান সংখ্যক সদস্য নির্বাচিত হন। অস্ট্রেলিয়ার যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্রেও সেখানকার দ্বিতীয় কক্ষ অর্থাৎ সিনেটকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনুকরণে গঠন করা হয়েছে। প্রত্যেক অংগরাজ্য থেকে সমানসংখ্যক প্রতিনিধি নিয়ে দ্বিতীয় কক্ষকে গঠিত করার মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে অংগরাজ্য হিসেবে প্রত্যেকের স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্যকে সমানভাবে অক্ষুণ্ণ রাখা। অন্যথায় বৃহত্তর জনসংখ্যাসম্পন্ন এলাকার চাপে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রতর অংগরাজ্যগুলির স্বাতন্ত্র্য নষ্ট হবার সম্ভাবনা থাকে। ভারতের সংবিধানে এই নিয়মের ব্যতিক্রম করা হয়েছে। প্রত্যেক রাজ্যের জনসংখ্যার ভিত্তিতেই রাজ্যসভায় প্রতিনিধি সংখ্যা স্থিরীকৃত হয়েছে। উত্তরপ্রদেশ থেকে রাজ্যসভায় প্রতিনিধি সংখ্যা ৩৪, আর পশ্চিমবংগ থেকে ১৬ জন মাত্র। স্পষ্টতই এই ব্যবস্থা যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতির বিরোধী। প্রকৃতপক্ষে অংগরাজ্যের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য রাজ্যসভা গঠিত হয়নি—একথা গণপরিষদ প্রথম থেকেই ঘোষণা করে এসেছে।

লোকসভা কর্তৃক গৃহীত প্রস্তাবগুলি পুনর্বিবেচনার জন্য রাজ্যসভার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করা হয়েছিল। আয়ার্ল্যাণ্ডের সিনেট অথবা গ্রেটব্রিটেনের লর্ডসভা যেমন নিম্নতম কক্ষের বিলগুলি বিভিন্ন দিক থেকে পুনর্বিবেচনা করে আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করে, আমাদের রাজ্যসভার জ্ঞানী-গুণী সদস্যরাও তেমনি লোকসভা কর্তৃক আনীত বিলগুলি পুনর্বিবেচনা করে আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে এক মূল্যবান কর্তব্যপালন করবে।

রাজ্যসভার বর্তমান সংগঠনকে যেভাবে রূপ দেওয়া হয়েছে তার যৌক্তিকতা এক অবশ্য বিচার্য বিষয়। আমাদের বর্তমান সংবিধানে দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট আইনসভার অপরিহার্যতা অনুভব করে গণপরিষদের সদস্য শ্রীগোপালস্বামী আয়েংগার বলেছিলেন, "এই প্রসংগে বিশেষভাবে যুক্তির অবতারণা করার

1. The need for a Second Chamber has been felt practically all over the world, wherever there is federation of any importance".

CAD, Vol. IV, P. 927.

প্রয়োজন নেই।" বস্তুতঃ, ভারত বিভিন্ন ভাষা, কৃষ্টি, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্যে ভরা এক বিশাল দেশ। তাই এর বিভিন্নমুখী সমস্যাগুলি জটিল ও বৈচিত্র্যময়। এই সমস্যাগুলির সমাধানের দায়িত্বও তাই গণপরিষদের সদস্যরা একটি মাত্র কক্ষের হাতে ছেড়ে দেওয়া স্বভাবতই যুক্তিযুক্ত মনে করেননি।

ভারতে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হলেও কেন্দ্রীয় সরকার ও অংগরাজ্যগুলিকে সমান ক্ষমতাসম্পন্ন করা হয়নি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত বিচারবিভাগকেও চূড়ান্ত ক্ষমতাশালী করা হয়নি। সংবিধান কেন্দ্রীয় সরকারকে অতিমাত্রায় ক্ষমতাশালী করেছে। প্রয়োজনবোধে পার্লামেণ্ট আইন তৈরী করে অংগরাজ্যগুলির সীমানা কমাতে বা বাড়াতে পারে অথবা নতুন রাজ্যও সৃষ্টি করতে পারে। পার্লামেণ্টের আইন প্রণয়নের বা অন্যান্য কার্যাবলীর পরিসরও সুবিস্তৃত। প্রকৃতপক্ষে, সংবিধান-নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে পার্লামেণ্টই এখানে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। এমতাবস্থায় আইন সভার যাবতীয় কার্যাবলীর দায়িত্ব একটিমাত্র কক্ষের হাতে ছেড়ে না দেওয়া সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত হয়েছে একথা আমাদের স্বীকার করে নিতে হবে।

তাছাড়া, আমাদের সংবিধান যুক্তরাষ্ট্রীয়। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা অপরিহার্য বলে অধিকাংশ রাষ্ট্রবিজ্ঞানী মত প্রকাশ করেছেন। ভারতের ক্ষেত্রে দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট আইনসভার প্রয়োজনীয়তা সংবিধান প্রণেতা ও সাংবিধানিক পণ্ডিতেরাও স্বীকার করেছেন। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের অন্যতম ব্যাখ্যাতা শ্রী এস. এম. বোস বলেছেন, "এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থায় উচ্চতন কক্ষের প্রয়োজনীয়তার যেকোন যুক্তি দেওয়া হোক না কেন, দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার এক প্রয়োজনীয় এবং অপরিহার্য শর্ত"।[1] বর্তমান সংবিধান প্রণেতাদের অন্যতম প্রণেতা শ্রীগোপাল স্বামী অয়েংগার এই প্রসংগে বলেছেন, "পৃথিবীর যেখানেই উল্লেখযোগ্য যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত আছে, সেইখানেই দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভা প্রবর্তিত হয়েছে।" অবশ্য আমাদের রাজ্যসভায় বিভিন্ন অংগরাজ্যগুলি থেকে যেভাবে প্রতিনিধি গ্রহণের ব্যবস্থা হয়েছে, তা যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতিসম্মত কিনা সেটি তর্কের বিষয়বস্তু। প্রত্যেক অংগরাজ্যের বিধানসভার সদস্যদের দ্বারা

1. "But whatever may be urged as to the necessity of a Second Chamber in unitary States, bicameralism appears to be an essential and inseparable attribute of federation".

S. M. Bose : The working of the constitution of India.

অপ্রত্যক্ষভাবে রাজ্যসভায় প্রতিনিধি নির্বাচনের বিধান থাকায় প্রত্যেক অংগরাজ্য সমান সংখ্যক প্রতিনিধি প্রেরণের সুযোগ পায় না। উত্তরপ্রদেশ যে সংখ্যক সদস্য প্রেরণ করতে পারে, পশ্চিম বাংলা তার অর্ধেকেরও কম সংখ্যক প্রতিনিধি নির্বাচন করতে পারে। স্পষ্টতঃই এই ব্যবস্থা যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতি বিরোধী। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিতীয় কক্ষ অর্থাৎ সিনেটে প্রত্যেক অংগ-রাষ্ট্র থেকে সমান সংখ্যক প্রতিনিধি প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হন। অস্ট্রেলিয়ার যুক্তরাষ্ট্রেও সিনেটকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনুকরণে গঠন করা হয়েছে। প্রত্যেক অংগরাজ্য থেকে সমান সংখ্যক প্রতিনিধি নিয়ে উর্ধ্বতন কক্ষ গঠন করার মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে অংগরাজ্য হিসেবে প্রত্যেকের বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্যকে সমানভাবে অক্ষুণ্ণ রাখা। অন্যথায় বৃহত্তর জনসংখ্যা সম্পন্ন এলাকার চাপে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রতর অংগরাজ্যগুলির স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য ক্ষুণ্ণ হবার সম্ভাবনা থাকে। অবশ্য ভারতের ক্ষেত্রে এই নিয়মের ব্যতিক্রম হওয়ার কয়েকটি সংগত কারণ আছে। প্রথমতঃ, ভারতের অংগরাজ্যগুলির এলাকা ও জন-সংখ্যার এত তারতম্য বিদ্যমান যে প্রত্যেক অংগরাজ্য থেকে সমানসংখ্যক প্রতিনিধি প্রেরণের ব্যবস্থা থাকলে বৃহৎ অংগরাজ্যগুলির উপর অবিচার করা হবে। কারণ এক্ষেত্রে ক্ষুদ্র অংগরাজ্যগুলি বৃহত্তর ও অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ অংগরাজ্যগুলির উপর তাদের সিদ্ধান্তকে চাপিয়ে দিতে সক্ষম হবে। তাছাড়া, ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ঐতিহাসিক পটভূমিকাও এক নয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান অংগরাজ্যগুলি এক যুক্ত-রাষ্ট্রীয় কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে একত্র হবার আগে তারা প্রত্যেকে ছিল সার্বভৌম ক্ষমতাসম্পন্ন রাষ্ট্র। সুতরাং যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা গ্রহণের সময় তারা রাষ্ট্র হিসেবে আভ্যন্তরীণ সার্বভৌমত্ব বজায় রাখায় আগ্রহশীল ছিল। এই আভ্যন্তরীণ সার্বভৌমত্ব যথাসম্ভব বজায় রাখার প্রয়োজনেই তারা সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্র-গুলির হাতে অধিকাংশ ক্ষমতা ছেড়ে দিয়ে মাত্র স্বল্প কয়েকটি বিষয় কেন্দ্রীয় সরকারের পরিচালনায় রেখে দেয়। এর ফলে সেখানে এমনই এক যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হ'ল যার কেন্দ্র হ'ল দুর্বল আর সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রগুলি হ'ল অপেক্ষাকৃত অধিক সংখ্যক ক্ষমতার অধিকারী। কিন্তু আমাদের দেশে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের ইতিহাস স্বতন্ত্র। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের দ্বারা সমগ্র শাসনব্যবস্থাকে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোতে তৈরী করা হলেও, তদানীন্তন প্রদেশগুলি ছিল মুখ্যতঃ এক-একটি প্রশাসনিক সংগঠন মাত্র। তার

আগের শাসনব্যবস্থা সম্বন্ধেও একই কথা বলা যেতে পারে। সুতরাং প্রতিটি অংগরাজ্যের স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য তাদের প্রত্যেকের তরফ থেকে সমান সংখ্যক প্রতিনিধি দিয়ে কেন্দ্রের উচ্চতন কক্ষ সংগঠন করার ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তা এখানে ছিল না। জাতীয় ঐক্যের সমস্যাই এখানে বড সমস্যা। তাই গণপরিষদের কোন কোন সদস্য রাজ্যসভাকে অংগরাজ্যের স্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্য তাদের প্রত্যেকের তরফ থেকে সমান সংখ্যক প্রতিনিধি নিয়ে তাকে গঠন করাব প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করলেও সংবিধান প্রণেতাদের অধিকাংশের কাছেই এই প্রস্তাব যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়নি। অবশ্য রাজ্যসভার গঠন প্রণালীর মধ্যে অংগরাজ্যের প্রতিনিধিত্বের দিকে একবারেই লক্ষ্য দেওয়া হয়নি—এই যুক্তিও ঠিক নয়। সংবিধানের ২৪৯ অনুচ্ছেদ অনুসারে রাজ্যসভার দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য উপস্থিত হয়ে এবং ভোট দিয়ে যদি প্রস্তাব কবেন যে পার্লামেণ্ট জাতীয় স্বার্থের উদ্দেশ্যে রাজ্যতালিকার কোন বিষয়ের উপর আইন প্রণয়ন করুন, তাহলে এই প্রস্তাব বলবৎ থাকা কালীন অবস্থায় পার্লামেণ্টের উক্ত বিষয় সম্পর্কে আইন প্রণয়ন করা সম্পূর্ণ বৈধ হবে।

আমরা আগেই দেখেছি যে, রাজ্যসভার অধিকাংশ সদস্য বিভিন্ন অংগরাজ্যের বিধানসভার সদস্যদেব দ্বারা নির্বাচিত এবং ১২ জন মাত্র সদস্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত হন। বিভিন্ন বিধানসভার সদস্যগণ কর্তৃক একক হস্তান্তর ভোটের দ্বারা সমানুপাতিক ভিত্তিতে নির্বাচনের স্বপক্ষে যুক্তি এই যে, প্রত্যেক অংগরাজ্যের বিধানসভার বিভিন্ন দল এবং সম্প্রদায় এই ব্যবস্থায় রাজ্যসভায় প্রতিনিধিত্বের সুযোগ পাবে। স্পষ্টতই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে প্রতিনিধি প্রেরণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত না করার জন্যই এই নিয়মের প্রবর্তন করা হয়েছে।

রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সদস্য মনোনয়ন করার বিধান আপাতদৃষ্টিতে গণতন্ত্র-বিরোধী বলে মনে হলেও এর যৌক্তিকতা একবারেই অস্বীকার করা যায় না। ধীশক্তি ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিদের আইনসভার পরামর্শ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা চলে না। গণপরিষদের অন্যতম সদস্য শ্রীগোপাল স্বামী আয়েংগার বলেছেন, "ধীশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিদের তাদের জ্ঞানের পরিসর দিয়ে বিতর্কে অংশ গ্রহণের সুযোগ দেওয়া"[1] রাজ্যসভা গঠনের অন্যতম উদ্দেশ্য। বর্তমান সংবিধানের আগে ১৯১৯ সালের এবং ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন

1. "To give an opportunity, perhaps to Seasoned people……to participale in the debate with an amount of learing". *CAD* IV. P. 927.

আইনের গভর্ণর জেনারেল কর্তৃক Council of Stateএ সদস্য মনোনীত করার বিধান ছিল। স্বাধীন আয়ার্লণ্ডের সংবিধানে কেন্দ্রীয় আইনসভার দ্বিতীয় কক্ষে (Senad Eireman) মনোনীত সদস্য গ্রহণের বিধান আছে। আয়ার্লণ্ডের দ্বিতীয় কক্ষে প্রতিনিধি মনোনয়নের বিধান অপেক্ষা আমাদের সংবিধানে উল্লিখিত নিয়ম অধিকতর গণতান্ত্রিক নীতিসম্মত এবং প্রকৃত জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিদের সুযোগ দেওয়ার পক্ষে অধিকতর উপযোগী। কারণ আয়ার্লণ্ডের দ্বিতীয় কক্ষে ৬০ জন সদস্যের মধ্যে ১১ জন সদস্য প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক মনোনীত হন; আমাদের সংবিধানে ২৫০ জনের মধ্যে মাত্র ১২ জন সদস্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত হবেন। তাছাড়া, আমাদের দেশে এই মনোনয়নের বিধান রাষ্ট্রপতি কর্তৃক, যিনি সমগ্র জাতির প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করবেন —এ রকম আশা করা যেতে পারে।

পার্লামেণ্টের ক্ষমতা ও কার্যাবলী (Powers and Functions of Parliament)ঃ

পার্লামেণ্টের ক্ষমতাগুলির মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় তার আইন প্রণয়নের ক্ষমতা। সংবিধানের যে তিনটি তালিকা উল্লেখ আছে তার মধ্যে ইউনিয়ন তালিকার (Union List) অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলির উপর পার্লামেণ্ট আইন তৈরী করতে পারে। ইউনিয়ন তালিকাভুক্ত বিষয়গুলির মধ্যে বৈদেশিক নীতি, দেশরক্ষা, ডাক-তার, মুদ্রাব্যবস্থা, রেলপথ, বীমা, ব্যাঙ্ক প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। যুগ্ম তালিকার (Concurrent List) অন্তর্ভুক্ত বিষয়বস্তুগুলি উপর পার্লামেণ্টের ও রাজ্য আইনসভার আইন প্রণয়নের ক্ষমতা আছে। কোন রাজ্যের প্রণীত আইনের সংগে ইউনিয়নের আইনের কোন বিরোধ বা অসংগতি থাকলে রাজ্যের প্রণীত আইনের অসংগতিপূর্ণ অংশ নাকচ হয়ে গিয়ে ইউনিয়নের আইনটিই কার্যকরী হয়। জরুরী অবস্থায় রাজ্যতালিকার বিষয়গুলির উপরও পার্লামেণ্ট আইন প্রণয়ন করতে পারে। তাছাড়া, রাজ্যসভার দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের ভোটে যদি প্রস্তাব গৃহীত হয় যে দেশের বৃহত্তর স্বার্থের জন্য পার্লামেণ্টের রাজ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত কোন বিষয়ের উপর আইন প্রণয়ন করা উচিত, তাহলে সেই বিষয়টি রাজ্য তালিকাভুক্ত হলেও তার উপর পার্লামেণ্টের আইন প্রণয়ন করা চলবে।

আইন প্রণয়ন

শাসনবিভাগকে নিয়ন্ত্রিত করা পার্লামেণ্টের অন্যতম গুরুত্বপুর্ণ কাজ। সংবিধান মন্ত্রীসভাকে লোকসভার কাছে যৌথভাবে দায়ী করেছে। পার্লামেণ্টের সদস্যরা

মন্ত্রীসভাকে প্রশ্ন করে, অথবা অনাস্থাসূচক প্রস্তাব এনে এই দায়িত্বকে কার্যকরী করতে পারে। যদিও পার্লামেণ্টের আস্থা হারালে মন্ত্রীপরিষদ পদত্যাগ করবে, একথা সরাসরিভাবে সংবিধানে বলা নেই এবং রাষ্ট্রপতির আস্থার উপর তাদের স্থায়িত্বকে নির্ভরশীল করা হয়েছে

মন্ত্রীসভাকে নিয়ন্ত্রণ

(The ministers shall hold office during the pleasure of the President), তথাপি আমরা আশা করতে পারি যে পার্লামেণ্ট চালিত শাসনব্যবস্থার প্রচলিত নিয়ম অনুসারে মন্ত্রীসভা এমত অবস্থায় পদত্যাগ করবেন। অন্যথায় রাষ্ট্রপতি তাদের পদচ্যুত করতে পারেন, অথবা পার্লামেণ্টের সম্মতি অনুসারে শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করা অসম্ভব হয়ে উঠবে। সুতরাং পার্লামেণ্টের অনাস্থাভাজন মন্ত্রীসভা অবশ্যই পদত্যাগ করবেন, এরূপ আমরা ধরে নিতে পারি। সরকারকে নিয়ন্ত্রিত করতে হলে মন্ত্রীসভার কাজের যেমন সমালোচনা করা প্রয়োজন হয়, তেমনি তাদের নির্ধারিত নীতি ও প্রস্তাবকে সমর্থন করে সরকারের স্থায়িত্ব বিধান করাও প্রয়োজন। যে রাজনৈতিক দল পার্লামেণ্টের অধিকাংশ আসন দখল করতে সক্ষম হয়েছে তার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকেই রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী পদে নিয়োগ করেন এবং তাঁরই পরামর্শক্রমে তিনি অন্যান্য মন্ত্রীদের নিয়োগ করে থাকেন। এর ফলে মন্ত্রীসভা পার্লামেণ্টের অধিকাংশ সদস্যের সমর্থন লাভ করে সরকার পরিচালনা করতে সক্ষম হন। অবশ্য যদি এমন অবস্থার উদ্ভব হয় যে পার্লামেণ্টের অধিকাংশ সদস্য মন্ত্রীসভার সিদ্ধান্তকে মেনে নিচ্ছেন না, অথচ মন্ত্রীসভা তাঁদের সিদ্ধান্তের পিছনে জনমতের সমর্থন সম্বন্ধে আশা পোষণ করছেন, তাহলে প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতিকে পার্লামেণ্ট ভেঙে দিয়ে পুনর্নির্বাচনের জন্য অনুরোধ জানাতে পারেন। অবশ্য এই প্রসংগে উল্লেখযোগ্য যে, রাজনৈতিক দলপ্রথা উদ্ভবের ফলে বর্তমানে পার্লমেণ্টের মন্ত্রীসভাকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা অনেকটা কমে গিয়েছে। মন্ত্রীসভার সদস্যরা পার্লামেণ্টে অধিকাংশ আসন দখলকারী রাজনৈতিক দলের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। সুতরাং তাঁদেরই নিয়ন্ত্রণে আজ পার্লামেণ্ট পরিচালিত হয়। পার্লামেণ্টে কোন আইন প্রণীত হবার আগে মন্ত্রীসভায় এবং ক্ষেত্রবিশেষে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নিজস্ব সভায় তার মূল নীতিটি আলোচিত হয়। কাজেই মন্ত্রীসভা সে সম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে পার্লামেণ্ট স্বভাবতই তাতে সম্মতি জানায়।

সরকারের আয়-ব্যয়ের নিয়ন্ত্রণ করাও পার্লামেণ্টের অন্যতম কর্তব্য। সরকারের ব্যয় নির্বাহের জন্য যে অর্থের প্রয়োজন তা সরকার আরোপিত কর বা

ঋণের মাধ্যমে আসে। পার্লামেণ্টের অনুমোদন ব্যতিরেকে কোন বিষয়ের উপর কর আরোপ করা যায় না। কোন্ খাতে কত ব্যয় হবে তা মঞ্জুর করাও পার্লামেণ্টের কাজ। অবশ্য রাষ্ট্রপতির অনুমোদন ব্যতিরেকে কোন অর্থসংক্রান্ত বিল পার্লামেণ্টে উপস্থাপিত করা যায় না। কতকগুলি বিশেষ খরচা আছে যেগুলিকে Expenditures charged on the consolidated fund of India' বলা হয়। এগুলির জন্য প্রতি বৎসর পার্লামেণ্টের অনুমোদন প্রয়োজন হয় না। রাষ্ট্রপতির বেতন ও ভাতা, উপরাষ্ট্রপতির বেতন ও ভাতা, লোকসভায় অধ্যক্ষ ও সহকারী অধ্যক্ষের বেতন ও ভাতা, সুপ্রীমকোর্টের বিচারপতিগণের বেতন ও ভাতা এবং সরকারী ঋণের সুদ ইত্যাদি এই খরচের অন্তর্গত। বাকী সমস্ত খরচগুলির জন্য পার্লামেণ্টের অনুমোদন প্রয়োজন। অবশ্য এই প্রসংগে উল্লেখযোগ্য যে, পার্লামেণ্টের সরকারী আয়-ব্যয় নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা আজকাল নিছক অনুষ্ঠানে পর্যবসিত হয়েছে। সরকারের আয়-ব্যয় সম্বন্ধে প্রস্তাব করার সংবিধানগত নিয়ম, আয়-ব্যয়েব জটিলতা এবং সময়ের সংক্ষিপ্ততা হেতু পার্লামেণ্টের সদস্যদের সরকারী আয়-ব্যয়ের বিভিন্ন দিক বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা সম্ভব নয়।

আয়-ব্যয়েব নিয়ন্ত্রণ

পার্লামেণ্টের বিচারসংক্রান্ত ক্ষমতাও আছে। পার্লামেণ্ট রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি অথবা সুপ্রীমকোর্টের বিচারপতিগণকে ইম্পীচ করতে পারে। সংবিধানের ৬১ অনুচ্ছেদ অনুসারে পার্লামেণ্টের যে কোন কক্ষ সংবিধান ভংগের অপরাধে ইম্পীচমেণ্টের অভিযোগ আনতে পারে। যে কক্ষ ইম্পীচমেণ্টের অভিযোগ আনবে সে কক্ষ ছাড়া, অন্য কক্ষ সে সম্বন্ধে তদন্ত করবে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। সুপ্রীমকোর্ট বা হাইকোর্টের কোন বিচারপতি অযোগ্য বা দুর্নীতিপরায়ণ মনে করলে পার্লামেণ্ট রাষ্ট্রপতির কাছে আবেদন জানাতে পারে এবং পার্লামেণ্টের উভয় কক্ষের দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে ঐ আবেদন পাস হলে তাকে অপসারিত করা হবে।

বিচারসংক্রান্ত ক্ষমতা

এছাড়া, পার্লামেণ্টের নির্বাচন-সক্রান্ত ক্ষমতাও রয়েছে। রাষ্ট্রপতি পার্লামেণ্টের নির্বাচিত সদস্য এবং রাজ্যবিধানসভার নির্বাচিত সদস্যদের ভোটে একক হস্তান্তর-যোগ্য সমানুপাতিক নির্বাচন পদ্ধতির মাধ্যমে এক বিশেষ নির্বাচকমণ্ডলী কর্তৃক নির্বাচিত হন। এই নির্বাচকমণ্ডলীতে পার্লামেণ্টের সদস্যের ভোট সংখ্যা এবং রাজ্য-বিধানসভার সদস্যদের ভোট সংখ্যা যথাসম্ভব সমান থাকে। স্বভাবতই পার্লামেণ্টই এই নির্বাচনে গুরুত্বপূর্ণ

নির্বাচনসংক্রান্ত ক্ষমতা

অংশ গ্রহণ করে। ভারতের উপরাষ্ট্রপতিও পার্লামেণ্টের উভয় কক্ষ কর্তৃক নির্বাচিত হন।

পার্লামেণ্ট মন্ত্রীপরিষদ ও সরকারী নীতির সমালোচনা করে জনমতকে যথেষ্ট প্রভাবিত করে। মন্ত্রীসভাকে প্রশ্ন করে ও সরকারী নীতির সমালোচনা করে এবং ক্ষেত্রবিশেষে সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থাসূচক প্রস্তাব এনে সরকারী কার্যকলাপ সম্বন্ধে জনমতকে সজাগ করে তোলে। সুতরাং পার্লামেণ্টকেই আমরা ভারতীয় গণতন্ত্রের বাহক বলে গণ্য করতে পারি। প্রকৃতপক্ষে পার্লামেণ্ট মন্ত্রীসভা কর্তৃক পরিচালিত হলেও ভারতের পার্লামেণ্ট ক্ষেত্রবিশেষে দল নির্বিশেষে সরকারের সমালোচনা করতে দ্বিধা করেনি। পার্লামেণ্ট দলীয় ব্যবস্থার মাধ্যমে পরিচালিত সন্দেহ নেই, কিন্তু জাতির প্রতিনিধি স্থানীয় সংস্থা হিসেবে নিরপেক্ষভাবে সরকারী নীতির সমালোচনা করে এবং অনেকক্ষেত্রে সরকারকে তার নীতি পরিবর্তন করতে বাধ্য করে গণতন্ত্রের যথার্থ আদর্শকেই কার্যকরী করতে সাহায্য করেছে—একথা আমাদের স্বীকার করতেই হবে।

লোকসভা ও রাজ্যসভার মধ্যে সম্পর্ক (Relation between the two Houses of Parliament):

ক্ষমতার দিক থেকে বিচার করলে একমাত্র অর্থসংক্রান্ত বিল ছাড়া, অন্যান্য বিল পাস করার ব্যাপারে পার্লামেণ্টের উভয় কক্ষই সমান ক্ষমতার অধিকারী। অর্থসংক্রান্ত বিল ছাড়া, অন্য যে কোন বিল পার্লামেণ্টের উভয় কক্ষে উত্থাপিত হতে পারে। অর্থ সংক্রান্ত বিল কেবল লোকসভাতেই উত্থাপিত হবে।

সাধারণভাবে বলা যেতে পারে যে, উভয় কক্ষ সম্মত না হলে কোন সাধারণ বিল আইনে পরিণত হতে পারবে না। কোন বিল একটি কক্ষে গৃহীত হলে এবং অন্য কক্ষ সেটি নাকচ করলে অথবা ছয় মাসের মধ্যে ফেরৎ না দিলে অথবা কোন সংশোধন প্রস্তাব নিয়ে দুটি কক্ষের মধ্যে মতবিরোধ উপস্থিত হলে রাষ্ট্রপতি তার চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য দুটি কক্ষের যুগ্ম অধিবেশন আহ্বান করবেন্।. এই যুগ্ম অধিবেশনে বিলটি মোট উপস্থিত ভোট দান কারী সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠদের ·ভোটে পাস হলে, বিলটি উভয় কক্ষ কর্তৃক পাস হয়েছে বলে ধরে নেওয়া হবে। অবশ্য এক্ষেত্রে লোকসভার অভিমতই শেষ পর্যন্ত কার্যকরী হবে, কারণ লোকসভার সদস্য সংখ্যা রাজ্যসভার সদস্য সংখ্যার দ্বিগুণ। এই প্রসংগে উল্লেখযোগ্য যে, পার্লামেণ্টের উভয় কক্ষের যুগ্ম

অধিবেশনে কেবলমাত্র বিলটি পাস হতে দেরী হওয়ার জন্য অপরিহার্য সংশোধনী প্রস্তাব ব্যতীত, অন্য কোন সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করা চলবে না। অবশ্য বিলটি কোন এক কক্ষে প্রথম উত্থাপিত হওয়ার পর অন্য কক্ষে প্রেরিত হলে সেই কক্ষ যদি কোন সংশোধন প্রস্তাব করে তাহলে এই প্রস্তাব যুগ্ম অধিবেশনে আলোচনা করা চলবে।

অর্থ-সংক্রান্ত বিল পাস করার বিষয়ে রাজ্যসভার ক্ষমতা খুবই কম। অর্থ-সংক্রান্ত বিল প্রথমে লোকসভাতেই উত্থাপন করতে হবে।

কোন বিল অর্থ-সংক্রান্ত বিল কিনা সে নিয়ে প্রশ্ন উঠলে লোকসভার স্পীকারের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য করা হবে। অর্থসংক্রান্ত বিল লোকসভায় পাস হওয়ার পর সেটিকে রাজ্যসভার অভিমতের জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হবে। রাজ্যসভাকে ১৪ দিনের মধ্যে তার মতামত সহ বিলটিকে লোকসভায় পাঠিয়ে দিতে হবে। যদি ১৪ দিনের মধ্যে রাজ্যসভা বিলটিকে ফেরৎ না দেয় তাহলে বিলটি লোকসভায় যেমন ভাবে পাস হয়েছে সেইভাবে উভয় কক্ষ কর্তৃক পাস হয়েছে বলে ধরে নেওয়া হবে। রাজ্যসভা উক্ত ১৪ দিনের মধ্যে তার মতামত সহ যদি বিলটিকে পাঠায়, তাহলেও লোকসভা সেই মতামতটিকে গ্রহণ করতে বাধ্য নয়। লোকসভা এক্ষেত্রেও রাজ্যসভার মতামত গ্রহণ করতে পারে অথবা নাও করতে পারে। যাই হোক, উক্ত সময়ের মধ্যে বিলটি লোকসভার ফেরৎ আসার পর এই কক্ষের সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে সেটি উভয় কক্ষ কর্তৃক পাস হয়েছে বলে ধরে নেওয়া হবে এবং রাষ্ট্রপতির সম্মতি পাওয়ার পরে সেটি আইনে পরিণত হবে। সুতরাং স্পষ্টই দেখা যায় যে, অর্থ-সংক্রান্ত বিল পাস করার ব্যাপারে লোকসভার চাইতে রাজ্যসভার ক্ষমতা কম।

আর একটি বিশেষ ক্ষেত্রেও লোকসভাকে রাজ্যসভার চাইতে অধিক ক্ষমতার অধিকারী করা হয়েছে। সংবিধানে ৭৫ (৩) অনুচ্ছেদ অনুসারে মন্ত্রীসভাকে লোকসভার কাছে যৌথভাবে দায়ী করা হয়েছে। এর ফলে মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে লোকসভা কোন অনাস্থাসূচক প্রস্তাব পাস করলে মন্ত্রী-সভাকে পদত্যাগ করতে হয়। প্রধানমন্ত্রী এবং মন্ত্রীসভার অন্যান্য সদস্যরা সাধারণতঃ লোকসভার সদস্য হন। অবশ্য রাজ্যসভার সদস্যদের মন্ত্রীসভার সদস্য হতে কোন বাধা নেই। বর্তমান প্রতিরক্ষা মন্ত্রী শ্রীচ্যবন রাজ্যসভার সদস্য। তবে যেহেতু লোকসভাই জাতির প্রতিনিধি স্থানীয় সংস্থা, তজ্জন্য মন্ত্রীসভার অধিকাংশ সদস্য সাধারণতঃ এই পরিষদেরই সদস্য হন।

এই সমস্ত দিক বিবেচনা করে আমরা রাজ্যসভার ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা লক্ষ্য করতে পারি। এটি স্বাভাবিক। কারণ লোকসভার সদস্যরা প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত এবং সেই হেতু এই সভাই প্রকৃতপক্ষে জাতির প্রতিনিধিস্থানীয় সংস্থা হিসেবে দাবী করতে পারে। রাজ্যসভার সদস্যরা অপ্রত্যক্ষভাবে রাজ্যবিধানসভার সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত এবং তাঁদের মধ্যে রাষ্ট্রপতির মনোনীত সদস্যও আছেন। এরূপ অবস্থায় স্বভাবতই লোকসভা অধিকতর প্রতিনিধি স্থানীয় সংস্থা হিসেবে বেশী ক্ষমতার অধিকারী। একমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ছাড়া, পৃথিবীর সকল দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট আইনসভাতেই উচ্চতন কক্ষের ক্ষমতা কম। গ্রেটব্রিটেনে ১৯১১ সালে পার্লামেণ্ট আইনের দ্বারা অর্থ-সংক্রান্ত ব্যাপারে এবং ১৯৪৯ সালে সাধারণ ব্যাপারে উচ্চতন কক্ষ, হাউস অব লর্ডসের (House of Lords) ক্ষমতা কমিয়ে দিয়েছে। অবশ্য যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় সংশ্লিষ্ট অংগরাজ্যগুলির স্বার্থের রক্ষক হিসেবে উচ্চতন কক্ষের একটি বিশেষ মর্যাদা আছে। আমাদের সংবিধানে সে মর্যাদা কতটা দেওয়া হচ্ছে সে প্রশ্নটি নিয়েও তর্কের অবকাশ আছে।

লোকসভার অধ্যক্ষ (Speaker of the House of the People) :

আমাদের সংবিধানে লোকসভার সভাপতিকে অধ্যক্ষ (Speaker) বলা হয়। লোকসভার অধ্যক্ষ হিসেবে তাঁর প্রধান কাজ হচ্ছে লোকসভার অধিবেশন পরিচালনা করা এবং এর নিয়মানুবর্তিতা বজায় রাখা। সভার কার্য পরিচালনা পদ্ধতি সম্পর্কে যথাযথ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা অধ্যক্ষের তৎপরতা, পারদর্শিতা ও ব্যক্তিত্বের উপর নির্ভর করে তিনিই লোকসভার সদস্যগণের অধিকার এবং অব্যাহতি (Privileges and Immunities) সমূহের ধারক এবং বাহক। কোন বিল অর্থ-সংক্রান্ত বিল কিনা সে সম্বন্ধে লোকসভায় মতবিরোধ উপস্থিত হলে, সংবিধানের নিয়মানুসারে লোকসভার অধ্যক্ষের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

উপরোক্ত কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে হলে তাঁকে সভাপতি হিসেবে নিরপেক্ষ এবং যতদূর সম্ভব নির্দলীয় হতে হবে। আমরা গ্রেটব্রিটেনের অনুকরণে মন্ত্রীসভা চালিত শাসনব্যবস্থা গ্রহণ করেছি কিন্তু দুঃখের বিষয় কমন্স-সভার (House of Commons) স্পীকারের নিরপেক্ষ এবং নির্দলীয় ভূমিকাটি আমরা অনুকরণ করিনি। গ্রেটব্রিটেনে কমন্স-সভার স্পীকার, স্পীকার

পদে নির্বাচিত হবার পর কোন রাজনৈতিক দলের সংগে সংস্রব রাখেন না। স্পীকার নির্বাচিত হওয়ার পর কোন রাজনৈতিক দলের সভায় যোগদান করতে, অথবা কোন দলীয় নীতির সমর্থনে বক্তৃতা করতে তাঁকে দেখা যাবে না। স্পীকারের পদ নির্বাচনের সময় একজন সাধারণ সদস্যের দ্বারা তাঁর নাম প্রস্তাব করান হয় এবং আর একজন সাধারণ সদস্য তাঁর নাম সমর্থন করেন। এই নির্বাচনে কোন প্রকার প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় না। শুধু তাই নয়, সাধারণ নির্বাচনের সময় স্পীকার যে নির্বাচনকেন্দ্র থেকে প্রার্থী দাঁড়ান, অন্য কোন রাজনৈতিক দল তাঁকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য কোন প্রার্থী দাঁড় করান না। অবশ্য এর ব্যতিক্রম যে কখন হয়নি এমন কথা নয়। যাই হোক, গ্রেটব্রিটেনের কমন্স সভায় স্পীকারের নিরপেক্ষ ও নির্দলীয় ভূমিকাটি অনুকরণযোগ্য তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের দেশে এর ব্যতিক্রম ঘটেছে এবং এখনও ঘটছে। শ্রীপুরুষোত্তম দাস ট্যাণ্ডন একাধারে উত্তর প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি এবং সেখানকার বিধান সভার অধ্যক্ষ ছিলেন। ১৯৫৫ সালে দিল্লীর বিধান সভার স্পীকার শ্রীগুরুমুখসিহাল সিং শ্রীব্রহ্মপ্রকাশের স্থানে সেখানকার মুখ্যমন্ত্রী পদে নিযুক্ত হলেন। ১৯৬২ সালে মহীশূরেও বিধান সভার অধ্যক্ষ শ্রীকান্তি এই পদ থেকে সরে এসে সেখানকার মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে নিযুক্ত হলেন। এই অবাঞ্ছিত ব্যবস্থার শীর্ষতম উদাহরণ পাওয়া যায় ১৯৬২ সালে লোকসভার অধ্যক্ষ (Speaker) শ্রীঅনন্তশায়নম্ আয়েঙ্গারের বিহারের গভর্ণর হিসেবে নিয়োগের ব্যাপারে। এই ব্যবস্থা স্পষ্টতই আইন সভার অধ্যক্ষের একান্ত প্রয়োজনীয় পদমর্যাদা ও সম্মানের ক্ষেত্রে কিছুটা অন্তরায় সৃষ্টি করবে। তাছাড়া, ভবিষ্যতের উচ্চ অভিলাষ পুরণ করতে গিয়ে বর্তমান অধ্যক্ষের যথার্থ নিরপেক্ষ ভূমিকা অবলম্বন করাও সম্ভব হবে না।

ভারতের আইন সভার অধিবেশনে স্পীকারের নির্দলীয় নিরপেক্ষ ভূমিকা অবলম্বনের আদর্শস্থানীয় উদাহরণ স্থাপন করেন শ্রী ভি. জে. প্যাটেল। তিনি ছিলেন স্বরাজ পার্টির সদস্য। ১৯১৯ সালের ভারতশাসন আইনে কেন্দ্রীয় আইন সভায় নিম্নতন কক্ষের স্পীকার নির্বাচিত হওয়ায় তিনি এই দলের সদস্যপদ ত্যাগ করে বলেছিলেন, "এই মুহূর্ত থেকে আমি কোন দলের সদস্য হতে বিরত থাকছি। আমি কোন দলের অন্তর্গত নই" ("From this moment I cease to be a party man. I belong to no party.")

দুঃখের বিষয়, বর্তমান ব্যবস্থা এই নীতিটিকে লঙ্ঘন করেছে বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে। অবশ্য স্পীকারের পদটিকে কেন্দ্র করে যে প্রথা ও রীতিনীতি গ্রেটব্রিটেনের ক্ষেত্রে গড়ে উঠেছে, সেগুলি সর্বতোভাবে আমাদের দেশেও গড়ে উঠা উচিত কিনা সেটিও একটি তর্কের বিষয়বস্তু। গ্রেটব্রিটেনে স্পীকার যে এলাকা থেকে নির্বাচন প্রার্থী হন, সেই এলাকায় অন্য কোন দল সাধারণতঃ কোন প্রার্থী দাঁড় করান না। গ্রেটব্রিটেন ছোট দেশ, তাই সেখানে এই ধরনের প্রথা গড়ে ওঠা সম্ভব হয়েছে এবং সেটি প্রশংসার্হ সন্দেহ নেই। কিন্তু আমাদের মত এক বিরাট দেশে লোকসভা এবং বিভিন্ন রাজ্যসভায় এই রীতি গড়ে উঠলে বহুসংখ্যক নাগরিককে তাদের পছন্দমত প্রার্থী নির্বাচিত করার অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে হয়। তবে স্পীকার নির্বাচিত হওয়ার পর তাঁর নির্দলীয় ভূমিকা এবং পরবর্তী কালে কোন উচ্চপদ গ্রহণ না করার সুস্থ নীতিটি অবশ্যই আমরা অনুকরণ করতে পারি। লোকসভার পরলোকগত অধ্যক্ষ শ্রীমাবলঙ্কর গ্রেটব্রিটেনের এই নীতি অনুসরণের প্রয়োজনীয়তাকে সমর্থন করে বলেন, "অধ্যক্ষেরা তাঁদের রাজনৈতিক দলের সদস্য থাকলেও তাঁদের উক্ত দলের সভায় যেখানে নানা বিষয় আলোচিত হয় সেখানে যোগদান করা উচিত নয়। যে সমস্ত বিষয় আইন সভায় আলোচিত হবার সম্ভাবনা আছে সেই সমস্ত বিতর্কমূলক আলোচনায় প্রকাশ্যে যোগদান করা উচিত নয়" (·· "Though speakers may continue to be members of their parties they should not attend party meetings where various matters are discussed, nor should they actively participate publicly in controversial matters that are likely to come up for discussion in the House")। তিনি আশা করেন, এই পন্থা অনুসরণ করলে হয়ত একদিন গ্রেটব্রিটেনে স্পীকারের অনুসৃত রীতিনীতিগুলি আমরাও অনুরূপ ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে সক্ষম হবো ("In course of time we shall be able to evolve from this a sound convention on the lines of the British speaker")।

পার্লামেণ্ট এবং এর সদস্যদের অধিকার ও অব্যাহতি (Privileges and Immunities of Parliament and its Memberr):

ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের অনুকরণে অনেক রাষ্ট্রেই আইন সভার সদস্যরা কিছু বিশেষ ক্ষমতা, অধিকার ও অব্যাহতি উপভোগ করে থাকেন।

আমাদের সংবিধানে ১০৫ অনুচ্ছেদে এই অধিকারগুলি লিপিবদ্ধ হয়েছে। রাজ্য আইনসভার এবং তার সদস্যদের অধিকারসমূহ ১৯৪ অনুচ্ছেদে বিবৃত হয়েছে। পার্লামেণ্ট সমষ্টিগতভাবে এবং তার সদস্যরা ব্যক্তিগতভাবে কতকগুলি অধিকার ভোগ করে। যেমন, পার্লামেণ্ট তার কোন আলোচনার বিষয়বস্তু প্রকাশে নিষিদ্ধ করতে পারে অথবা বিকৃত আকারে প্রকাশিত কোন বিষয়ের জন্য কোন সংবাদপত্রকে শাস্তি দিতে পারে। তাছাড়া, পার্লামেণ্টের অধিবেশনের সময় কোন সদস্য শৃংখলা ভংগ করলে তাকে শাস্তি দেবার অধিকারও পার্লামেণ্টের আছে।

১০৫ অনুচ্ছেদ (১) ধারায় পার্লামেণ্টের সদস্যদের বাক্-স্বাধীনতা স্বীকার করা হয়েছে। উক্ত অনুচ্ছেদের ২ ধারায় বলা হয়েছে যে, পার্লামেণ্টের সদস্যদের পার্লামেণ্টে অথবা কোন কমিটিতে বক্তৃতা অথবা ভোট দেওয়ার জন্য কোন আদালতে অভিযুক্ত করা চলবে না। এই অনুচ্ছেদের ৩ ধারায় বলা হয়েছে যে, পার্লামেণ্টের সদস্যদের অন্যান্য ক্ষমতা, অধিকার এবং অব্যাহতিগুলি (Powers, privileges and immunities) পার্লামেণ্টের দ্বারা সময় সময় আইন অনুসারে স্থির হবে এবং যতক্ষণ তা না হচ্ছে ততক্ষণ ঐগুলি এই সংবিধান চালু হওয়া কালীন ব্রিটিশ যুক্তরাজ্যের কমন্স সভার, তার সদস্যদের এবং কমিটিগুলির ক্ষমতা, অধিকার এবং অব্যাহতিগুলির অনুরূপ হবে।

১৯৬২ সালের আগস্ট মাসে পার্লামেণ্ট কর্তৃক ব্লিৎস (Blitz) পত্রিকার সম্পাদক শ্রীকরঞ্জিয়ার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের মধ্যে পার্লামেণ্টের সদস্যদের অধিকার রক্ষাসংক্রান্ত বিষয়ে একটি গুরুত্বপুর্ণ প্রশ্ন নিহিত আছে।

পার্লামেণ্টের সদস্য আচার্য কৃপালিনী, প্রতিরক্ষা মন্ত্রী কৃষ্ণমেননের বিরূপ সমালোচনার জন্য করঞ্জিয়া কৃপালিনীর বিরুদ্ধে ব্যাঙ্গোক্তি করে তার পত্রিকায় এক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। এই লেখায় পার্লামেণ্টের এক সদস্যের বিরুদ্ধে কুৎসা রচনা করে লোকসভা ও তার সদস্যদের অধিকার ভংগ করা হয়েছে বলে পার্লামেণ্ট করঞ্জিয়াকে অভিযুক্ত করে তাকে ভৎর্সনা (Reprimand) করেন।

আইন প্রণয়নের প্রণালী (Different stages in the passing of a Bill):

অর্থসংক্রান্ত বিল ছাড়া, অন্যান্য বিল পার্লামেণ্টের যে কোন কক্ষে উত্থাপিত হতে পারে। এই বিল কোন মন্ত্রীর দ্বারা অথবা পার্লামেণ্টের কোন সাধারণ সদস্যের দ্বারা উত্থাপিত হতে পারে। সাধারণ সদস্যের দ্বারা বিল

উত্থাপিত .হতে হলে স্পীকারের অনুমতি নিতে হয় এবং তার জন্য প্রয়োজনীয় নোটিশ দিতে হয়। এই অনুমতির পর বিলটি যতশীঘ্র সম্ভব সরকারী গেজেটে প্রকাশিত হয়। অবশ্য সরকারী বিলের জন্য অনুমতি চাওয়ার প্রয়োজন হয় না এবং সেক্ষেত্রে বিলটি উত্থাপিত হওয়ার আগেই সরকারী গেজেটে প্রকাশিত হয়।

বিলটি উত্থাপনের পর উত্থাপনকারী সদস্য নিম্নলিখিত যে কোন একটি প্রস্তাব পেশ করেন ঃ

(ক) বিলটি বিবেচনাব জন্য গ্রহণ করা হোক।

(খ) এটি কোন একটি সিলেক্ট কমিটিতে (Select Committee) প্রেরিত হোক।

(গ) অপর কক্ষের অনুমতিক্রমে যৌথ কমিটিতে (Joint Committee) প্রেরিত হোক।

(ঘ) জনমত গ্রহণের জন্য প্রচারিত হোক।

সাধারণতঃ অধিক বিতর্কমূলক আইনের ক্ষেত্রে জনমত গ্রহণের প্রস্তাব করা হয়। জনমত গ্রহণের সময় অতিক্রান্ত হলে প্রস্তাবকারী সদস্য পুনরায় বিলটিকে সিলেক্ট কমিটিতে প্রেরণের জন্য প্রস্তাব করতে পারেন। এই স্তরটিকে বিলের প্রথম পাঠেব (First Reading) স্তর বলা যেতে পারে। এই স্তরে সাধারণ ভাবে বিলের মূল নীতিটি সম্বন্ধে আলোচনা হতে পারে। বিশদ্‌ভাবে আলোচনা এই স্তরে হয় না। বিলটি সিলেক্ট কমিটিতে যাওয়ার প্রস্তাব পাস হওয়ার পব, সিলেক্ট কমিটি বিলটি বিবেচনার্থে গ্রহণ করেন। সিলেক্ট কমিটি বিলটির মূল ধারাসমূহ আলোচনা করে তা পার্লামেণ্টে পেশ করে।ঃএই স্তরটিকে কমিটি স্তর (Committee Stage) বলা যেতে পারে।

এর পরেই আসে দ্বিতীয় পাঠের (Second Reading) স্তর। সিলেক্ট কমিটি তার রিপোর্ট পেশ করার পর এই রিপোর্ট বিবেচনার জন্য গৃহীত হোক এই মর্মে আর একটি প্রস্তাব কবা হয়। এই প্রস্তাব পাস হওয়ার পর বিলটির ধারা—উপধারা, সংশোধন প্রস্তাব ইত্যাদি নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা হয়। এই স্তরে সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপনের সুযোগ আছে। তবে এই প্রস্তাব উত্থাপন করতে হলে অন্ততঃ একদিন আগে নোটিশ দিতে হয়।

এর পর বিলটির প্রস্তাবক বিলটির গ্রহণ করা হোক এই মর্মে প্রস্তাব করেন। এই প্রস্তাব পাস হওয়ার পর উক্ত কক্ষ কর্তৃক বিলটি পাস হয়েছে

বলে ধরে নেওয়া হয়। এই স্তরটিকে আমরা তৃতীয় স্তরের (Third Reading) সংগে তুলনা করতে পারি। এই বিভিন্ন স্তরের মাধ্যমে বিলটি পাস হওয়ার পরে সেটিকে অপর কক্ষে পাঠিয়ে দেওয়া হয় এবং এই কক্ষেও বিলটিকে পূর্বোক্ত স্তরগুলির মাধ্যমে অতিক্রান্ত হতে হয়। উক্ত অপর কক্ষ বিলটিকে পাস করতে সম্মত না হয়ে যদি সেটিকে প্রত্যাখান করে অথবা কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করে তাহলে রাষ্ট্রপতি ১০৮ অনুচ্ছেদ অনুসারে যুগ্ম অধিবেশন আহ্বান করেন। উক্ত অপর কক্ষ যদি বিলটি সম্বন্ধে কোন সংশোধনী প্রস্তাব গ্রহণ করে তাহলে বিলটি মূল কক্ষে (Originating House) ফিরে আসবে। মূল কক্ষ সংশোধনী প্রস্তাব গ্রহণ করলে সেটিকে রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য প্রেরিত হয়। যদি সংশোধনী প্রস্তাব সম্বন্ধে মূল কক্ষ সম্মত না হয় তাহলে রাষ্ট্রপতি ১০৮ অনুচ্ছেদ অনুসারে যুগ্ম অধিবেশন আহ্বান করেন। বিলটি সম্বন্ধে অপর কক্ষ যদি কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করে তাহলে ছ' মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পরে রাষ্ট্রপতি এই অনুচ্ছেদ অনুসারে যুগ্ম অধিবেশন ডাকতে পারেন।

এইভাবে বিলটি পাস হওয়ার পর সেটিকে রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য প্রেরণ করা হয়। রাষ্ট্রপতি সম্মতি না দিয়ে বিলটি পুনর্বিবেচনার জন্য ফেরৎ পাঠাতে পারেন। কিন্তু পার্লামেণ্টের উভয় কক্ষ যদি পুনরায় বিলটিকে মূল আকারে অথবা সংশোধিত আকারে পাস করে পুনরায় রাষ্ট্রপতির নিকট তার সম্মতির জন্য প্রেরণ করে তাহলে রাষ্ট্রপতি এই বিলটিতে সম্মতি দিতে বাধ্য থাকবেন।

অর্থসংক্রান্ত পদ্ধতি (Financial Procedure) :

প্রত্যেক আর্থিক বৎসরের প্রারম্ভে রাষ্ট্রপতি পার্লামেণ্টের উভয় কক্ষে একটি বার্ষিক অর্থবিষয়ক বিবরণ (Annual Financial Statement) উপস্থাপিত করান (cause to be laid)। অর্থমন্ত্রী এই বিবরণ পেশ করেন। এই বিবরণের মধ্যে সেই বৎসরের আনুমানিক আয় এবং ব্যয়ের বিবরণের উল্লেখ থাকবে। আনুমানিক ব্যয়ের বিবরণে (ক) একত্রীভূত তহবিলের উপর নির্ধারিত খরচার এবং (খ) অন্যান্য ব্যয়ের উল্লেখ থাকবে।

একত্রীভূত তহবিলের উপর নির্ধারিত খরচা বলতে রাষ্ট্রপতির বেতন ও ভাতা, রাজ্যসভার সভাপতি ও সহকারী সভাপতির বেতন ও ভাতা, লোকসভার স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকারের বেতন ও ভাতা, সুপ্রীমকোর্টের

বিচারপতিগণের বেতন ও ভাতা এবং পেন্সন, হাইকোর্ট ও ফেডারেল কোর্টের বিচারকগণের পেন্সন, কণ্ট্রোলার এবং অডিটর জেনারেলের বেতন, ভাতা পেন্সন, কেন্দ্রীয় সরকারের ঋণ পরিশোধ খাতে ব্যয়, সুপ্রীমকোর্ট ও পাবলিক সার্ভিস কমিশন পরিচালনা সংক্রান্ত ব্যয় প্রভৃতি খরচগুলি একত্রীভূত তহবিলের অন্তর্ভুক্ত। একত্রীভূত তহবিলের অন্তর্ভুক্ত খরচগুলির জন্য প্রতি বৎসর পার্লামেণ্টের অনুমোদন প্রয়োজন হয় না। পার্লামেণ্টের সদস্যরা এই খরচগুলির উপর আলোচনা করতে পারেন, কিন্তু ভোট দিতে পারেন না। অর্থাৎ এই খরচগুলি পার্লামেণ্টের ভোটের এক্তিয়ারের বাইরে।

একত্রীভূত তহবিলেব উপর নির্ধারিত খবচা

এই খরচগুলি ছাড়া, অন্যান্য যাবতীয় খরচা পার্লামেণ্টের অনুমোদন সাপেক্ষ। এই খরচগুলির আনুমানিক বিবরণ (estimates) লোকসভার কাছে তার মঞ্জুরীর জন্য দাবীর আকার (demand for grants) পেশ করতে হয়। সংবিধানের নিয়ম অনুসারে রাষ্ট্রপতির অনুমতি (recommendation) ব্যতিরেকে ব্যয়-বরাদ্দের মঞ্জুরীর জন্য কোন দাবী পেশ করা যায় না। তাছাড়া, এই ব্যয় সংক্রান্ত দাবী একমাত্র লোকসভাতেই পেশ করতে হবে—রাজ্যসভায় নয়। লোকসভায় এই ব্যয়-বরাদ্দের দাবী পেশ করার পর লোকসভা তাতে সম্মতি দিতে পারে, নাও দিতে পারে অথবা বরাদ্দ কমিয়ে দিতে পারে।

একত্রীভূত তহবিলের উপরে আরোপিত খবচ ছাড়া অন্যান্য যাবতীয় ব্যয

বরাদ্দ মঞ্জুর হওয়ার পর বিভিন্ন খাতে অনুমোদিত বরাদ্দ অনুসারে অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন বিল (Appropriation Bill) বলে একটি বিল লোকসভায় উত্থাপন করতে হয়। এই বিলের মধ্যে অনুমোদিত বরাদ্দ এবং একত্রীভূত তহবিলের উপর আরোপিত খরচা—এই উভয় প্রকার খরচার উল্লেখ থাকে। অ্যাপোপ্রিয়েশন বিল যথানির্দিষ্ট উপায়ে পার্লামেণ্ট কর্তৃক পাস হয়ে অ্যাপ্রোপ্রিয়শন আইনে (Appropriation Act) পরিণত হয়। এই আইনের দ্বারা বৈধকৃত (authorised) না হলে যে কোন খাতে খরচের জন্য—তা লোকসভা কর্তৃক মঞ্জুরীকৃত অর্থই হোক অথবা একত্রীভূত তহবিলের উপর আরোপিত খরচই হোক—কোন অর্থই একত্রীভূত তহবিল (Consolidated Fund) থেকে নির্গত করা চলবে না।

এইভাবে মঞ্জুরীকৃত অর্থ ছাড়া, রাষ্ট্রপতি লোকসভায় অতিরিক্ত মঞ্জুরীর দাবী পেশ করাতে পারেন। স্বাভাবিকভাবে মঞ্জুরীকৃত অর্থ ছাড়া, ক্ষেত্রবিশেষে

অধিক অর্থের প্রয়োজন হলে, রাষ্ট্রপতি লোকসভায় অতিরিক্ত মঞ্জুরীর জন্য দাবী পেশ করাতে পারেন।

একত্রীভুত তহবিল, রাষ্ট্রীয় হিসাব এবং আকস্মিক তহবিল (Consolidated Fund, Public Account and Contingency Fund): ভারত সরকার যে সমস্ত অর্থ পায় তা জমা থাকে একত্রীভূত তহবিলে (Consolidated Fund) অথবা রাষ্ট্রীয় হিসেবে (Public Account)।

একত্রীভূত তহবিল (Consolidated Fund) শব্দটি গ্রেটব্রিটেনের সংবিধান থেকে নেওয়া হয়েছে। ["All revenue, proceeds of loans and other public receipts (with certain restricted exceptions) will have to be paid to this consolidated Fund (originally created by an act of 1787) Encyclopædia Britannica, Vol VIII."]

সঞ্চিত তহবিল থেকে যে অর্থ ব্যয় হয় স্বভাবতই তা পার্লামেণ্টের অনুমোদন স্বাপেক্ষ। এই নীতি স্পষ্টতই গণতান্ত্রিক নীতিসম্মত। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারকে এমন কতকগুলি খরচ সঞ্চিত তহবিল থেকে ব্যয় করতে হয় যেগুলির জন্য প্রতি বৎসর পার্লামেণ্টের অনুমোদন নিতে হয় না। এগুলিকে আমরা পার্লামেণ্টের ভোটের এক্তিয়ারের বাইরের খরচা বলতে পারি (Non-votable items of Expenditures)। সংবিধানের ভাষায় এগুলিকে একত্রীভুত তহবিলের উপর নির্বাচিত খরচা (Expenditure charged on the consolidated Fund) বলা হয়। রাষ্ট্রপতির বেতন ও ভাতা ; রাজ্যসভার সভাপতি (অর্থাৎ উপরাষ্ট্রপতির) ও সহকারী সভাপতির বেতন ও ভাতা; লোকসভার স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকারের বেতন ও ভাতা ; সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিগণের বেতন, ভাতা এবং পেন্সন ; হাইকোর্ট এবং ফেডারেল কোর্টের বিচারপতিগণের পেন্সন ; কণ্ট্রোলার এবং অডিটর জেনারেলের বেতন, ভাতা এবং পেন্সন ; সরকারী ঋণের উপর সুদ অথবা শোধ ; সুপ্রীম কোর্ট পরিচালনা সংক্রান্ত এবং পাবলিক সার্ভিস কমিশন সংক্রান্ত ব্যয় এবং পুর্বের সমস্ত রাজ্যগুলির নৃপতিবর্গকে প্রতিশ্রুত বরাদ্দ—এইগুলিকে একত্রীভূত তহবিলের উপর নির্ধারিত খরচা (Expenditers charged on this consolidated Fund) বলা হয়েছে। এই খরচগুলি ছাড়া, অন্য যেকোন খরচ যা সংবিধান বা পার্লামেণ্ট এই জাতীয় খরচা বলে ঘোষণা করবে সেগুলিকেও এই একত্রীভূত তহবিলের উপর নির্বাচিত খরচা বলে গণ্য করা হবে।

পার্লামেন্টের বাৎসরিক ভোটের এক্তিয়ারের বাইরে এই খরচাগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের সামগ্রিক খরচার একটি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। প্রশাসনিক পদমর্যাদা এবং নিরপেক্ষতার প্রয়োজনীয়তায় এই খরচাগুলিকে প্রতি বৎসর পার্লামেন্টের অনুমোদনেব বহির্ভূত রাখার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

সঞ্চিত তহবিলের টাকা ভারত সরকারের নিজস্ব। এই অর্থ ছাড়া সরকারকে অনেক সময় অপরের টাকা গচ্ছিত রাখতে হয়। সংবিধানেব ২৬৬ অনুচ্ছেদে এই তহবিলের উল্লেখ আছে। কেন্দ্রীয় বিষয়ে সরকারী কর্মচারীদের প্রাপ্ত অর্থ, আদালত কর্তৃক গৃহীত আদালতের টাকা, সেভিংস্ ব্যাঙ্কের টাকা ইত্যাদি (Public Account) এতে জমা থাকে।

Publi Account

সংবিধানের ২৬৭ অনুচ্ছেদ অনুসারে পার্লামেন্ট অথবা রাজ্যের আইনসভা আকস্মিক তহবিল (Contingency Fund) গঠন করতে পারে। বাড়তি অথবা অতিরিক্ত অর্থ বৈধকৃত হওয়ার আগে অনেক সময় অতিরিক্ত অর্থ প্রয়োজন হতে পারে। এই অর্থ আকস্মিক তহবিল অথবা Contingency Fund এর অন্তর্গত। এই তহবিল অবশ্য কেন্দ্র অথবা রাজ্যের ক্ষেত্রে তাদের নিজ নিজ আইনসভায় অনুমোদন সাপেক্ষ।

পার্লামেণ্ট কিভাবে আয়-ব্যয়ের উপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখে (How the Parliament exercises Control over money matters):

পার্লামেন্ট কিভাবে আয়-ব্যায়ের উপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখে এই প্রশ্নটি আলোচনা করতে হলে প্রথমেই আমাদের উল্লেখ করতে হয় যে, পার্লামেন্টের অনুমোদন ব্যতিরেকে সরকার আয়-ব্যয় সংক্রান্ত ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্তই গ্রহণ করতে পারে না। ২৬৫ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, পার্লামেন্টের অনুমোদন ব্যতিরেকে সরকার কোন কর আরোপ করতে পারে না (No tax shall be levied or collected except by authority of law)। ব্যয়ের ক্ষেত্রেও অনুরূপ ভাবে পার্লামেন্টের কর্তৃত্বকে কার্যকরী করা হয়েছে। ভারত সরকারের প্রাপ্ত সমুদয় অর্থ সঞ্চিত তহবিলে (Consolidated Fund) জমা রাখতে হয়। ভারত সরকার কর্তৃক গৃহীত ঋণ এবং রাজস্ব ইত্যাদি নিয়ে এই সঞ্চিত তহবিল। সংবিধানের ২৬৬ (৩) অনুচ্ছেদে

বলা হয়েছে যে আইনের ক্ষমতা ব্যতিরেকে কোন অর্থ সঞ্চিত তহবিল থেকে ব্যয় করা চলবে না (No moneys out of the Consolidated Fund of India or the Consolidated Fund of a State shall be appropriated except in accordance with law and for the purposes and in the manner provided in this constitution)। সংবিধানের ২১৪ অনুচ্ছেদে পার্লামেণ্টকে এতদ্দুদ্দেশ্যে আইন প্রণয়ণের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। পার্লামেণ্টের এই আইনকে *Appropriation Act* বলা হয়। একমাত্র এই আইনের ক্ষমতা বলেই সঞ্চিত তহবিলের অর্থ—তা পার্লামেণ্ট কর্তৃক মঞ্জুরীকৃত অর্থই হোক বা সঞ্চিত তহবিলের উপর আরোপিত খরচাই হোক—ব্যয় করা চলবে। এই প্রসংগে উল্লেখযোগ্য যে পার্লামেণ্টের এই নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতাকে কেন্দ্রীভূত করার প্রয়োজনীয়তায় এবং সরকারের পরিকল্পনা অনুসারে আয়-ব্যয় নিয়ন্ত্রিত হওয়ার প্রয়োজনীয়তায় পার্লামেণ্টের প্রতি দায়িত্বশীল মন্ত্রীসভার নিয়ন্ত্রণাধীনে পার্লামেণ্ট এই কাজগুলি সম্পাদিত করে থাকে। সংবিধানের নিয়মানুসারে রাষ্ট্রপতির অনুমোদন ব্যতিরেকে লোকসভায় কোন অর্থ-সংক্রান্ত বিল উপস্থাপিত করা যায় না। স্পষ্টতই লোকসভার সাধারণ সদস্যেরা সাধারণতঃ এই সুযোগ থেকে বঞ্চিত। তাছাড়া, এই নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা জাতির প্রতিনিধি স্থানীয় সংস্থা হিসেবে লোকসভার উপরই বর্তিয়েছে। রাজ্যসভার আয়-ব্যয় সংক্রান্ত ব্যাপারে বিশেষ কোন ক্ষমতা নেই। রাজ্যসভাকে আয়-ব্যয় সংক্রান্ত ক্ষমতার ব্যাপারে কেবলমাত্র অভিমত জানানর ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে এবং সেই অভিমতও তাকে ১৪ দিনের মধ্যে জানাতে হবে। তাছাড়া, লোকসভা এই অভিমত গ্রহণ করতে বাধ্য নয়।

পার্লামেণ্ট কর্তৃক নির্দিষ্ট আইন অনুসারে ব্যয়বরাদ্দ যথাযথ ভাবে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে কিনা দেখার জন্য সংবিধানের ১৪৮ অনুচ্ছেদে নিয়ন্ত্রক এবং মহাগণনা পরীক্ষক (Comptroller and Auditor-General) পদটি সৃষ্টি করা হয়েছে। তাঁর প্রধান কর্তব্য হচ্ছে, সরকারের আয়-ব্যয় সংক্রান্ত সমুদয় হিসেব পরীক্ষা করে রাষ্ট্রপতির নিকট সেই সম্বন্ধে তাঁর বিবরণ পেশ করা। অতঃপর রাষ্ট্রপতি সেই বিবরণ পার্লামেণ্টের নিকট পেশ করেন। নিয়ন্ত্রক এবং মহা-গণনা পরীক্ষকের বিবরণ বিশদ্‌ভাবে পরীক্ষা করার জন্য পাবলিক অ্যাকাউণ্টস কমিটি (Public Accounts Committee) বলে একটি কমিটি নিযুক্ত হয়। পার্লামেণ্টের উভয় কক্ষের সদস্যদের নিয়ে এই কমিটি গঠিত হয়। পাবলিক অ্যাকাউণ্টস

কমিটিকে তাঁর বিবরণ পার্লামেণ্টে পেশ করতে হয়—যার ফলে ব্যয়ের ক্ষেত্রে কোন অনিয়ম বা ক্রুটি-বিচ্যুতি দেখলে পার্লামেণ্ট তার প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারে।

পার্লামেণ্টের কমিটিসমূহ (Committees of Parliament):

আধুনিক রাষ্ট্রে কাজের সংখ্যা দিন দিন বেড়ে চলেছে। সম্পূর্ণ সমাজতান্ত্রিক আদর্শ গ্রহণ না করলেও, সকল রাষ্ট্রেই আজ নাগরিক জীবনের বিভিন্ন দিক রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত। এমত অবস্থায় আইনসভার কাজের পরিধি বৃদ্ধি পাওয়াই স্বাভাবিক। তাছাড়া, প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে আইন সভার প্রতিনিধি প্রেরণের গণতান্ত্রিক নীতি গৃহীত হওয়ার ফলে প্রত্যেক দেশেই আজকাল আইনসভার সদস্য সংখ্যাও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে। এরূপ অবস্থায় কোন দেশের আইনসভার পক্ষে প্রত্যেক বিলের বিভিন্ন দিক বিস্তৃতভাবে আলোচনা করে তাকে আইনে রূপ দেওয়া সম্ভব হয় না। তাই আইনসভার উত্থাপিত বিলগুলি বিশদ্‌ভাবে পরীক্ষা করে সে সম্বন্ধে তাদের অভিমত আইনসভায় পেশ করার জন্য কতকগুলি কমিটি তৈরী করা হয়। স্বল্পসংখ্যক সদস্য নিয়ে এক একটি বিশেষ বিলের উপর আলোচনার জন্য সৃষ্ট এই কমিটিগুলির পক্ষে কোন বিলের বিভিন্ন দিক পরীক্ষা ও বিশ্লেষণ ক'রে তার উপর চিন্তিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হয়। এই কমিটি আইনসভায় তার বিবরণ পেশ করলে স্বভাবতই আইনসভার কাজ সহজতর হয়।

পার্লামেণ্টের প্রত্যেক কক্ষের কতকগুলি অ্যাড্‌হক কমিটি (Adhoc Committee) এবং কতকগুলি স্ট্যাণ্ডিং কমিটি (Standing Committee) আছে। অ্যাডহক অর্থাৎ অস্থায়ী কমিটিগুলিকে সিলেক্ট কমিটি (Select Committee) বলা হয় এবং তারা কোন একটি বিশেষ বিল সম্বন্ধে আলোচনা ও পরীক্ষা করার জন্য গঠিত হয়। উক্ত বিল সম্বন্ধে বিবরণ দাখিল করার পর এই কমিটির আর অস্তিত্ব থাকে না। স্ট্যাণ্ডিং কমিটিগুলি স্থায়ী কমিটি। লোকসভার স্ট্যাণ্ডিং কমিটিগুলি হচ্ছে: পাবলিক অ্যাকাউণ্টস্ কমিটি (Public Accounts Committee), এষ্টিমেটস্ কমিটি (Estimates Committee), বিজিনেস্ অ্যাড্‌ভাইসরী কমিটি (Business Advisory

Committee), কমিটি অব্ প্রিভিলেজেস্ (Committee of Privileges), রুলস কমিটি (Rules Committee), কমিটিস্ অন্ পিটিসন্স্ (Committees on Petitions), বেসরকারী সদস্যদের বিল সম্বন্ধে কমিটি (Committee on Private Members' Bills or Resolutions), সরকারের প্রতিশ্রুতি পালন বিবেচনার জন্য কমিটি (Committee on Government Assurances) এবং অধঃস্তন পর্যায়ে আইন সৃষ্টির জন্য কমিটি (Committee on Subordinate Legislation)।

পাবলিক অ্যাকাউণ্টস্ কমিটির (Public Accounts Committee) মোট সদস্য সংখ্যা ২২ জন। এই সদস্যের মধ্যে ১৫ জন লোকসভার সদস্যদের দ্বারা সমানুপাতিক নির্বাচন পদ্ধতির ভিত্তিতে একক হস্তান্তরযোগ্য ভোটের দ্বারা নির্বাচিত হন। বাকী ৭ জন সদস্য একই পদ্ধতিতে রাজ্যসভার সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত হন। ভারত সরকারের যাবতীয় খরচ লোকসভার মঞ্জুরী অনুসারে ঠিক ভাবে ব্যয় হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করাই হচ্ছে এই কমিটির প্রধান কাজ। এ ছাড়া, ভারত সরকারের অন্যান্য ব্যয়-সংক্রান্ত যে কোন হিসেব এই কমিটি পরীক্ষা করতে পারেন। এই কমিটি স্বভাবতই ভারতের অডিটর জেনারেলের দেয় রিপোর্টের ভিত্তিতে হিসেব পরীক্ষার কাজ নির্বাহ করেন।

এস্টিমেটস্ কমিটির (Estimates Committee) সদস্য সংখ্যা ৩০ জন। এই সদস্যরা লোকসভা কর্তৃক সমানুপাতিক নির্বাচনের ভিত্তিতে একক হস্তান্তর-যোগ্য ভোটের দ্বারা নির্বাচিত হন। সরকারের বিভিন্ন বিভাগের খরচের আনুমানিক দাবী (Estimate) লোকসভায় পেশ করার পর, এই কমিটি দাবীগুলি পরীক্ষা করে দেখে খরচ কমান সম্ভব কিনা বা বিভাগীয় প্রশাসনিক রদবদল সম্ভব কিনা—এই সমস্ত বিষয়ে তাদের মতামত পেশ করেন। অবশ্য এই কাজ করতে গিয়ে এই কমিটিকে সরকারের নির্ধারিত নীতির পরিপ্রেক্ষিতেই এই কাজ করতে হয়। অবশ্য প্রয়োজনবোধে সরকারের নীতি সম্বন্ধে এই কমিটির সদস্যরা তাঁদের অভিমত জানাতে পারেন। এই প্রসংগে উল্লেখ করতে হয় যে সরকারের প্রত্যেক বিভাগের ব্যয়ের দাবী এই কমিটি কর্তৃক পরীক্ষা করা সম্ভব নয়। তাই প্রত্যেক বৎসর কয়েকটিমাত্র বিভাগের দাবী সম্বন্ধে পরীক্ষা করে সে সম্বন্ধে তাঁদের বিবরণ তাঁরা পেশ করেন।

সরকারের তরফ থেকে যে সমস্ত বিল উত্থাপিত হয় সেগুলি এবং আইনসভার অন্যান্য কার্যাদি সম্বন্ধে নিয়মকানুন, (যেমন, আলোচনার সময়, বিলের পর্যায় ইত্যাদি স্থির করা) **বিজিনেস অ্যাড্‌ভাইসারী কমিটির** (Business Advisory Committee) কাজ। ১৫ জন সদস্য নিয়ে গঠিত এই কমিটির সভাপতি লোকসভার সভাপতি স্বয়ং।

কমিটি অব্ প্রিভিলেজেস্ (Committee of Privileges)-এর কাজ হল পার্লামেণ্টের বিশেষ অধিকার সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় বিবেচনা করা। পার্লামেণ্টের সদস্যদের বিরুদ্ধে ব্যঙ্গোক্তি করা এবং পার্লামেণ্টের নির্দেশ অনুসারে তার কার্যক্রমের অংশবিশেষকে বাদ না দিয়ে তা সংবাদপত্রে প্রকাশ করা ইত্যাদির সংখ্যা বেড়ে যাওয়ার জন্য বর্তমানে পার্লামেণ্টের সদস্যদের অধিকার সংক্রান্ত বিষয় বিবেচনার জন্য এই কমিটির গুরুত্ব বেড়ে গিয়েছে। প্রসংগক্রমে উল্লেখযোগ্য যে, পার্লামেণ্ট এখন পর্যন্ত পার্লামেণ্টের সদস্যদের অধিকার সম্বন্ধে কোন আইন প্রণয়ন করেনি এবং তা না করা পর্যন্ত গ্রেটব্রিটেনের কমন্স-সভার অধিকারের অনুরূপ অধিকার আমাদের পার্লামেণ্টের সদস্যরা উপভোগ করবেন বলে আমাদের সংবিধানে উল্লেখ আছে।

সংসদের কার্যপদ্ধতি (Rules of Procedure) আলোচনার জন্য কমিটির নাম **রুলস্ কমিটি** (Rules Committee)। স্পীকার স্বয়ং এই কমিটির সভাপতি।

কোন বিষয়ে আইন তৈরী করার জন্য বা আইনের পরিবর্তন সাধন করার জন্য জনসাধারণ পার্লামেণ্টের কাছে আবেদন জানাতে পারে। এই আবেদন বিচার করার জন্য ১৫ জন সদস্য সংবলিত একটি **কমিটি অন্ পিটিশনস্** (Committee on Petetions) আছে।

লোকসভার বেসরকারী সদস্যরা যে সমস্ত বিল অথবা প্রস্তাব উত্থাপন করেন তা বিবেচনা এবং তৎসংক্রান্ত নিয়ম নির্ধারণের জন্য যে কমিটি আছে তাকে **বেসরকারী সদস্যদের বিল সম্বন্ধে কমিটি** (Committee on Private Members' Bills) বলা হয়।

সরকারের দেয় প্রতিশ্রুতি কতদূর প্রতিপালিত হচ্ছে তা পরীক্ষা করার জন্য **সরকারের প্রতিশ্রুতি পালন বিবেচনার জন্য কমিটি** (Committee on Government Assurance) বলে একটি কমিটি আছে। এই ধরণের

একটি কমিটি থাকায় সরকারকে তার লোকসভায় দেয় প্রতিশ্রুতি সম্বন্ধে যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়।

পার্লামেণ্ট কর্তৃক আইনের বিস্তৃত বিধান রচনা করা সম্ভব না হওয়ায়, প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষকে অনেক সময় আইনসভা কর্তৃক প্রণীত আইনের পরিপ্রেক্ষিতে নিয়মকানুন তৈরী করার ক্ষমতা দেওয়া হয়। এই ক্ষমতা ঠিকভাবে প্রযুক্ত হচ্ছে কিনা তা বিবেচনা করার জন্য যে কমিটি তৈরী হয় তাকে **অধঃস্তন পর্যায়ের আইন প্রণয়নের কমিটি** (Committee on Subordinate Legislation) বলা হয়।

হিসেব-নিকেশ সম্বন্ধে বিবেচনা করার জন্য রাজ্যসভার নিজস্ব কোন কমিটি নেই। রাজ্যসভার নিজস্ব চারটি স্থায়ী কমিটি আছে। এই কমিটিগুলির মধ্যে—**হাউস কমিটি** (House Committee)-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই কমিটি রাজ্যসভার সদস্যদের বাসস্থান সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনার জন্য সৃষ্টি হয়েছে। এই সভার অন্যান্য কমিটিগুলি লোকসভার কমিটিগুলির অনুরূপ।

অনেক সময় আইন প্রণয়ন ছাড়া, কতকগুলি বিশেষ বিষয় আলোচনার জন্য পার্লামেণ্টের উভয় কক্ষের সম্মিলিত কমিটি গঠন করা হয়। ভাষা কমিশনের রিপোর্ট বিবেচনার জন্য এই জাতীয় একটি কমিটি সৃষ্টি হয়েছিল। তাছাড়া, পার্লামেণ্টের সদস্যদের বেতন, ভাতা ইত্যাদি আলোচনার জন্য এবং আরও কয়েকটি বিষয় আলোচনার জন্য পার্লামেণ্টের উভয় কক্ষের কয়েকটি স্থায়ী সম্মিলিত কমিটিও আছে।

অ্যাটর্নি জেনারেল (Attorney-General for India):

সংবিধানের ৭৬ অনুচ্ছেদে একজন অ্যাটর্নি জেনারেলের কথা বলা হয়েছে। তিনি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হবেন এবং তাঁর সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি হওয়ার যোগত্য থাকা দরকার। রাষ্ট্রপতি যে সমস্ত আইনঘটিত ব্যাপারে তাঁর পরামর্শ চাইবেন সেই সমস্ত ক্ষেত্রে ভারত সরকারকে পরামর্শ দেওয়াই তাঁর কাজ। ভারত সরকারের পক্ষে সুপ্রীম কোর্টে উপস্থিত হওয়া তাঁর অন্যতম কাজ। তাছাড়া সংবিধান এবং আইনের দ্বারা তাঁর যে সমস্ত কর্তব্য নির্দেশিত হয়েছে সেগুলি পালন করা তাঁর অন্যতম কর্তব্য। রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নির্ধারিত বেতন তাঁর বেতন বলে গণ্য হবে। রাষ্ট্রপতির প্রীতিভাজন থাকা কালীন স্বপদে তিনি থাকেন। সম্প্রতি আইনমন্ত্রীকেই অ্যাটর্নি জেনারেল হিসেবে নিয়োগ করার একটি প্রস্তাব উঠেছিল, তবে বর্তমানে এই প্রস্তাবটি পরিত্যক্ত হয়েছে।

ভারতের নিয়ন্ত্রক এবং মহাগণনা পরীক্ষক (Comptroller and Auditor-General) ঃ

সংবিধানের ১৪৮ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, ভারতের একটি নিয়ন্ত্রক এবং মহাগণনা পরীক্ষক (Comptroller and Auditor-General) থাকবে। তিনি রাষ্ট্রপতির নিজস্ব সিল এবং সহিযুক্ত নিয়োগপত্রে (warrant under his hand and Seal) নিযুক্ত হবেন এবং সুপ্রীম কোর্টের বিচারকগণকে যে অপরাধ এবং যে পদ্ধতিতে অপসারিত করা যায় কেবলমাত্র সেই পদ্ধতিতে তাঁকে অপসারিত করা চলবে।

নিয়ন্ত্রক এবং মহাগণনা পরীক্ষকের বেতন ও চাকুরীর অন্যান্য শর্তাবলী পার্লামেণ্ট কর্তৃক আইনের দ্বারা নির্দিষ্ট হবে বলে বলা হয়েছে এবং যতক্ষণ তা না হচ্ছে ততদিন সংবিধানের দ্বিতীয় সিডিউলে বর্ণিত নিয়মানুসারে তা নির্ধারিত হবে। দ্বিতীয় সিডিউলের *Part E* অংশে বলা হয়েছে যে তিনি মাসে চার হাজার টাকা বেতন পাবেন। তাঁর ছুটি, বেতন এবং পেন্সন ইত্যাদির ব্যাপারে বর্তমান সংবিধান চালু হওয়ার আগে অডিটর জেনারেল (Auditor-General) যে অধিকার ভোগ করতেন সেইগুলি তিনিও ভোগ করবেন। তাঁর নিয়োগের পর তাঁর বেতন, ছুটি, পেন্সন এবং অবসর গ্রহণের সময় ইত্যাদি—তাঁর অসুবিধা সৃষ্টি করে পরিবর্তন করা চলবে না।

১৪৯ অনুচ্ছেদ অনুসারে কেন্দ্র এবং অংগরাজ্যগুলির হিসেব সংক্রান্ত ব্যাপারে নিয়ন্ত্রক এবং মহাগণনা পরীক্ষকের কর্তব্য পার্লামেণ্ট কর্তৃক আইন অনুসারে নির্ধারিত হবে এবং যতদিন তা না হচ্ছে ততদিন বর্তমান সংবিধান চালু হওয়ার আগে ভারতের অডিটর জেনারেল (Auditor-General of India) ভারত ডোমিনিয়ন এবং প্রদেশের হিসেব সংক্রান্ত ব্যাপারে যে কর্তব্য পালন করত সেইগুলি তাঁরও কর্তব্য বলে বিবেচিত হবে। সরকারের বিভিন্ন খরচা পার্লামেণ্টের দ্বারা মঞ্জুর হয়ে Appropriation Actএ রূপান্তরিত হয়। এই মঞ্জুরী অনুসারে বিভিন্ন বিভাগের খরচা পরিচালিত হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করাই নিয়ন্ত্রক ও মহাগণনা পরীক্ষকের প্রধান কর্তব্য। নিয়ন্ত্রক ও মহাগণনা পরীক্ষকের কেন্দ্রের ব্যয় সংক্রান্ত বিবরণ রাষ্ট্রপতির কাছে উপস্থাপিত হবে এবং রাষ্ট্রপতি তা পার্লামেণ্টের উভয় কক্ষের সম্মুখে উপস্থাপিত করবেন। অনুরূপভাবে রাজ্যের ব্যয় সংক্রান্ত বিবরণ রাজ্যপালের কাছে উপস্থাপিত হলে তিনি রাজ্যের আইন সভার সম্মুখে তা উপস্থাপিত করবেন।

নিয়ন্ত্রক ও মহাগণনা পরীক্ষকের বিবরণের ভিত্তিতে পার্লামেণ্টে Public Account Committee খরচের হিসেব পরীক্ষা করে পার্লামেণ্টের নিকট তার বিবরণ উপস্থাপিত করবে।

পার্লামেণ্টের সার্বভৌমিকতা (Sovereignty of Parliament) ঃ

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায়, সকল আইনসভাকে সংবিধানের নির্দেশমত তাদের কাজ করতে হয়। সংবিধান কেন্দ্রীয় ও অংগরাজ্যগুলির মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন করে দেয়। এই বণ্টিত ক্ষমতার মধ্যেই কেন্দ্রীয় এবং অংগরাজ্যগুলির আইনসভাগুলিকে তাদের আইনপ্রণয়ন সীমিত রাখতে হয়। সংবিধান বহির্ভূত কোন বিষয়ের উপর আইন প্রণয়ন করলেই রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ বিচারালয় তাকে অবৈধ বলে ঘোষণা করবে এবং সেই আইন বাতিল হয়ে যাবে। তাই যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় বিচার বিভাগের স্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রকৃতপক্ষে এই শাসনব্যবস্থায় বিচার বিভাগ যে ক্ষমতা ভোগ করে এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থায় বিচারবিভাগ ততটা ক্ষমতা ভোগ করতে পায় না। গ্রেটব্রিটেনের পার্লামেণ্টই সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। তার প্রণীত সব আইনই বৈধ, কোন বিচারালয়ের তাকে অবৈধ ঘোষণা করার ক্ষমতা নেই। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় বিচারালয়ের এই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা লক্ষ্য করে অনেকে এই শাসনব্যবস্থায় বিচার বিভাগকেই সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী বলে মনে করেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিচার বিভাগ কংগ্রেস অথবা অংগরাজ্যগুলির প্রণীত যে কোন আইনকে সংবিধান বহির্ভূত বলে মনে করলে তাকে অবৈধ বলে ঘোষণা করতে পারে। এদিক থেকে বিচার করলে এখানকার বিচারবিভাগ সংবিধানের ব্যাখ্যাতা হিসেবে সমগ্র শাসনব্যবস্থায় যে গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকে, গ্রেটব্রিটেনের মত এককেন্দ্রিক এবং পার্লামেণ্ট চালিত শাসনব্যবস্থায় বিচারবিভাগ সে সুযোগ থেকে বঞ্চিত।

ভারতের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এই যে, এখানে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়া সত্ত্বেও এখানকার বিচারবিভাগ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিচারবিভাগের মত এতটা ক্ষমতা ভোগ করতে পায় না। এখানে পার্লামেণ্টই অধিক ক্ষমতার অধিকারী। অবশ্য গ্রেটব্রিটেনের পার্লামেণ্ট যে অর্থে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী আমাদের পার্লামেণ্ট সেই অর্থে সার্বভৌম নয়। আমাদের

শাসনব্যবস্থা যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা। সংবিধানের দ্বারা কেন্দ্র ও অংগরাজ্যগুলির মধ্যে ক্ষমতার বণ্টনই এই শাসনব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য। সুতরাং সংবিধান প্রদত্ত বিষয়গুলির মধ্যেই আমাদের পার্লামেণ্টকেও তার আইন প্রণয়নের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। সংবিধানবিরোধী কোন বিষয় অথবা অংগরাজ্যগুলির এক্তিয়ারভুক্ত কোন বিষয়ের উপর আইন প্রণয়ন করলেই বিচারবিভাগ তাকে অবৈধ বলে ঘোষণা করবে এবং সেই ক্ষেত্রে ঐ আইন স্পষ্টতই বাতিল হয়ে যাবে। এই দিক থেকে বিচার করলে ভারতীয় পার্লামেণ্টকে কোনক্রমেই গ্রেটব্রিটেনের পার্লামেণ্টের মত সর্বভৌম ক্ষমতাসম্পন্ন বলা যেতে পারে না এবং অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার মত এখানকার বিচারবিভাগের উচ্চতর ক্ষমতা অনস্বীকার্য। তবে লক্ষণীয় বিষয় এই যে, এখানকার উচ্চতম বিচারালয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উচ্চতম বিচারালয়ের মত ততটা ক্ষমতাসম্পন্ন নয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উচ্চতম বিচারালয় কংগ্রেস প্রণীত যে কোন আইন বা তার অনুসৃত যে কোন নীতিকে সংবিধান বর্হিভূত বলে অবৈধ ঘোষণা করতে পারে। সংবিধানের সংক্ষিপ্ততা, অস্পষ্ট বিধানাবলী এবং সর্বোপরি আইনের যাথার্থ নির্ণয়ের অপ্রতিহত ক্ষমতা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান বিচারালয়কে সমগ্র শাসনব্যবস্থার উর্ধ্বে এক চূড়ান্ত সর্বময়ত্বে প্রতিষ্ঠিত করেছে। অপরপক্ষে, ভারতের সংবিধান সুবিস্তৃত, সংবিধানে উল্লেখিত বিধানগুলিতে অস্পষ্টতার অবকাশও কম। ফলে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের পার্লামেণ্ট মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসের মত আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে নিঃসহায় ও দুর্বল নয়। স্বকীয় ক্ষমতার স্বরূপ ও পরিধিতে আস্থাবান হয়ে সে যে আইন প্রণয়ন করে সর্বোচ্চ বিচারালয় তাকে সংবিধান বর্হিভূত বলে ঘোষণা করার সুযোগ কম পায়। সুতরাং স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছে, ভারতীয় পার্লামেণ্ট গ্রেটব্রিটেনের পার্লামেণ্টের মত সর্বশক্তিমান না হলেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসের মত সর্বতোভাবে বিচারবিভাগীয় প্রসন্নতার উপর নির্ভরশীল নয়।

দশম অধ্যায়

সুপ্রীম কোর্ট

(Supreme Court)

ভারতের বিচারব্যবস্থার শীর্ষস্থানে অবস্থিত সুপ্রীম কোর্ট। সংবিধানের নিয়ম অনুসারে প্রধান বিচারপতি ও অন্যান্য সাতজন বিচাবপতি নিয়ে এই কোর্ট গঠিত হবে। কিন্তু পার্লামেন্টকে আইনের সাহায্যে বিচারপতির সংখ্যা বাডাবার ক্ষমতা দেওয়ায় ১৯৫৬ সালে অন্যান্য বিচারপতির সংখ্যা বাড়িয়ে ১০ জন করা হয়। ১৯৬০ সালে আর একটি আইনের দ্বারা বিচারপতিদের সংখ্যা আরও বাড়িয়ে ১৩ জন করা হয়।

গঠন

সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি হতে হলে কোন ব্যক্তিকে ভারতীয় নাগরিক হতে হবে। তাছাড়া, তাঁকে কোন হাইকোর্টে পাঁচ বৎসর বিচারপতি পদে নিযুক্ত থাকতে হবে, অথবা এক বা একাধিক উচ্চ আদালতে দশ বৎসরের জন্য ওকালতী করতে হবে অথবা রাষ্ট্রপতির মতে একজন উচ্চস্তরেব আইনজ্ঞ হতে হবে।

যোগ্যতা ও গুণাবলী

সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি নিয়োগের সময় রাষ্ট্রপতিকে সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতির পরামর্শ নিতে হয়। তাছাড়া, তিনি সুপ্রীম কোর্টের এবং হাইকোর্টেব অন্যান্য বিচাবপতিদের পরামর্শও গ্রহণ করতে পারেন। সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতির মাসিক বেতন পাঁচ হাজার টাকা। সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিরা ৬৫ বৎসর বয়সে অবসর গ্রহণ করেন।

নিয়োগ

সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিদের অপসারিত করার জন্য পার্লামেন্টের উভয় কক্ষের সদস্যদের সংখ্যাধিক্যে গৃহীত প্রস্তাব দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য সংখ্যার ভোটাধিক্যে পাস হওয়া প্রয়োজন এবং তা রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সমর্থিত হতে হবে।

অপসারণ

সুপ্রীম কোর্টের ক্ষমতা (Powers of Supreme Court) ঃ

সুপ্রীমকোর্টের এলাকাকে তিন ভাগে ভাগ করা যেতে পারে , যথা, (১) মূল এলাকা (Original jurisdiction), (২) আপীল সংক্রান্ত এলাকা (Appellate jurisdiction) এবং (৩) উপদেশ দান সংক্রান্ত এলাকা (Advisory jurisdiction) ।

আপীল সংক্রান্ত এলাকা

(১) ভারত সরকার এবং এক বা একাধিক রাজ্য সরকারের মধ্যে, অথবা (২) ভারত সরকার ও এক বা একাধিক রাজ্য সরকার একদিকে এবং এক বা একাধিক রাজ্য সরকার অন্য দিকে, অথবা (৩) দুই বা ততোধিক রাজ্য সরকারের মধ্যে যে কোন বিবাদের ক্ষেত্রে প্রথমেই সুপ্রীম কোর্টে আবেদন করতে হবে। সুপ্রীম কোর্টের এই জাতীয় মামলা বিচার করার ক্ষমতাকে মৌলিক এলাকা (Original Jurisdiction) বলা যেতে পারে।

মৌলিক এলাকা

সুপ্রীম কোর্টের আপীল মোকদ্দমা বিচারের ক্ষমতাকে চার ভাগে দেখান যেতে পারে , যথা,

(১) ১৩২ অনুচ্ছেদ অনুসারে সংবিধানের ব্যাখ্যা জড়িত প্রশ্নে।

(২) ১৩৩ অনুচ্ছেদ অনুসারে দেওয়ানী মামলায়।

(৩) ১৩৪ অনুচ্ছেদ অনুসারে ফৌজদারী মামলায়।

(৪) ১৩৬ অনুচ্ছেদ অনুসারে সামরিক ট্রাইবুনাল ব্যতীত ভারতের এলাকার মধ্যে যে কোন বিচারালয়ের রায় বা আদেশের বিরুদ্ধে।

(১) ১৩২ অনুচ্ছেদ অনুসারে সংবিধানের ব্যাখ্যা জড়িত প্রশ্নে যে কোন হাইকোর্টের রায় (Judgment) বা চরম আদেশের (Final order) বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টে আবেদন করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে অবশ্য আবেদনকারীকে হাইকোর্টের কাছ থেকে একটি বিশেষ প্রমাণপত্র পেতে হবে অথবা সুপ্রীম কোর্টের কাছ থেকে বিশেষ অনুমতি (special leave) লাভ করতে হবে।

(২) ১৩৩ অনুচ্ছেদ অনুসারে সাধারণ দেওয়ানী মামলায় সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির মূল্য যদি কুড়ি হাজার টাকার কম না হয় তাহলেও হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টে আবেদন করা যেতে পারে। তাছাড়া, হাইকোর্ট যদি এই মর্মে প্রমাণ পত্র দেয় যে মোকদ্দমাটি সুপ্রীম কোর্টে আবেদন করার উপযুক্ত, তাহলেও সুপ্রীম কোর্টে আবেদন করা যেতে পারে।

(৩) ১৩৪ অনুচ্ছেদ অনুসারে হাইকোর্ট কোন আপীল মামলায় অভিযুক্ত ব্যক্তির মুক্তির আদেশ বাতিল করে দিয়ে তাকে যদি প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করে অথবা নিম্ন কোর্টে মোকদ্দমা চলাকালীন অবস্থায় সেখান থেকে তা তুলে নিয়ে নিজের সমক্ষে বিচার করে তাকে দোষী সাব্যস্ত করে এবং প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করে তাহলে সেই দণ্ডাজ্ঞার বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টে আবেদন করা চলবে। তাছাড়া, এক্ষেত্রেও যদি হাইকোর্ট প্রমাণ পত্র দেয় যে মোকদ্দমাটি আবেদনের উপযুক্ত, তাহলেও সুপ্রীম কোর্টে আবেদন করা চলবে।

পরামর্শ দান সংক্রান্ত এলাকা

সুপ্রীম কোর্টের পরামর্শদান বিভাগও আছে। সংবিধানের ১৪৩ অনুচ্ছেদ অনুসারে রাষ্ট্রপতি কোন গুরুত্বপূর্ণ আইন অথবা ঘটনার ব্যাপারে সুপ্রীম কোর্টের পরামর্শ চাইতে পারেন এবং সুপ্রীম কোর্টও এই ব্যাপারে মতামত জানাতে বাধ্য থাকবেন। সুপ্রীম কোর্টের এই মত প্রকাশ্য আদালতে জানাতে হবে। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে গভর্ণর জেনারেল ফেডারেল কোর্টের (Federal Court) কাছ থেকে শুধু আইন সংক্রান্ত ব্যাপারে পরমার্শ চাইতে পারতেন, কিন্তু বর্তমান সংবিধানে রাষ্ট্রপতি আইন এবং ঘটনা সংক্রান্ত ব্যাপারে সুপ্রীম কোর্টের মতামত চাইতে পারেন। তাছাড়া, ঐ আইনে ফেডারেল কোর্টের পক্ষে এই মত জানান বাধ্যতামুলক কিনা সে সম্বন্ধে কোন উল্লেখ ছিল না, কিন্তু বর্তমান সংবিধানে সুপ্রীম কোর্ট এক্ষেত্রে মতামত জানাতে বাধ্য থাকবেন। সুপ্রীম কোর্ট রাষ্ট্রপতিকে যে মত জ্ঞাপন করবেন, সেটি তিনি গ্রহণ করতে বাধ্য থাকবেন এ রকম কোন বিধান সংবিধানে নেই।

মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে সুপ্রীম কোর্টের এই জাতীয় কোন উপদেষ্টামুলক বিভাগ নেই। মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম প্রেসিডেণ্ট জর্জ ওয়াশিংটন সুপ্রীম কোর্টের কাছে এই জাতীয় পরামর্শ চাইলে, সুপ্রীম কোর্ট তা দিতে অস্বীকার করেন। বিশেষ মামলার নিষ্পত্তির ক্ষেত্র ছাড়া, সুপ্রীম কোর্ট এখানে কোন মতামত জ্ঞাপন করে না। ক্যানাডার সুপ্রীম কোর্ট ভারতের সুপ্রীম কোর্টের মতই তার গভর্ণর জেনারেলকে তার পরামর্শ জানাতে বাধ্য।

সুপ্রীম কোর্টের এই জাতীয় কোন পরামর্শ দান করার ক্ষমতা থাকা উচিত কিনা তা তর্কের বিষয়বস্তু। Attorney-General for Ontaria Vs. Attorney-General of Canada—এই মামলায় প্রিভি কাউনসিল

(Privy Council) এই অভিমত ব্যক্ত করেন যে চূড়ান্ত বিচারালয়ের এই জাতীয় পরামর্শ দানমূলক কোন ক্ষমতা থাকা উচিত নয়। প্রিভি কাউন্সিলের মতে বিশেষ মামলা নিরপেক্ষে এই জাতীয় কোন পরামর্শ দিলে ভবিষ্যতে বিবাদমান পক্ষের ক্ষেত্রে তা ক্ষতিকর হতে পারে। চূড়ান্ত বিচারালয়ের পরামর্শ দানের বিপক্ষে এই যুক্তির যেমন সারবত্তা আছে, এর স্বপক্ষে তেমনি বলা যেতে পারে যে ভবিষ্যতে যে আইন টিঁকবে না এমন কোন আইন প্রণীত হবারও সম্ভাবনা থাকবে না যদি আগে থেকেই সে সম্বন্ধে চূড়ান্ত বিচারালয়ের পরামর্শ নেওয়া যায়। কিছুদিন চলার পর কোন আইন যদি চূড়ান্ত বিচারালয় কর্তৃক অবৈধ বিবেচিত হয়, তাহলে সেই আইনের আওতায় অনেক ব্যক্তিকেই ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়। আইন প্রণয়নের আগে তার সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে চূড়ান্ত বিচারালয়ের পরামর্শ নেওয়া তাই ক্ষেত্রবিশেষে যুক্তিযুক্ত মনে হতে পারে।

ভারতের বিচার ব্যবস্থায় সুপ্রীম কোর্টের স্থান

(Position of the Supreme Court in the Judicial System of India) :

ভারতের শাসনব্যবস্থায় বিচারবিভাগের যথার্থ স্থান নির্ণয় এক তর্কের বিষয়বস্তু। সাংবিধানিক পণ্ডিত এবং সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিরা এ বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন মত ব্যক্ত করেছেন। গোপালন বনাম মাদ্রাজ রাজ্যের মামলায় প্রধান বিচারপতি কানাইয়া এই মত ব্যক্ত করেছেন যে, সংবিধানের সুস্পষ্ট নির্দেশ ব্যতিরেকে আইন প্রণয়নের সার্বভৌম ক্ষমতাকে বিচারবিভাগের হস্তক্ষেপ দ্বারা সীমিত করা যেতে পারে না। তাঁর মতে স্বাধীন এবং বুদ্ধিমান জনমতের ("Free and intelligent public Opinion) দ্বারাই আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাচার বন্ধ করা যেতে পারে, বিচারবিভাগের এ সম্বন্ধে করার কিছুই নেই। কোন কোন লেখক আবার এই মত প্রকাশ করেছেন যে, পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক-ক্ষমতাশালী বিচারলয় হচ্ছে ভারতের সুপ্রীম কোর্ট। তুলনামূলক ভাবে বিচার করলে এই যুক্তির কিছুটা সারবত্তা আছে অস্বীকার করে চলে না। গ্রেটব্রিটেনের বিচারবিভাগকে পার্লামেণ্টকৃত আইনকে সর্বাবস্থায় বৈধ বলে স্বীকার করতে হয় কিন্তু ভারতের চূড়ান্ত বিচারালয়ের পার্লামেণ্ট কৃত আইন বৈধ কিনা তা বিচার করার ক্ষমতা আছে।

অর্থাৎ সংবিধান বিরোধী মনে করলে যে কোন আইনসভার প্রণীত আইনকে সে অবৈধ ঘোষণা করতে পারে। সংবিধানকে ব্যাখ্যা করার এই অধিকার সুইজারল্যাণ্ড, সোভিয়েট রাশিয়া অথবা ফ্রান্সের বিচারবিভাগের নেই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চূড়ান্ত বিচারালয়ের এই ক্ষমতা থাকলেও, ভারতবর্ষের সুপ্রীম কোর্টের মত অংগরাজ্যগুলির এক্তিয়ারভুক্ত আইনগুলির আপীল সংক্রান্ত মোকদ্দমার বিচারের অধিকার তার নেই। এই দিক থেকে বিচার করলে ভারতের চূড়ান্ত বিচারালয়কে অন্যান্য রাষ্ট্রের বিচারবিভাগের চাইতে অধিক ক্ষমতাশালী বলে মনে হতে পারে। অবশ্য সুপ্রীম কোর্টের ক্ষমতার উপর কয়েকটি সুস্পষ্ট সাংবিধানিক বাধানিষেধের দিকে লক্ষ্য করলে এই যুক্তিকে আমরা সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করতে পারি না।

সুপ্রীম কোর্টের ক্ষমতা সম্বন্ধে এই দুই চূড়ান্ত বিপরীতমুখী অভিমতের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা আমাদের শাসনব্যবস্থায় এই বিচারালয়ের যথার্থ স্থান নির্ণয়ের চেষ্টা করব।

আমাদের শাসনব্যবস্থা যুক্তরাষ্ট্রীয় এবং এই শাসনব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনায় বিচারবিভাগের ভূমিকা বিশেষভাবে গুরুত্বপূপূর্ণ। যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান বিচারালয় আইনবিভাগ কর্তৃক প্রণীত আইন সংবিধানবিরোধী হলে তাকে অবৈধ ঘোষণা করতে পারে। কেন্দ্রীয় সরকার অথবা অংগরাষ্ট্রগুলির আইনসভা সংবিধান বহির্ভূত কোন আইন প্রণয়ন করলে এখানকার সুপ্রীম কোর্ট তাকে অবৈধ ঘোষণা করে বাতিল করে দিতে পারে। লিখিত সংবিধানের দ্বারা কেন্দ্রীয় ও অংগরাষ্ট্রগুলির মধ্যে ক্ষমতার বণ্টন এবং মৌলিক অধিকারের লিপিবদ্ধকরণ যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় সুপ্রীম কোর্টকে এই বিশেষ ক্ষমতায় অভিষিক্ত করেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় সরকার অথবা অংগরাষ্ট্রগুলির সরকার প্রণীত আইন সংবিধানের নির্দেশ মত হতে হবে, কারণ সংবিধানই সেখানকার শ্রেষ্ঠতম আইন ("The constitution is the Supreme law of the land")। তাছাড়া, সংবিধান উল্লেখিত নাগরিকদের মৌলিক অধিকারগুলি রক্ষা করার দায়িত্বও এখানকার সুপ্রীম কোর্টের। সংক্ষেপে বলা যেতে পারে যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চূড়ান্ত বিচারালয়ই সংবিধানের অভিভাবক (Guardian of the constitution) এবং মৌলিক অধিকারের রক্ষাকর্তা। এখানকার সুপ্রীমকোর্টের একজন বিচারপতি মিঃ হিউজেস (*Mr. Hughes*) বলেছেন, "বিচারকেরা যাকে সংবিধান বলেন

সেইটিই সংবিধান" ("The constitution is what the judges say it is")।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিচারবিভাগের এই স্বাধীনতা গ্রেটব্রিটেনের বিচার-বিভাগের নেই। এখানে পার্লামেন্টেই সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী, কারণ পার্লামেন্টের ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রিত করার জন্য কোন লিখিত সংবিধান এখানে নেই। পার্লামেন্ট যে কোন প্রকার আইন তৈরী করুক না কেন, তা সর্বতোভাবে সিদ্ধ। পার্লামেন্ট প্রণীত আইনকে তাই অসিদ্ধ ঘোষণা করার অধিকার এখানকার বিচারবিভাগের নেই। গ্রেটব্রিটেনের সংবিধান অলিখিত এবং এখনকার শাসনব্যবস্থা এককেন্দ্রিক। অলিখিত এবং এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থায় বিচারবিভাগ লিখিত সংবিধান সংবলিত যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় বিচারবিভাগের মত ক্ষমতা ভোগ করতে পায় না।

আমাদের শাসনব্যবস্থা যুক্তরাষ্ট্রীয়। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার প্রযোজনীয় শর্ত হিসেবে, সংবিধানের অভিভাবক হিসেবে কাজ করার প্রয়োজনীয় ক্ষমতা আমাদের প্রধান বিচারালয়কে দেওয়া হয়েছে। সংবিধানের ১৩২ অনুচ্ছেদ অনুসারে সংবিধানকে ব্যাখ্যা করার ক্ষমতা সুপ্রীম কোর্টকে অর্পিত হয়েছে। কোন আইন সংবিধানের নির্দেশকে ভংগ করলে সুপ্রীম কোর্ট তাকে অবৈধ ঘোষণা করতে পারে। বিচারপতি বিজনবিহারী মুখোপাধ্যায়ের ভাষায় "কোন আইনকে বৈধ হতে হলে সংবিধানের শর্তের সংগে তার সামঞ্জস্য থাকতে হবে এবং কোন আইন সংবিধান সংগত কিনা তা স্থির করবে বিচার-বিভাগ।" (A statute law to be valid must, in all cases be in conformity with the constitutional requirments and it is for the judiciary to decide whether any enactment is constitutional or not"—S. C J. 1950, Page 262)। আইনের বৈধতা বিচার ছাড়া, সংবিধানের তৃতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত মৌলিক অধিকারগুলিকে লঙ্ঘন করে কোন আইন প্রণীত হলে আমাদের সংবিধান তাকে অবৈধ ঘোষণা করতে পারে। এদিক থেকে বিচার করলে আমাদের সুপ্রীম কোর্টকে আমরা সংবিধানের অভিভাবক এবং মৌলিক অধিকারের রক্ষক বলে বিবেচনা করতে পারি। এখানে স্পষ্টতই আমাদের বিচারবিভাগ গ্রেটব্রিটেনের বিচারবিভাগের চাইতে অধিক ক্ষমতাশালী এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার সংগে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তবে উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, সংবিধানের ব্যাখ্যাকারী এবং মৌলিক

অধিকারের রক্ষক হিসেবে আমাদের বিচারব্যবস্থা যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতির অনুগামী হলেও, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিচারবিভাগের মত ক্ষমতাশালী নয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের (১৭৯১) পঞ্চম সংশোধনে বলা হয়েছে, "আইনের বিহিত বিধান ব্যতিরেকে কোন ব্যক্তিকে তাঁর জীবন, স্বভাব এবং সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করা চলবে না" ("No person shall be deprived of his life, habits or property without due process of law.")। "আইনের বিহিত বিধানের" ("due process of law") সুযোগ নিয়ে সুপ্রীম কোর্ট কেন্দ্র অথবা অংগরাষ্ট্রের যে কোন আইনকে অবৈধ ঘোষণা করতে পারে। আমাদের দেশের সুপ্রীম কোর্টের এইভাবে কোন আইনকে অবৈধ ঘোষণা করার সুযোগ নেই।

ভারতের সংবিধানের ২১ অনুচ্ছেদ অনুসারে "আইনের পদ্ধতি ব্যতিরেকে কোন ব্যক্তির জীবন বা স্বাধীনতা হরণ করা চলবে না।" ("No person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law")। এই অনুচ্ছেদের অর্থ এই যে, কোন ব্যক্তির জীবন বা স্বাধীনতা যদি কেড়ে নেওয়া হয় তবে তা আইনের পদ্ধতি অনুসারে হতে হবে। অর্থাৎ, আইনের পদ্ধতি অনুসারে কোন ব্যক্তিকে তার প্রাণ বা স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করা হলে বিচারবিভাগের সেখানে প্রতিবিধানের কোন হাত নেই, সেই আইন যতই নিষ্ঠুর বা হৃদয়হীন হোক না কেন। শাসন-বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্বৈরাচারী হয়ে আইনের বিরুদ্ধে কারোর প্রাণনাশ বা স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করলে বিচারবিভাগ তার প্রতিকার করতে পারে কিন্তু আইনসংগত উপায়ে এই স্বাধীনতা হৃত হলে সুপ্রীমকোর্টের করার কিছুই নেই। গোপালন বনাম মাদ্রাজ রাজ্য মামলায়— এই নীতিটি স্বিরীকৃত হওয়ায় সুপ্রীম কোর্টের আইনের বৈধতা বিচারের ক্ষমতা স্পষ্টতই সীমীত হয়েছে।

তাছাড়া, সংবিধানের ৩১ অনুচ্ছেদ অনুসারে রাষ্ট্রকর্তৃক কোন সম্পত্তি গৃহীত বা অস্বীকৃত হওয়ার ক্ষেত্রে, ক্ষতিপূরণ নির্ধারণের জন্য যে নীতি আইনের দ্বারা সৃষ্টি হবে তাকেও অবৈধ বলে ঘোষণা করার অধিকার সুপ্রীম কোর্টের নেই। অর্থাৎ, আইনসভা ক্ষতিপূরণের যে নীতি নির্বাচন করবে তা সর্বক্ষেত্রেই বৈধ এবং চূড়ান্ত সুতরাং তা সুপ্রীমকোর্টের বিচারের

এক্তিয়ারভুক্ত নয়। নির্বাচন সংক্রান্ত কয়েকটি বিষয়ও বিচারবিভাগীয় এক্তিয়ারের বহির্ভূত বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

সুপ্রীম কোর্টের ক্ষমতার সীমাবদ্ধতার এই দিকগুলি বিচার করে আমরা বলতে পারি যে ভারতে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হলেও আমাদের বিচারবিভাগকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিচারবিভাগের মত ক্ষমতাশালী করা হয়নি।

উপসংহারে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে ভারতের বিচার-ব্যবস্থা আইনের বৈধতা বিচারের ক্ষমতায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিচার-ব্যবস্থার মত প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী যেমন নয়, তেমনি গ্রেটব্রিটেনের বিচার-ব্যবস্থার মত সর্বতোভাবে আইন বিভাগের উপর নির্ভরশীলও নয়। ভারতেব বিচারবিভাগ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং গ্রেটব্রিটেনের বিচার বিভাগের মধ্যবর্তী স্থলে অবস্থিত।

সুপ্রীম কোর্টের ভাষায় "ভারতের বিচার বিভাগের স্থান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইংলণ্ডের বিচারালয়গুলির মধ্যবর্তী কোন একস্থানে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেব সুপ্রীমকোর্ট যে ভূমিকা গ্রহণ করে ভারতের বিচারালয়ের পক্ষে সে সুযোগ নেই।" (In India the position of the judiciary is somewhere between the courts in England and the United States. There is no scope for the courts in India to play the role of the Supreme Court in the United states. Gopalan Vs. the State of Madras 1950, S C. G. 174)

একাদশ অধ্যায়

রাজ্যপাল ও মন্ত্রীপরিষদ

(Governor and Council of Ministers)

আমাদের খসড়া শাসনতন্ত্রে রাজ্যপালকে নির্বাচনের দ্বারা নিয়োগের প্রস্তাব করা হয়। কিন্তু মূল সংবিধানে এই নিয়মের পরিবর্তে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিয়োগের বিধানই গৃহীত হয়। রাজ্যপাল রাজ্যের নিয়মতান্ত্রিক প্রধান মাত্র। তাঁর ক্ষমতা মন্ত্রীপরিষদের পরামর্শ অনুসারেই পরিচালিত হবে।

রাজ্যপালের নিযোগ

সুতরাং এই পদের জন্য ব্যাপক নির্বাচন প্রচেষ্টা ও ব্যয়ভার বহন করা রাজ্যের পক্ষে নিষ্প্রয়োজন বিবেচনা করে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিয়োগের বিধানই শেষ পর্যন্ত সংবিধানে স্বীকৃত হয়। তাছাড়া, রাজ্যপাল নির্বাচিত হলে তিনি সারা রাজ্যব্যাপী একটিমাত্র নির্বাচনী এলাকা থেকেই নির্বাচিত হবেন, যার ফলে তিনি নিজেকে মুখ্যমন্ত্রীর চাইতে অধিকতর ক্ষমতাশালী এবং প্রতিনিধি স্থানীয় বলে বিবেচনা করতে পারেন। এ জন্যে রাজ্যপাল এবং মুখ্যমন্ত্রীর মধ্যে অনাবশ্যক মতানৈক্য ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা উদ্ভব হতে পারে—এ কারণেও রাজ্যপালের নির্বাচন অপেক্ষা রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিয়োগের ব্যবস্থাই অধিকতর বাঞ্ছনীয় বলে বিবেচিত হয়। বর্তমানে তাই সংবিধানের ১৫৫ অনুচ্ছেদ অনুসারে রাজ্যপাল রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হয়ে থাকেন।

যোগ্যতা ও অন্যান্য গুণাবলী

রাজ্যপালকে ভারতীয় নাগরিক হতে হবে এবং ৩৫ বৎসরের ঊর্ধ্ববয়স্ক হতে হবে। তিনি কেন্দ্র বা অংগরাজ্যের আইনসভার সদস্য হতে পারবেন না। রাজ্যপালের কার্যকাল পাঁচ বৎসর, তবে একই ব্যক্তির একাধিকবার রাজ্যপাল নিযুক্ত হবার বাধা নেই। কার্যকাল গত হওয়ার আগে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক পদচ্যুত হলে অথবা স্বপদে ইস্তফা প্রদান করলে রাজ্যপালের কার্যকাল শেষ হবে। তাঁর অন্যান্য ভাতা ছাড়া মাসিক বেতন পাঁচ হাজার টাকা।

রাজ্যপালের ক্ষমতার স্বরূপ (Position of the Governor):

রাজ্যপালের ক্ষমতার স্বরূপ এবং সাংবিধানিক কাঠামোয় তাঁর যথার্থ স্থান বিচার করতে হলে আমাদের প্রথমেই উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, কেন্দ্র ও রাজ্য এই উভয় শাসনব্যবস্থার ক্ষেত্রেই আমরা গ্রেটব্রিটেনের অনুকরণে পার্লামেণ্ট পরিচালিত শাসনব্যবস্থার রীতিকেই গ্রহণ করেছি। পার্লামেণ্ট পরিচালিত শাসনব্যবস্থায় গ্রেটব্রিটেনে মন্ত্রীপরিষদই সর্বেসর্বা—রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পদাধিকারী রাজা নামে মাত্র রাষ্ট্রের প্রধান। আসলে মন্ত্রীপরিষদের পরামর্শ অনুসারেই তিনি শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করেন। তেমনি আমাদের রাষ্ট্রপতি এবং রাজ্যপালও নামে মাত্র যথাক্রমে কেন্দ্র এবং রাজ্যের প্রধান পদাধিকারী। রাষ্ট্রপতি এবং রাজ্যপাল উভয়কেই তাঁদের নিজ নিজ মন্ত্রীপরিষদের পরামর্শ অনুসারেই কাজ করতে হয়।

রাজ্যপালেব ক্ষমতার যথার্থ স্বরূপ নির্ণয় করতে হলে তাঁর সংগে মন্ত্রী-পরিষদের সাংবিধানিক সম্পর্কের ভিত্তিতেই তা করতে হবে। সংবিধানের ১৬৩ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে সংবিধানের নিয়ম অনুসারে যে সমস্ত কাজের ক্ষেত্রে রাজ্যপালকে তাঁর নিজস্ব বিচারবুদ্ধি অনুসারে কাজ করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে সেইগুলি ছাড়া, তাঁকে তাঁর কার্যাবলীতে সাহায্য এবং পরামর্শ দেওয়ার জন্য একটি মন্ত্রীপরিষদ থাকবে (There shall be a Council of Ministers with the Chief Minister at the head to aid and advise the Governor in the exercise of his functions, except in so for as he is by or under this constitution required to exercise his functions or any of them in his discretion)। সংবিধানে কেবলমাত্র আসামের রাজ্যপালের কার্যাবলীর ক্ষেত্রে কয়েকটি বিশেষ ক্ষমতার কথা উল্লেখ আছে। সংবিধানের ষষ্ঠ তালিকায় ৯ (২) :এবং ১৮ (৩) অনুচ্ছেদে এই বিশেষ ক্ষমতাগুলি উল্লেখ করা হয়েছে। কতকগুলি সীমান্ত এলাকার প্রশাসনিক ব্যবস্থার ক্ষেত্রে এবং কতকগুলি উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায় আর্থিক ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে আসামের রাজ্যপালকে কয়েকটি বিশেষ ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। রাষ্ট্রপতির প্রতিনিধি হিসেবে তিনি এই ক্ষমতাগুলি পরিচালিত করবেন। আসামের রাজ্যপালের এই বিশেষ

ক্ষমতাগুলি ছাড়া, সংবিধানে অন্যান্য রাজ্যপালদের কোন বিশেষ ক্ষমতার কথা উল্লেখ করা হয়নি। অর্থাৎ, অন্যান্য রাজ্যপালেরা সাধারণভাবে মন্ত্রীপরিষদের সাহায্য ও পরামর্শ মত তাঁদের ক্ষমতা পরিচালিত করবেন। অবশ্য সংবিধানের ভাষায় এমন কোন কথা নেই যা থেকে এই সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে যে, রাজ্যপাল মন্ত্রীপরিষদের সাহায্য ও পরামর্শ গ্রহণ করতে বাধ্য। প্রকৃতপক্ষে সংবিধানের ভাষায় রাজ্যপালের ক্ষমতাকে সংকুচিত করা হয়নি। তথাপি রাজ্যপাল রাজ্যের নিয়মতান্ত্রিক প্রধান হিসেবেই কাজ করবেন, এটা আমরা ধরে নিতে পারি। পার্লামেণ্ট চালিত শাসনব্যবস্থায় মন্ত্রীপরিষদকেই আসল ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করে তাকে জনপ্রতিনিধিমূলক আইন সভার কাছে দায়ী করা হয়, কাজেই রাষ্ট্রের প্রধান পদাধিকারী নিয়মতান্ত্রিক প্রধান মাত্র। ভারতে কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির ক্ষেত্রেও এই নীতিকেই কার্যকরী করা হয়েছে—একথা আমরা মনে করতে পারি। মন্ত্রীপরিষদের পরামর্শ ও সাহায্য যদি কোন রাজ্যপাল গ্রহণ না করেন তাহলে মন্ত্রীপরিষদ শেষ পর্যন্ত পদত্যাগ করে শাসনব্যবস্থা পরিচালনার ক্ষেত্রে যে অচল অবস্থার সৃষ্টি করতে পারে কোন রাজ্যপালের পক্ষেই তার সম্মুখীন হওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং ইচ্ছা না থাকলেও শেষ পর্যন্ত অনন্যোপায় হয়েই রাজ্যপালকে মন্ত্রীপরিষদের সাহায্য গ্রহণ করতে হবে। সেদিক থেকে বিচার করলে রাজ্যপালের নিয়মতান্ত্রিক প্রধান হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। ১৯৫০ সালে সুনীলকুমার বসু ও অন্যান্য বনাম পশ্চিমবংগ সেক্রেটারী—এই মামলায় কলকাতা হাইকোর্ট রায় দেন যে বর্তমান সংবিধানে রাজ্যপালেরা মন্ত্রীপরিষদের পরামর্শ ছাড়া কাজ করতে পারেন না।[1] ১৯৫৫ সালে আর. জে. কাপুর বনাম পাঞ্জাব রাজ্য—এই মামলায় সুপ্রীম কোর্ট একই অভিমত ব্যক্ত করেন।

---

1. 'The Governor under the present constitution cannot act except in accordance with the advice of his Ministers Under the Government of India Act, 1935, the position was different. The Governor could do certain acts in his discretion, that is, without asking for the advice of any minister, he could do certain acts in his individual capacity, that is only after consulting his Ministers but he was not bound when acting in his individual capacity to follow the advice of his ministers. Under the present constitution, the power to act in his discretion or in his individual capacity has been taken away and the Governor, therefore, must act on the advice of his ministers. This is the constitutional position as explained to us by the Advocate-General and we accept his view'',

তাই বলে রাজ্যপালকে সর্বপ্রকার ক্ষমতা রহিত নামসর্বস্ব প্রধান বলে গণ্য করা ঠিক হবে না। আমাদের এককেন্দ্রিকতার দিকে ঝোঁক সম্পন্ন যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় কেন্দ্র ও রাজ্যসবকারের সম্পর্ককে সুদৃঢ করাব ক্ষেত্রে এবং রাজ্যের উপব কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তৃত্বকে কার্যকরী করার ক্ষেত্রে রাজ্যপালকেই প্রধান হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে কেন্দ্র ও রাজ্যসবকারের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনের ব্যাপারে রাজ্যপালের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ। কেন্দ্র ও রাজ্যসরকারের মধ্যে কোন প্রকার মতানৈক্য বা শাসন সংক্রান্ত বৈষম্য দেখা দিলে রাজ্যপাল কেন্দ্রীয সরকারের ইচ্ছাকে সুরক্ষিত করার চেষ্টা করেন। রাজ্যের আইনসভার দ্বারা কোন বিল পাস হলে রাজ্যপাল ইচ্ছে করলে তাতে সম্মতি না দিয়ে রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য তা সংরক্ষিত করতে পারেন। তাছাড়া, সংবিধানের ৩৫৬ অনুচ্ছেদ অনুসারে কোন রাজ্যের শাসনব্যবস্থা পবিচালনা করা অসম্ভব হলে রাষ্ট্রপতি মুখ্যত: রাজ্যপালের রিপোর্টের উপব নির্ভর করেই সেখানে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করবেন। এক্ষেত্রে আমরা আশা করতে পারি যে রাজ্যপাল এই সমস্ত কার্যাবলী পরিচালনার ব্যাপারে কেন্দ্রের ইচ্ছা অনুসারে পরিচালিত হবেন। কারণ, তিনি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত এবং এই নিযোগ কেন্দ্রের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত মন্ত্রীসভার পরামর্শ অনুসারে তাদের দলভুক্ত অথবা দলের সমর্থিত ব্যক্তিদের মধ্য থেকেই ঘটে থাকে। এই সমস্ত দিক বিবেচনা করে অনেক লেখক বর্তমান রাজ্যপালদের শুধুমাত্র নিয়মতান্ত্রিক প্রধান হিসেবে গণ্য করতে রাজী নন।

রাজ্যপালের সংবিধানগত অবস্থান সম্বন্ধে উপসংহারে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, আমরা বর্তমান শাসনব্যবস্থায় একাধারে পার্লামেণ্ট পরিচালিত শাসনব্যবস্থা এবং পক্ষান্তরে এককেন্দ্রিকতার দিকে ঝোঁক সম্পন্ন যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত করেছি। পার্লামেণ্ট পরিচালিত শাসনে নিয়মতান্ত্রিক প্রধানের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য এবং সেই প্রয়োজনীয়তার খাতিরে আমাদের সংবিধান প্রণেতারা রাজ্যপালদের নিয়মতান্ত্রিক প্রধান হিসেবে দেখতে চেয়েছেন। অপরদিকে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় জাতীয় ঐক্য এবং সংহতি রক্ষার প্রয়োজনীয়তায় কেন্দ্রের ইচ্ছাকে বলবৎ করার উদ্দেশ্যে তাঁরা রাজ্যপালকে যথোপযুক্ত ক্ষমতায় ক্ষমতান্বিত করার প্রয়োজনীয়তাটিও অস্বীকার করতে পারেননি।

রাজ্যপালের ক্ষমতা (Powers of the Governor) ঃ

রাজ্যপালের ক্ষমতাগুলি প্রধানতঃ চার ভাগে আলোচনা করা যেতে পারে, যথা—(১) শাসন সংক্রান্ত ক্ষমতা, (২) আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত ক্ষমতা, (৩) অর্থ-সংক্রান্ত ক্ষমতা এবং (৪) বিচার-সংক্রান্ত ক্ষমতা।

শাসন-সংক্রান্ত কাজ (Executive Powers) ঃ রাজ্যপাল রাজ্যের শাসন-সংক্রান্ত ক্ষমতার শীর্ষস্থানে অবস্থিত। ১৫৪ অনুচ্ছেদ অনুসারে এই ক্ষমতা তিনি স্বয়ং অথবা তাঁর অধঃস্তন কর্মচারীদের মাধ্যমে প্রয়োগ করবেন। শাসনতান্ত্রিক প্রধান হিসেবে রাজ্যপাল মুখ্যমন্ত্রী ও তাঁর পরামর্শ মত অন্যান্য মন্ত্রীদের এবং অ্যাডভোকেট-জেনারেল ও রাজ্য পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সদস্যদের নিয়োগ করবেন। রাজ্যের শাসন-সংক্রান্ত কার্যাদি সহজ ও সুশৃংখল-রূপে নির্বাহ করার জন্য রাজ্যপালই প্রয়োজনীয় নিয়মাদি প্রস্তুত করেন। মন্ত্রীদের মধ্যে কর্ম বণ্টন সংক্রান্ত নিয়মাদি প্রণয়ন করাও তাঁর অন্যতম কাজ।

আইনপ্রণয়ন-সংক্রান্ত কাজ (Legislative Powers) ঃ কোন বিল রাজ্যের আইনসভা কর্তৃক পাস হওয়ার পর রাজ্যপালের নিকট তাঁর সম্মতির জন্য উপস্থাপিত হবে। রাজ্যপাল তাতে সম্মতি দিতে পারেন, আবার না-ও দিতে পারেন অথবা রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য সংরক্ষণ করতে পারেন। সম্মতি না দিয়ে তিনি বিলটি পুনর্বিবেচনার জন্য রাজ্যের আইনসভার কাছে ফেরত পাঠাতে পারেন, কিন্তু এক্ষেত্রে বিলটি যদি পুনরায় তার মূল আকারে অথবা কোন সংশোধিত আকারে পাস হয় তাহলে রাজ্যপাল তাতে সম্মতি না দিয়ে পারবেন না। রাজ্যপালের সুপারিশ ব্যতিরেকে কোন অর্থ-সংক্রান্ত বিল উত্থাপন করা যাবে না। রাজ্যপালকে রাষ্ট্রপতির বিবেচনার জন্য বিল সংরক্ষণের (reserve) ক্ষমতাও দেওয়া হয়েছে। রাজ্যপাল রাজ্যের আইন সভার প্রণীত আইনগুলির মত সমান ক্ষমতাসম্পন্ন অর্ডিন্যান্স জারী করতে পারেন। রাজ্যপাল যদি মনে করেন যে অবিলম্বে তাঁর হস্তক্ষেপ করা প্রয়োজন এমন অবস্থা রাজ্যে উদ্ভূত হয়েছে, তাহলে আইনসভার অধিবেশন চলছে না এমন যে কোন সময়ে তিনি এই অর্ডিন্যান্স জারী করতে পারেন। রাজ্যের আইনসভার পুনরায় অধিবেশন বসলে, এই অর্ডিন্যান্সটিকে আইন সভায় সম্মতির জন্য পেশ করতে হবে এবং রাজ্য আইনসভা কর্তৃক অনুমোদিত না হলে উক্ত অধিবেশনের সময় থেকে ছয় সপ্তাহ অতিক্রান্ত হওয়ার সংগে সংগে অর্ডিন্যান্সটির কার্যকারীতা আপনা হতেই লোপ পাবে।

উক্ত অর্ডিন্যান্স রাজ্যপাল যে কোন সময়ে তুলে নিতেও পারেন। প্রসংগক্রমে উল্লেখযোগ্য যে, রাজ্যপালের অর্ডিন্যান্স প্রণয়নের ক্ষমতা রাজ্য তালিকার অন্তর্ভূক্ত বিষয়বস্তুগুলির মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তবে যুগ্ম তালিকার অন্তর্ভুক্ত কোন বিষয়ের উপর রাজ্যপাল যদি অর্ডিন্যান্স জারী কবেন এবং যদি তা রাষ্ট্রপতির আদেশ অনুসারে করা হয়ে থাকে তবে কেন্দ্রীয আইনের সংগে অসংগতিপূর্ণ হলে রাজ্যপালেব অর্ডিন্যান্সটিই বলবৎ হবে। যে সমস্ত বিল রাজ্য আইনসভায় উত্থাপনেব আগে রাষ্ট্রপতির অনুমোদন প্রযোজন হয় এবং যে সমস্ত বিল রাজ্যপাল রাষ্ট্রপতিব সম্মতির জন্য সংরক্ষণ করা উচিত মনে করেন সেই সমস্ত ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতির আদেশ ব্যতিরেকে রাজ্যপাল অর্ডিন্যান্স জারী করতে পারবেন না।

অর্থ-সংক্রান্ত ক্ষমতা (Financial Powers): প্রত্যেক আর্থিক বৎসবের প্রাবম্ভে রাজ্যপাল বাজ্যের নিম্নতন আইনসভার কক্ষে অথবা আইন সভা ও বিধানসভার উভয় কক্ষে উক্ত রাজ্যের একটি বার্ষিক অর্থ-সংক্রান্ত বিবরণ ("An annual financial Statement") উপস্থাপিত করাবেন। রাজ্যপালের অনুমোদন ব্যতিবেকে কোন খাতের ব্যয় বরাদ্দ প্রস্তাব করা যাবে না। সাধাবণভাবে এই ব্যবস্থা ছাড়া, রাজ্যপালকে উক্ত আর্থিক বৎসরের যে কোন সময়ে অতিবিক্ত ব্যয বরাদ্দের প্রস্তাবও উত্থাপনের ক্ষমতা দেওযা হয়েছে।

বিচার-সংক্রান্ত ক্ষমতা (Judicial Powers): রাজ্যের শাসন সংক্রান্ত ক্ষমতাব অন্তর্ভূক্ত কোন আইন অমান্য করার অপরাধে কোন দণ্ডিত ব্যক্তিকে রাজ্যপাল ক্ষমা (pardon) কবতে পাবেন, দণ্ড স্থগিত রাখতে (Reprieve), বিলম্ব করতে (Respite) পারেন, হ্রাস (remission) অথবা লাঘব করতে পারেন।

রাজ্যের মন্ত্রীপরিষদ (Council of Ministers in the States):

কেন্দ্রের মত আমাদের রাজ্যগুলিতেও পার্লামেণ্ট চালিত শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত করা হয়েছে। এখানে রাজ্যপাল নামে মাত্র রাজ্যের প্রধান হলেও শাসন সংক্রান্ত ব্যাপারে প্রকৃত কর্তৃত্ব মন্ত্রিসভার হাতে ন্যস্ত। মন্ত্রীসভার প্রধান—মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যপাল কর্তৃক নিযুক্ত হলেও, কার্যতঃ এই ব্যাপারে তাঁর নিজস্ব সিদ্ধান্তের অবকাশ কম। রাজ্য আইনসভায় যে রাজনৈতিক

দল আইনসভার অধিকাংশ আসন দখল করতে সক্ষম হয়েছে তাঁদের মধ্য থেকে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকেই মুখ্যমন্ত্রী পদে নিয়োগ করতে হয়। অবশ্য কয়েকটি ক্ষেত্রে—যেমন, রাজা গোপালাচারী মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন মাদ্রাজে রাজ্যপালকে অগ্রণী হয়ে মুখ্যমন্ত্রী নিয়োগের ক্ষেত্রে নিজস্ব বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করতে হয়েছিল। মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে রাজ্যের অন্যান্য মন্ত্রীরা নিযুক্ত হন। রাজ্য মন্ত্রীসভার সদস্যেরা সংবিধানের নিয়ম অনুসারে যদিও রাজ্যপালের আস্থা (pleasure) ভাজন থাকাকালীন স্বপদে অধিষ্ঠিত থাকেন, কার্যতঃ এই অধিষ্ঠান রাজ্য বিধানসভার আস্থার উপরই নির্ভর করে অর্থাৎ মন্ত্রীসভা যতদিন পর্যন্ত বিধানসভার আস্থাভাজন থাকেন ততদিন তাঁরা মন্ত্রীসভার সদস্য হিসেবে কাজ করেন।

মন্ত্রীসভার সদস্যদের রাজ্য আইনসভার যে কোন কক্ষের সদস্য হতে হয়। যদি নিয়োগের সময় কোন মন্ত্রী আইনসভার সদস্য না হন তাহলে উক্ত নিয়োগের সময় থেকে ছয় মাসের মধ্যে আইনসভার যে কোন কক্ষের সদস্য হতে হবে, অন্যথায় পদত্যাগ করতে হয়।

রাজ্যের শাসন সংক্রান্ত ব্যাপারে অথবা আইন প্রণয়ন ব্যাপারে মন্ত্রীসভার যাবতীয় সিদ্ধান্ত রাজ্যপালকে জ্ঞাত করান মুখ্যমন্ত্রীর অন্যতম কাজ। তাছাড়া, রাজ্যপাল সময় সময় শাসন সংক্রান্ত যে সমস্ত বিষয় জানতে চাইবেন সেগুলি তাঁকে জ্ঞাত করাও মুখ্যমন্ত্রীর অন্যতম কাজ। রাজ্যপাল প্রয়োজন বোধে কোন মন্ত্রীর সিদ্ধান্ত মন্ত্রীসভার বিবেচনার জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে নির্দেশ দিলে উক্ত বিষয় মন্ত্রীসভার বিবেচনার জন্য তাঁকে উপস্থাপিত করতে হয়।

রাজ্যের আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে এবং শাসন সংক্রান্ত যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত মন্ত্রীসভার আলোচনায় স্থিরীকৃত হয়। রাজ্যের শাসন-ব্যবস্থার বিভিন্ন বিভাগে কত ব্যয় হবে এবং কিভাবে প্রয়োজনীয় অর্থ তোলা হবে সে সম্বন্ধে মন্ত্রীসভাই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সংক্ষেপে বলা যেতে পারে যে, আয়-ব্যয় সংক্রান্ত ব্যাপারে নীতি নির্ধারণ করা মন্ত্রীসভার অন্যতম কাজ।

মুখ্যমন্ত্রীর পরিচালনায় মন্ত্রীসভা সাধারণতঃ পরিচালিত হন। পদ-মর্যাদার দিক থেকে মুখ্যমন্ত্রীর অগ্রাধিকার স্বীকৃত হলেও তিনি অন্যান্য মন্ত্রীদের উপর খবরদারী করতে পারেন না।

প্রকৃতপক্ষে মুখ্যমন্ত্রীর ব্যক্তিত্ব এবং কর্ম-চাতুর্যের উপর শাসনব্যবস্থার সুষ্ঠু পরিচালনা নির্ভর করে। মন্ত্রীসভায় আলোচনার ক্ষেত্রে কোন্ কোন্ বিষয়গুলি

উপর বিস্তৃত আলোচনা প্রয়োজন তা নির্ভর করে মুখ্যমন্ত্রীর সিদ্ধান্তের উপর। বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সহযোগিতা এবং মতবৈষম্যের সামঞ্জস্যবিধান মুখ্যমন্ত্রীর কৃতিত্ব এবং কর্মতৎপরতার উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার মত রাজ্যের মন্ত্রীসভাও রাজ্য বিধানসভার কাছে যৌথভাবে দায়ী থাকেন। রাজ্যের আইনসভার সদস্যরা মন্ত্রীদের প্রশ্ন করে অথবা পরিপূরক প্রশ্ন করে মন্ত্রীসভাকে নিয়ন্ত্রিত করে থাকেন। মন্ত্রীসভায় উত্থাপিত কোন আইনের প্রস্তাবকেও তাঁরা নাকচ করে দিতে পারেন। সরকারের তরফ থেকে উত্থাপিত বিলকে এইভাবে নাকচ করা সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রকাশেরই সমতুল্য। বিধানসভা সরাসরিভাবে মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাবও পাস করতে পারে। বিধান সভায় অনাস্থা-সূচক কোন প্রস্তাব পাস হলে মন্ত্রীসভাকে পদত্যাগ করতে হয়। অবশ্য মন্ত্রীসভা এরূপ কোন সম্ভাবনার ক্ষেত্রে রাজ্যপালকে আইনসভা ভেঙে দেওয়ার জন্যও পরামর্শ দিতে পারে। মন্ত্রীসভার এই পরামর্শ অনুসারে রাজ্যপাল আইনসভা ভেঙে দিলে নতুন করে নির্বাচনেব অনুষ্ঠান হয়। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত রাজনৈতিক দলের নেতৃস্থানীয় মন্ত্রীমণ্ডলী তাঁদের দলভুক্ত বিরোধী মনোভাবাপন্ন সদস্যদের তাঁদের দলীয় সদস্য হিসেবে নির্বাচনে অবতীর্ণ হবার সুযোগ না দিতে পারেন। ব্যক্তিগতভাবে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা ব্যয়সাপেক্ষও বটে। এই সমস্ত কারণে মন্ত্রীসভার দলীয় সদস্যরা সাধারণতঃ আইনসভা ভেঙে দিয়ে নতুন নির্বাচনের সম্মুখীন হতে চান না। ফলে মন্ত্রীসভার নির্দেশ অনুসারেই তাঁদের পরিচালিত হতে হয়।

মন্ত্রীপরিষদের সংগে রাজ্যপাল এবং আইনসভার সম্বন্ধ (Relation of the Council of Ministers to the Governor and State Legislature):

কেন্দ্রের অনুকরণে অংগরাজ্যগুলিতেও মন্ত্রীসভা চালিত শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছে। সংবিধানের ভাষায় রাজ্যপালকে পরামর্শ ও সাহায্য দেওয়া মন্ত্রীপরিষদের কাজ হলেও প্রকৃতপক্ষে শাসনকার্য পরিচালনার ব্যাপারে রাজ্যপাল নিয়মতান্ত্রিক প্রধান হিসেবেই কাজ করেন। সংক্ষেপে বলা যেতে পারে যে, মন্ত্রীসভার পরামর্শ ও সাহায্য রাজ্যপালকে অবশ্যই গ্রহণ করতে হয়। এই অর্থে শাসনব্যবস্থা

মন্ত্রীসভা ও রাজ্যপাল।

পরিচালনার প্রকৃত কর্তৃত্ব ও দায়িত্ব মন্ত্রিপরিষদের এবং সে অর্থে রাজ্যপাল একটি নিয়মতান্ত্রিক প্রধান মাত্র। সুনীলকুমার বসু বনাম পশ্চিমবংগের সেক্রেটারীর মামলায় কলকাতা হাইকোর্ট এই অভিমতকেই সমর্থন করেছেন। প্রকৃতপক্ষে, মন্ত্রীসভার পরামর্শ ও সাহায্য উপেক্ষা করলে মন্ত্রীসভা যদি পদত্যাগ করেন তাহলে রাজ্যপালের পক্ষে আইনসভার প্রতি আস্থাভাজন অন্য মন্ত্রীসভা গঠন করা সম্ভব হবে না এবং সেক্ষেত্রে শাসনব্যবস্থা পরিচালনায় যে অচল অবস্থা সৃষ্টি হবে তা স্পষ্টতঃই সংবিধান বিরোধী।

মুখ্যমন্ত্রী নিয়োগের ক্ষেত্রে রাজ্যপালকে আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকেই নিয়োগ করতে হয় এবং তাঁর পরামর্শ অনুসারে মন্ত্রীসভার অন্যান্য সদস্যদের নিয়োগ করতে হয়। সংবিধানের ভাষায় মন্ত্রীসভার সদস্যরা যদিও তাঁর আস্থাভাজন থাকাকালীন স্বপদে বহাল থাকেন, কার্যতঃ এই স্বপদে অধিষ্ঠান আইনসভার আস্থার উপর নির্ভরশীল।

রাজ্যের শাসন সংক্রান্ত বা আইন প্রণয়ন ব্যাপারে যাবতীয় সিদ্ধান্ত রাজ্যপালকে জ্ঞাত করান মুখ্যমন্ত্রীর কাজ। তাছাড়া, রাজ্যপাল যদি শাসন সংক্রান্ত ব্যাপারে কোন বিষয় জানতে চান তাহলে সেগুলিকে তাঁকে জানানও মুখ্যমন্ত্রীর অন্যতম কাজ। রাজ্যপাল প্রয়োজনবোধে কোন মন্ত্রীর সিদ্ধান্ত মন্ত্রীসভার বিবেচনার জন্য উক্ত পরিষদের অধিবেশনে উপস্থাপিত করতে নির্দেশ দিতে পারেন।

মন্ত্রীসভার সংগে রাজ্য-আইনসভার সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয়—মন্ত্রীসভার সদস্যদের আইনসভার যে কোন কক্ষের সদস্য হতে হয়। যদি কোন মন্ত্রী নিয়োগের সময় আইনসভার সদস্য না হন তবে তাঁকে উক্ত সময় থেকে ছয় মাসের মধ্যে আইনসভার যে কোন কক্ষের সদস্য হতে হয়। মন্ত্রীসভার সদস্যগণ আইনসভার সদস্য হিসেবে আইনসভার অধিবেশনে অংশ গ্রহণ করেন।

মন্ত্রীসভা ও রাজ্যের আইনসভা

সংবিধানের ১৬৪ (২) অনুচ্ছেদ অনুসারে মন্ত্রীসভা বিধানসভার কাছে যৌথভাবে দায়ী থাকেন (The Council of Ministeis shall be collectively responsible to the Legislative Assembly of the State)। বিধান-সভার সদস্যগণ প্রশ্ন করে, অথবা পরিপুরক প্রশ্ন করে অথবা মন্ত্রীসভা কর্তৃক উত্থাপিত আইন বা বাজেট অগ্রাহ্য করে অথবা মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে সরাসরি অনাস্থাসূচক প্রস্তাব এনে তাদের দায়িত্বকে কার্যকরী করে। মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে

অনাস্থাসূচক প্রস্তাব পাস হলে, মন্ত্রীসভা সাধারণতঃ পদত্যাগ করে। অবশ্য মন্ত্রীসভা তাদের পিছনে জনমতের সমর্থন আছে বুঝলে রাজ্যপালকে আইনসভা ভেংগে দিতে পরামর্শ দিতে পারেন এবং সেক্ষেত্রে নতুন নির্বাচনের অনুষ্ঠান হবে। আয়-ব্যয় সংক্রান্ত প্রস্তাব পেশ করা মন্ত্রীসভার একচেটিয়া অধিকার। যেহেতু রাজ্যপালের অনুমোদন ব্যতিরেকে কোন অর্থসংক্রান্ত বিল পাস করা যায় না, সেহেতু স্বভাবতই মন্ত্রীসভাই এই অধিকার ভোগ করে। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে এক্ষেত্রে বিধানপরিষদের ক্ষমতা খুবই সীমাবদ্ধ।

উপসংহারে উল্লেখ করতে হয় যে, রাজনৈতিক দলপ্রথা অনুসারে শাসন-ব্যবস্থা পরিচালিত হওয়ায়, আইনসভার নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা আজকাল অনেক কমে গিয়েছে। আইনসভায় পেশ হবার আগে সরকারী নীতিগুলি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত দলের সভায় এবং মন্ত্রীসভায় আলোচিত এবং নির্ধারিত হয়। সুতরাং দলীয় সিদ্ধান্তেব বিরুদ্ধে আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ সভ্যদের মন্ত্রীসভার বিরোধীতা করা সম্ভব নয়। তবে আইনসভার এই নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার জন্যই মন্ত্রীসভাকে যে তাঁদের নির্ধারিত নীতি ও কার্যাবলী সম্বন্ধে যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করতে হয় সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

দ্বাদশ অধ্যায়

অংগরাজ্যের আইনসভা এবং বিচার ব্যবস্থা

(Legislature and Judicial System of States)

রাজ্যের আইনসভার গঠন ও কার্যাবলী (Composition and functions of State Legislatures) ঃ

সংবিধানের ১৬৮ অনুচ্ছেদ অনুসারে প্রত্যেক রাজ্যের জন্য একটি করে আইনসভা থাকবে। কেবল অন্ধ্রপ্রদেশ, বিহার, মধ্যপ্রদেশ, মাদ্রাজ, মহারাষ্ট্র, মহীশূর, পাঞ্জাব, উত্তর প্রদেশ এবং পশ্চিম বাংলার আইনসভা দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট এবং বাকী আইনসভাগুলি এক কক্ষ বিশিষ্ট হবে।

বিধানসভা ও বিধানপরিষদ

যে রাজ্যের আইনসভা দ্বিকক্ষবিশিষ্ট, তার উচ্চতন কক্ষটিকে বলা হবে বিধানপরিষদ (Legislative Council) এবং নিম্নতন কক্ষটিকে বলা হবে বিধানসভা (Legislative Assembly)। একটিমাত্র কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভাকে বিধানসভাই বলা হবে।

কোন রাজ্যের বিধানসভার মোট সদস্য সংখ্যার অধিকাংশ ও উপস্থিত ভোটদানকারী সদস্যরা যদি এই মর্মে প্রস্তাব গ্রহণ করে যে উক্ত রাজ্যের বিধানপরিষদ তুলে দেওয়া হোক অথবা প্রবর্তন করা হোক, তাহলে পার্লামেণ্ট ঐ রাজ্যে বিধানপরিষদ থাকলে তা আইন করে তুলে দিতে পারে, আর না থাকলে তা তৈরী করার জন্য আইন করতে পারে।

বিধান সভা (Legislative Assembly) ঃ বিধান সভার সদস্য সংখ্যা ষাট এর কম বা পাঁচ শতের বেশী হবে না। এই সদস্যরা রাজ্যের নির্বাচনী এলাকাগুলি থেকে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের ভিত্তিতে নির্বাচিত হবেন। কোন্ রাজ্যের বিধান সভায় কতজন সভ্য থাকবে সংবিধানে তার উল্লেখ নেই। সংবিধানে শুধু এইটুকুই বলা হয়েছে যে কোন অংগরাজ্যের সদস্য সংখ্যা পাঁচ শতের বেশী হবে না এবং ষাটের কম হবে না। এই সদস্যেরা রাজ্যের নির্বাচনী এলাকাগুলি থেকে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের ভিত্তিতে নির্বাচিত হবেন।

নির্বাচনের উদ্দেশ্যে প্রত্যেক অংগরাজ্যগুলিকে এমন কতকগুলি নির্বাচনী এলাকায় ভাগ করা হবে যাতে নাকি রাজ্যব্যাপী প্রত্যেক নির্বাচনী এলাকার জনসংখ্যার সংগে তার নির্বাচিত আসন সংখ্যার অনুপাত সমান থাকে।

প্রত্যেক আদমসুমারীর (Census) পর কোন্ রাজ্য কতগুলি নির্বাচনী এলাকায় ভাগ হবে এবং তার মোট সদস্য সংখ্যা কত হবে তা পার্লামেন্টের আইনের দ্বারা নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক উক্ত আইনের বিধান অনুসারে স্থিরীকৃত হবে।

বিধানসভার সদস্যেরা প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত হবেন। এই সাধারণ ব্যবস্থাগুলি ছাড়া, বিধানসভায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্বের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে। রাজ্যপাল যদি মনে করেন যে অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায় উপযুক্ত প্রতিনিধিত্ব পায়নি, তাহলে এই সম্প্রদায় থেকে কয়েকজন প্রতিনিধি তিনি মনোনীত করতে পারেন।

৩৩২ অনুচ্ছেদ অনুসারে আসামের উপজাতি অধ্যুষিত এলাকার তপশীলভুক্ত উপজাতিদের ছাড়া, অন্যান্য তপশীলভুক্ত বর্ণ এবং উপজাতিদের জন্য বিভিন্ন অংগরাজ্যের বিধানসভায় আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ৩৩২ (২) অনুচ্ছেদ অনুসারে আসামের স্বায়ত্তশাসিত জেলা (Autonomous districts)-গুলির জন্যও বিধানসভায় আসন সংরক্ষিত থাকবে।

বিধানসভার সদস্যদের ভারতীয় নাগরিক হতে হবে এবং অন্ততঃপক্ষে পঁচিশ বৎসর বয়স্ক হতে হবে। দেউলিয়া, বিকৃত মস্তিষ্ক ও আইন অনুসারে অযোগ্য বিবেচিত ব্যক্তিরা নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার অযোগ্য।

বিধানসভার কার্যকাল পাঁচ বৎসর। অবশ্য রাজ্যপাল তার আগেই বিধানসভা ভেংগে দিতে পারেন। বিধানসভা তার কার্যাবলী পরিচালনার জন্য একজন অধ্যক্ষ (Speaker) ও একজন উপাধ্যক্ষ (Deputy Speaker) নিয়োগ করে থাকে।

বিধান পরিষদ (Legislative Council)ঃ ভারতীয় সংবিধানের ১৬৮ অনুচ্ছেদ অনুসারে ভারতীয় ইউনিয়নের সকল অংগরাজ্যে বিধানপরিষদ নেই। কেবলমাত্র অন্ধ্রপ্রদেশ, বিহার, মধ্যপ্রদেশ, মাদ্রাজ, মহারাষ্ট্র, মহীশূর, পাঞ্জাব, উত্তর প্রদেশ এবং পশ্চিম বাংলায় বিধানপরিষদ আছে।

সংবিধানের ১৭২ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, কোন রাজ্যের বিধানপরিষদের সদস্য সংখ্যা উক্ত রাজ্যের বিধানসভার সদস্য সংখ্যার এক-তৃতীয়াংশের বেশী হবে না, অবশ্য বিধানপরিষদের মোট সদস্য সংখ্যা চল্লিশ জনের কমও হবে না। ১৭১ (২) অনুচ্ছেদ অনুসারে পার্লামেণ্ট আইনের দ্বারা অন্য কিছু ঠিক না করা পর্যন্ত বিধানপরিষদ নিম্নলিখিতভাবে গঠিত হবে ঃ

(i) সমগ্র সদস্য সংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ সদস্য স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানগুলি, যথা—মিউনিসিপ্যালিটি, জেলাবোর্ড প্রভৃতি দ্বারা নির্বাচিত হবে।

(ii) এক-দ্বাদশাংশ সদস্য গত তিন বৎসর বা তার আগে যাঁরা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট হয়েছেন তাঁদের দ্বারা নির্বাচিত হবেন।

(iii) এক-দ্বাদশাংশ সদস্য অন্ততঃপক্ষে তিন বৎসর মাধ্যমিক বিদ্যালয় বা তদপেক্ষা উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতায় নিযুক্ত আছেন এমন ব্যক্তিদের দ্বারা নির্বাচিত হবেন।

(iv) এক-তৃতীয়াংশ সদস্য বিধানসভার সদস্যরা এমন ব্যক্তিদের মধ্য হতে নির্বাচিত করবেন যারা বিধানসভার সদস্য নন্।

বাকী সদস্যেরা রাজ্যপাল কর্তৃক সাহিত্য বিজ্ঞান, কলা, সমবায় সংগঠন (Co-operative movement) এবং সমাজসেবায় বিশেষ জ্ঞান অথবা বাস্তব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের মধ্য থেকে মনোনীত হবেন।

বিধানপরিষদের সদস্যদের ভারতীয় নাগরিক এবং অন্ততঃ ত্রিশ বৎসর বয়স্ক হতে হবে। এটি একটি স্থায়ী পরিষদ এবং এর এক-তৃতীয়াংশ সদস্য প্রত্যেক দু বছর অন্তর অবসর গ্রহণ করেন। বিধানপরিষদ নিজের সদস্যদের মধ্যে থেকে একজন সভাপতি (Chairman) এবং একজন সহ-সভাপতি (Deputy Chairman) নির্বাচিত করেন।

বিধানপরিষদে পশ্চিমবাংলায় মোট সদস্য সংখ্যা পঁচাত্তর জন।

বিধান পরিষদের যৌক্তিকতা (Utility of Legislative Council) ঃ

রাজ্যের আইনসভার দুটি কক্ষের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না। বিশেষ করে পশ্চিমবাংলার মত সমস্যাসংকুল রাজ্যে। রাজ্য আইনসভার নিম্নতন কক্ষগুলি যথার্থ প্রতিনিধিমূলক সংস্থা হলেও, প্রাপ্ত বয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচন পরিচালিত হওয়ায় অনেক সময় যোগ্য ব্যক্তিদের নির্বাচিত হওয়া সম্ভব হয় না। তাই পরোক্ষ নির্বাচনের ভিত্তিতে উর্ধ্বতন কক্ষে প্রতিনিধি গ্রহণের ব্যবস্থা থাকলে অনেক সময় জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিদের রাজ্যের আইন-প্রণয়ন ব্যাপারে সাহায্য গ্রহণ করা সম্ভব হয়। তাছাড়া, কোন বিল দুটি কক্ষের আলোচনার মাধ্যমে পাশ হওয়ার বিধান থাকায় বিলটিকে ধীরভাবে এবং নানা দৃষ্টিভংগী থেকে বিচার করা সম্ভব হয়। এই পদ্ধতির ফলে অপেক্ষাকৃত অধিক সময় ব্যয় হওয়ায় জনমতও নিজেকে প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠিত করতে পারে।

পশ্চিমবাংলার মত ক্ষুদ্র রাজ্যে এই জাতীয় কক্ষ বজায় রাখার অর্থ কিছুটা অতিরিক্ত ব্যয়ভার বহন করা সন্দেহ নেই, কিন্তু এই সমস্যাসংকুল রাজ্যে বিভিন্ন স্বায়ত্তশাসনশীল প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী এবং শিক্ষকতা কর্মে ব্রতী বিভিন্ন সম্প্রদায় থেকে সদস্য আসায় অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় জটিল ও সংখ্যাধিক সমস্যাগুলি সমাধানের ক্ষেত্রে উচ্চতর বিভিন্ন চিন্তাধারার সমন্বয়ের সাহায্য গ্রহণ করা যেতে পারে।

বিধানপরিষদ কর্তৃক বিল পুনর্বিবেচনার প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করে অনেকে বলেন যে, বর্তমান সংবিধানে রাজ্যপাল কর্তৃক বিল সংরক্ষণের এবং বিধানসভা কর্তৃক পুনর্বিবেচনার জন্য ফেরত পাঠানর ব্যবস্থা থাকায় বিধানপরিষদের দ্বারা বিল পুনর্বিবেচনার প্রয়োজনীয়তা কমে গিয়েছে। বিতর্কমূলক বিলকে রাজ্যপাল বিধানসভায় ফেরৎ পাঠালে এই পরিষদ তা নতুন করে বিচার করার সুযোগ পাবে এবং জনমতও তখন নিজেকে প্রকাশ করার সুযোগ পাবে। এমত অবস্থায় বিধানপরিষদ অর্থহীন। এ যুক্তির সারবত্তা স্বীকার করে নিলেও, আমাদের মানতে হবে যে বিধানসভার নির্বাচন পদ্ধতি প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে হওয়ায় অনেক সময় অনেক যোগ্য ব্যক্তি এই নির্বাচন দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হতে চান না অথচ দেশের সেবায় তাঁদের চিন্তিত অভিমতের প্রয়োজনীয়তা আছে। একমাত্র আইনসভার উচ্চতন কক্ষেই তাঁদের পরোক্ষ নির্বাচন বা মনোনয়নের মাধ্যমে রাজ্য সরকার তাঁদের সুচিন্তিত অভিমতের সুযোগ নিতে পারে। পশ্চিমবাংলা আইনসভার উভয় কক্ষের আলোচনা ও বিতর্ক সংবাদপত্রের পাতায় লক্ষ্য করলে আমরা অনেক সময় দেখতে পাই যে বিধানপরিষদের সদস্যেরাই অধিকতর যুক্তি ও তথ্যপুর্ণ আলোচনার সাহায্যে পরিষদের অধিবেশনকে অধিকতর প্রাণবন্ত করে তোলেন। আর একটি বিশেষ কারণে বিধানপরিষদের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করতে হয়। সংবিধানের নিয়ম অনুসারে মন্ত্রীসভার সদস্যদের আইনসভার সদস্য হতে হয়। অনেক সময় মন্ত্রীসভায় এমন ব্যক্তিদের গ্রহণ করতে হয় যাঁদের যোগ্যতা ও গুণাবলী অনস্বীকার্য; কিন্তু বিধানসভার সদস্য তাঁরা নাও হতে পারেন। এমতঅবস্থায় তাঁদের সহজে বিধানপরিষদের সভ্য করে নিয়ে মন্ত্রীসভায় রাখা যেতে পারে। এই সুযোগের জন্যই পশ্চিমবাংলার এক সংকটজনক সময়ে বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন মন্ত্রীসভায় এক গুরুত্বপুর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

রাজ্যের আইনসভার ক্ষমতা এবং বিধানসভা ও বিধানপরিষদের মধ্যে সম্বন্ধ (Powers of the State Legislature and relation between the two Houses of the Legislature) :

সংবিধানে উল্লেখিত তিনটি তালিকার মধ্যে রাজ্যের আইনসভা রাজ্য তালিকা (State List) এবং যুগ্ম তালিকার (Concurrent List) অন্তর্ভুক্ত বিষয়বস্তুগুলির উপর আইন প্রণয়ন করতে পারে। তবে যুগ্ম তালিকার বিষয়ের উপর আইন তৈরী করতে গিয়ে রাজ্য আইনসভার কোম আইনের সংগে কেন্দ্রীয় আইনসভার কৃত আইনের যদি বিরোধ বাঁধে তাহলে রাজ্যের আইনের অসংগতিপূর্ণ অংশ বাতিল হয়ে গিয়ে কেন্দ্রের আইনটিই চালু হবে। তাছাড়া, ব্যবসা বাণিজ্যের উপর বাধানিষেধ সংক্রান্ত অথবা হাইকোর্টের এক্তিয়ার ক্ষুণ্ণ হতে পারে এমন কোন আইন প্রণীত হলে রাষ্ট্রপতির অনুমতি নেওয়া আবশ্যক। সংবিধানের নিয়মানুসারে কোন রাজ্যের শাসন-ব্যবস্থা পরিচালনা অসম্ভব হলে যদি রাষ্ট্রপতি জরুরী অবস্থা ঘোষণা করেন তাহলে সেক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় পার্লামেণ্ট রাজ্য তালিকাভুক্ত যে কোন বিষয়ের উপর আইন তৈরী করতে পারে। কেন্দ্রীয় আইন সভার দুটি কক্ষ—লোকসভা এবং রাজ্যসভা সমান ক্ষমতাসম্পন্ন। কোন একটি বিল পাস করার ব্যাপারে মতানৈক্য ঘটলে উভয় পদিষদের যুগ্ম অধিবেশনের সংখ্যাধিক্যে বিলটির চূড়ান্ত ভাগ্য নির্ধারিত হয় কিন্তু ক্ষমতার দিক থেকে একমাত্র অর্থ-সংক্রান্ত বিলের ক্ষেত্র ছাড়া, উভয়ে সমান ক্ষমতাসম্পন্ন। কিন্তু অংগরাজ্যের আইনসভার দুটির কক্ষের মধ্যে উচ্চতন কক্ষ অর্থাৎ, বিধানপরিষদ—সাধারণ এবং অর্থ-সংক্রান্ত এই উভয় প্রকার বিল পাস করার ব্যাপারে নিম্নতন কক্ষ অর্থাৎ, বিধানসভার চাইতে কম ক্ষমতাশালী।

বিধানসভা ও বিধান পরিষদের সম্বন্ধ

কোন সাধারণ বিল আইনসভার দুটি কক্ষের মধ্যে যে কোন কক্ষে উপস্থাপিত হতে পারে। অর্থ-সংক্রান্ত বিল কেবলমাত্র বিধানসভাতেই উত্থাপিত হবে, বিধানপরিষদে নয়। সাধারণ বিল বিধানসভায় পাস হওয়ার পর তাকে বিধানপরিষদে পাস হওয়ার জন্য পাঠাতে হবে। বিধানপরিষদ বিলটি অনুরূপভাবে পাস করলে কোন অসুবিধাই থাকে না। কিন্তু বিধানপরিষদ অনুরূপভাবে পাস না করে যদি (১) সেটি অগ্রাহ্য করে বা (২) বিলটি পাবার পর সেটিকে পাস না করে তিন মাসের অধিক সময় কাটিয়ে দেয় অথবা

(৩) এমন কোন সংশোধনী প্রস্তাব পাস করে যাতে বিধানসভা সম্মত নয়, তাহলে বিধানসভা সেই একই অথবা পরবর্তী অধিবেশনে বিধানপরিষদের সংশোধনী প্রস্তাব সহ অথবা ব্যতিরেকে সেটিকে পাস করতে পারে। এই ভাবে পাস হওয়ার পর বিলটিকে পুনরায় বিধানপরিষদে পাঠিয়ে দিতে হবে। এইবার বিলটি যদি পুনরায় বিধান পরিষদ কর্তৃক অগ্রাহ্য হয় অথবা এমন কোন সংশোধনী প্রস্তাব গ্রহণ করে যাতে বিধানসভা সম্মত নয়, অথবা বিলটি উত্থাপিত হওয়ার পর কিছু না করে এক মাসের বেশী সময় কাটিয়ে দেয়, তাহলে বিলটি বিধানসভা কর্তৃক দ্বিতীয় বারে যে ভাবে পাস হয়েছে, সেইভাবে আইনসভার উভয় কক্ষ কর্তৃক পাস হয়েছে বলে ধরে নেওয়া হবে।

অর্থ-সংক্রান্ত বিল বিধানসভাতেই উত্থাপিত হয়। অর্থাৎ, বিধান পরিষদে এই বিল উত্থাপন করা যায় না। কোন অর্থ-সংক্রান্ত বিল বিধান সভায় পাস হওয়ার পর সেটিকে বিধানপরিষদে তার সুপারিশের জন্য প্রেরণ করা হয়। বিধানপরিষদকে এই বিলটি প্রাপ্তির ১৪ দিনের মধ্যে বিধান সভায় তার সুপারিশসহ প্রেরণ করতে হয়। যদি বিধানপরিষদ ঐ সময়ের মধ্যে বিলটি প্রেরণ না করে তাহলে উভয় কক্ষ কর্তৃক সেটি পাশ হয়েছে বলে ধরে নেওয়া হয়। ঐ সময়ের মধ্যে যদি বিধানপরিষদ তার মতামত সহ বিলটিকে প্রেরণ করে তাহলেও বিধানসভা সেই মতামতকে গ্রহণ করতে বাধ্য নয়। অন্যভাবে বলা যেতে পারে যে, বিধানসভা বিধানপরিষদ কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত বিল পাস করতে পারে।

বাৎসরিক আয়-ব্যয় সংক্রান্ত বিবরণ রাজ্যপালের নির্দেশ ক্রমে অর্থমন্ত্রী বিধান সভায় উপস্থাপিত করেন। এই বিবরণে কতকগুলি ব্যয় থাকে যেগুলি বিধান সভার ভোট সাপেক্ষ নয়। বিধানসভা তা নিয়ে আলোচনা করতে পারে কিন্তু ভোট দিতে পারে না। এগুলিকে Expenditures charged on the Consolidated Fund of the State বলা হয়। রাজ্যপালের বেতন ও ভাতা, স্পীকারের বেতন ও ভাতা, পরিষদের সভাপতির বেতন ও ভাতা, ঋণের উপর সুদ ইত্যাদি খরচগুলি এই ব্যয়ের অন্তর্গত। বাকী অধিকাংশ খরচা বিধানসভার অনুমোদন সাপেক্ষ। রাজ্যপালের অনুমোদন ব্যতিরেকে কোন ব্যয় বরাদ্দের দাবী উত্থাপন করা যায় না। স্বভাবতঃই এই অধিকার মন্ত্রীসভার সদস্যেরাই ভোগ করেন।

কোন বিল রাজ্য আইনসভার উভয় কক্ষে পাস হওয়ার পর সেটিকে রাজ্যপালের নিকট তাঁর সম্মতির জন্য প্রেরণ করা হয়। রাজ্যপাল তাতে সম্মতি দিতে পারেন, আবার নাও দিতে পারেন। রাজ্যপাল সম্মতি না দিলে সেটিকে রাজ্য আইনসভার পুনর্বিবেচনার জন্য ফেরত দিতে পারেন। তবে বিলটি যদি পুনরায় আইনসভার উভয় কক্ষ কর্তৃক পাস হয় তবে তিনি তাতে সম্মতি দিতে বাধ্য থাকেন। রাজ্যপাল রাষ্ট্রপতির বিবেচনার জন্য কোন বিল সংরক্ষণও করতে পারেন।

মন্ত্রীসভাকে নিয়ন্ত্রিত করা আইনসভার আর এক কাজ। রাজ্য মন্ত্রী-সভার সদস্যেরা যৌথভাবে বিধানসভার কাছে দায়ী থাকেন। বিধানসভা মন্ত্রীসভাকে প্রশ্ন করে, পরিপূরক প্রশ্ন করে অথবা তাদের তরফ থেকে প্রস্তাবিত বিষয় প্রত্যাখ্যান করে অথবা ক্ষেত্র বিশেষে মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব এনে এই দায়িত্ব আদায় করে নিতে পারে।

কিভাবে বিল আইনে পরিণত হয় (How a bill is passed in the state Legislature) ঃ

সংবিধানের ১৯৬ অনুচ্ছেদ অনুসারে অর্থ সংক্রান্ত বিল ছাড়া, অন্য বিল আইনসভার যে কোন কক্ষে উত্থাপিত হতে পারে। কোন বিল উত্থাপিত হওয়ার সংগে সংগে সেটি সরকারী গেজেটে প্রকাশিত হয় এবং পরে সেটি জনমত সংগ্রহের জন্য অথবা কোন সিলেক্ট কমিটিতে (Select Committee) প্রেরণ করা হয়। অবশ্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে Select Committee-তেই প্রেরণ করা হয়ে থাকে। সিলেক্ট কমিটি বিলটি বিবেচনার পর তাদের বিবরণ দাখিল করলে বিলটির ধারা ও উপধারা নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা হয়। শেষবারের পর্যায়ে বিলটির মূলনীতি নিয়ে আলোচনা হওয়ার পর বিলটিকে অপর কক্ষে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। অপর কক্ষেও বিলটিকে নির্ধারিত নিয়ম অনুসারে পাস হতে হয়। তবে এই প্রসংগে উল্লেখযোগ্য যে বিধানপরিষদ বিধানসভার মত অনুরূপভাবে বিলটিকে গ্রহণ না করে যদি সেটিকে অগ্রাহ্য করে বা সেটিকে পাবার পর তিন মাসের বেশী সময় কাটিয়ে দেয় অথবা এমন কোন সংশোধনী প্রস্তাব পাস করে যাতে বিধানসভা সম্মত নয় তাহলে বিধানসভা পুনরায় সেটিকে মূল অথবা সংশোধিত আকারে পাস করতে পারে। এইভাবে পাস হওয়ার পর বিলটিকে পুনরায় বিধানপরিষদে পাঠিয়ে দেওয়া

হয়। এবার যদি বিলটি পুনরায় বিধানপরিষদ কর্তৃক অগ্রাহ্য হয় অথবা বিধানসভার মত এর বিরুদ্ধে কোন সংশোধনী প্রস্তাব পাস করে অথবা কোন কিছু না করে এক মাসের বেশী সময় কাটিয়ে দেয় তাহলে বিলটি বিধানসভা কর্তৃক দ্বিতীয়বার যেভাবে পাস হয়েছে সেইভাবে আইনসভার উক্ত কক্ষ কর্তৃক পাস হয়েছে বলে ধরে নেওয়া হবে।

উভয় কক্ষ কর্তৃক পাস হওয়ার পর বিলটিকে রাজ্যপালের সম্মতির জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হয়। রাজ্যপালের সম্মতি ব্যতিরেকে কোন বিল আইনে পরিণত হতে পারে না। রাজ্যপাল বিষয়টিকে (১) সম্মতি দিতে পারেন, (২) না দিতে পারেন অথবা (৩) পুনর্বিবেচনার জন্য আইনসভার কাছে পাঠিয়ে দিতে পারেন অথবা (৪) রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য সংরক্ষিত করতে পারেন। কোন সাধারণ বিল যদি রাজ্যপাল আইনসভায় পুনর্বিবেচনার জন্য ফেরত পাঠান এবং সেটি পুনরায় যদি আইনসভায় পাস হয় তাহলে তিনি তাতে সম্মতি দিতে বাধ্য থাকবেন। কোন বিল রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য সংরক্ষিত হলে রাষ্ট্রপতির সম্মতি না পেলে সেটি আইনে পরিণত হবে না।

অর্থসংক্রান্ত বিল পাস করার পদ্ধতি এবং সরকারের আয়-ব্যয়ের উপর রাজ্য আইনসভার নিয়ন্ত্রণ :

অর্থ সংক্রান্ত বিল রাজ্যপালের অনুমোদন ব্যতিরেকে বিধানসভায় উত্থাপন করা যায় না। তাই মন্ত্রীপরিষদই এই ব্যাপারে একচেটিয়া ক্ষমতা ভোগ করে। কোন বিল অর্থ সংক্রান্ত বিল কিনা সেটি বিচার করার চূড়ান্ত ক্ষমতা বিধানসভার স্পীকারের। তাছাড়া, অর্থ সংক্রান্ত বিল বিধানপরিষদে উত্থাপন করা যায় না। এই বিল বিধানসভাতেই উত্থাপন করতে হয়।

প্রত্যেক আর্থিক বৎসরের প্রারম্ভে রাজ্যপাল একটি আয় ব্যয়ের আনুমানিক হিসাব (Annual financial Statement) পেশ করান। রাজ্যপালের নামে অর্থমন্ত্রী এই বাজেট পেশ করেন। বাজেটের মধ্যে কতকগুলি খরচ আছে যেগুলি বিধানসভার ভোটের উপর নির্ভর করে না। এগুলিকে Expenditures charged on the consolidated fund of the state বলা হয়। রাজ্যপালের বেতন ও ভাতা, বিধানসভার অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষের বেতন ও ভাতা, বিধানপরিষদের সভাপতি ও সহ-সভাপতির বেতন ও ভাতা, হাইকোর্ট ও পাবলিক সারভিস কমিশনের সদস্যদের বেতন ও ভাতা,

রাজ্যসরকারের ঋণ বাবদ সুদ ইত্যাদি এই খরচের অন্তর্গত। বিধানসভা এই খরচগুলি নিয়ে আলোচনা করতে পারে তবে ভোট দিতে পারে না। বাকী সমস্ত খরচা বিধানসভার ভোটের উপরই নির্ভরশীল। বিধানসভায় মঞ্জুর হওয়ার পর সেটি বিধানপরিষদের মতামতের জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হয়। বিধানপরিষদকে এক্ষেত্রে তার মতামত ১৪ দিনের মধ্যে জানাতে হবে। ১৪ দিনের মধ্যে না জানালে বিলটি উভয় সভা কর্তৃক পাস হয়েছে বলে ধরে নেওয়া হবে। তাছাড়া, বিধানপরিষদ উক্ত সময়ের মধ্যে যে মতামত জ্ঞাপন করে বিধানসভা তা গ্রহণ করতেও বাধ্য নয়। বিধানসভা বিধানপরিষদের সংশোধন বা সুপারিশ অগ্রাহ্য করে মূল আকারে বিলটিকে পাস করতে পারে। ব্যয় বরাদ্দ মঞ্জুর হওয়ার পর সেগুলিকে একটি বিলের আকারে বিধিবদ্ধ করা হয়। এই বিলটিকে Appropriation Bill বলা হয়। Appropriation Bill আনুষ্ঠানিক ভাবে আইনে রূপান্তরিত হওয়ার পর একত্রীভূত তহবিল থেকে তার বিধান অনুসারে বিভিন্ন খাতে অর্থ ব্যয় করা যেতে পারে।

এখানে দেখা গেল যে আয়-ব্যয়ের ব্যাপাবে বিধানসভাই সমস্ত ক্ষমতার অধিকারী, বিধানপরিষদের এক্ষেত্রে বিশেষ ক্ষমতা নেই। তবে এই প্রসংগে উল্লেখযোগ্য যে, আয়-ব্যয়ের ব্যাপারে বিধানসভার নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা আজকাল নিছক অনুষ্ঠানে পর্যবসিত হয়েছে। রাজনৈতিক দলপ্রথা উদ্ভবের সংগে সংগে আইনসভার সদস্যেরা তাদের দলের নেতৃস্থানীয় মন্ত্রীমণ্ডলীর নির্দেশেই পরিচালিত হন। অর্থ-সংক্রান্ত বিল উত্থাপনের ব্যাপারে রাজ্যপালের অনুমতি প্রয়োজন হওয়ায় মন্ত্রীসভার সদস্যেরাই এই ব্যাপারে একচেটিয়া অধিকার ভোগ করেন। অর্থ সংক্রান্ত কোন বিল আটক করা মন্ত্রীমণ্ডলীর বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রকাশেরই নামান্তর মাত্র। সংখ্যাগরিষ্ঠ দল অত্যন্ত স্বাভাবিক কারণেই এই পন্থা অনুসরণ করেন না। বাস্তবক্ষেত্রে এই প্রথা গড়ে উঠলেও সংবিধানের নিয়মের দিক থেকে আয়-ব্যয়ের উপরে বিধানসভার নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা সুস্পষ্ট। বাস্তব দিক থেকে বিচার করলে দেখা যায় যে অর্থ সংক্রান্ত বিল অথবা বাজেট একবারে নাকচ না করলেও বিধানসভার সদস্যেরা সাধারণ ভাবে আয়-ব্যয়ের সমালোচনা করে থাকেন। তাছাড়া, বিধানসভার ব্যয় সংক্রান্ত কমিটির রিপোর্টও বিধানসভার বিবেচনার্থে তা অধিবেশনে উপস্থাপিত করতে হয়। এই সমস্ত কারণে বিধানসভার সংবিধানগত নিয়ন্ত্রণ কেবলমাত্র শুষ্ক অনুষ্ঠান বলে মনে করলে ভুল করা হবে।

হাইকোর্ট (High Court):

সংবিধানের ২১৪ অনুচ্ছেদ অনুসারে প্রত্যেক রাজ্যের জন্য একটি করে হাইকোর্ট (High Court) থাকবে। প্রত্যেক হাইকোর্টের একজন প্রধান বিচারপতি (Chief Justice) থাকবেন। এঁদের সংখ্যা সময় সময় রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নির্ধারিত হবে। প্রত্যেক বিচারপতি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হবেন।

নিয়োগ ও অপসারণ

এই নিয়োগের ক্ষেত্রে তিনি সংশ্লিষ্ট রাজ্যের রাজ্যপাল, ভারতের প্রধান বিচারপতি এবং সংশ্লিষ্ট রাজ্যের প্রধান বিচারপতির সংগে পরামর্শ করবেন। হাইকোর্টের বিচারপতি ৬০ বৎসর বয়স পর্যন্ত স্বপদে অধিষ্ঠিত থাকবেন। সংবিধানের ১২৪ অনুচ্ছেদের (৪) ধারায় সুপ্রীমকোর্টের বিচাবপতিদের যেভাবে অপসারিত করা হবে বলে বর্ণনা করা হয়েছে, হইকোর্টের বিচারপতিরাও সেইভাবে অপসারিত হবেন। এই অনুচ্ছেদ অনুসারে সুপ্রীমকোর্টের বিচারপতিদের অসদাচরণ (misbehaviour) এবং অকর্মণ্যতার (incapacity) জন্য পার্লামেণ্ট এক বিশেষ সংখ্যাধিক্যে রাষ্ট্রপতির কাছে আবেদন (address) জানালে তাঁর আদেশক্রমে সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিদের অপসারিত করা যেতে পারে। হাইকোর্টের বিচারপতিদের অপসারণের ক্ষেত্রেও এই একই নিয়ম প্রযোজ্য।

কোন ব্যক্তিকে হাইকোর্টের বিচারপতি হতে হলে তাঁকে ভারতের নাগরিক হতে হবে এবং ভারতের কোন নিম্ন আদালতে অনন্তঃ দশ বৎসরকাল বিচারক হিসেবে কাজ করতে হবে অথবা অন্ততঃ দশ বৎসরকাল কোন হাইকোর্টে অ্যাডভোকেট (advocate) হিসেবে কাজ করতে হবে।

প্রত্যেক রাজ্যের দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলার চুড়ান্ত আপীল আদালত হচ্ছে হাইকোর্ট। কলকাতা, বোম্বাই এবং মাদ্রাজ হাইকোর্টের মূল (original) বিভাগও আছে। এই বিভাগের প্রত্যেক হাইকোর্টের সংশ্লিষ্ট এলাকার অন্যান্য বিচারালয় এবং ট্রাইবুন্যালগুলিকে পরিচালনা ও নির্দেশ দেবার ক্ষমতা আছে। ২২৬ অনুচ্ছেদ অনুসারে সংবিধানের তৃতীয় পরিচ্ছেদে বর্ণিত মৌলিক অধিকারগুলির প্রয়োগ (enforcement) করার জন্য অথবা অন্যান্য সংশ্লিষ্ট উদ্দেশ্যে হেভিয়াস.(*Habeas Corpus*), ম্যানডামাস (*Mandamus*), কুয়োওরাণ্টো (*Quowarranto*), সারটিওরি (*Certiorai*) প্রভৃতি আদেশনামা জারী করার অধিকারও থাকবে। ২২৮ অনুচ্ছেদ অনুসারে হাইকোর্ট যদি মনে করেন যে নিম্নতন কোর্টে বিচারকালীন কোন মামলায় সংবিধানের ব্যাখ্যা

সংক্রান্ত কোন প্রশ্ন জড়িত আছে তাহলে সেই মামলাকে উক্ত কোর্ট থেকে তুলে এনে নিজে বিচার করতে পারে।

অন্যান্য নিম্ন আদালত (Subordinate Courts) :

অন্যান্য নিম্ন আদালতগুলিকে দু'ভাগে দেখান যেতে পারে: (১) দেওয়ানী আদালত (Civil Courts) এবং ফৌজদারী আদালত (Criminal Courts)। গ্রামের পঞ্চায়েতী আদালত নিম্নতন কোর্ট। বর্তমানে পঞ্চায়েত প্রথায় অঞ্চল পঞ্চায়েতগুলির অন্যতম কর্তব্য হচ্ছে ন্যায়-পঞ্চায়েত গঠন করা ও পরিচালনা করা। বর্তমানে সমস্ত অঞ্চল-পঞ্চায়েতকে অবশ্য এই ক্ষমতা দেওয়া হয় নি। ন্যায়-পঞ্চায়েতগুলি ছোট ছোট দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলার বিচার করতে পারে। দেওয়ানী মামলার পঞ্চায়েতী আদালতের উর্ধ্বতন আদালত হচ্ছে মুনসেফের আদালত। মুনসেফী আদালত দুই এবং ক্ষেত্র-বিশেষে তিন হাজার টাকা মূল্যের সম্পত্তির বিবাদ সংক্রান্ত মামলার বিচার করতে পারে। প্রত্যেক জেলার সদর, মহকুমা ও চৌকীতে মুনসেফী আদালত আছে। মুনসেফী আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে সব-জজের (Sub-Judge) আদালতে আপীল করা চলে। সব-জজ এবং অ্যাডিশনাল জজেদের আপীল সংক্রান্ত ভিন্ন মূল মামলার বিচারের ক্ষমতাও আছে। ছোট ছোট মামলার বিচারের জন্য কলকাতা, মাদ্রাজ ও বোম্বাই সহরে ছোট আদালত (Small cause Court) আছে।

গ্রাম্য এলাকায় ছোট ছোট ফৌজদারী মামলা বিচারের ক্ষমতা ন্যায়-পঞ্চায়েতের উপর ন্যস্ত হয়েছে। বড় ধরনের ফৌজদারী মামলার বিচার জেলার সদর অথবা মহকুমায় অবস্থিত ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে হয়। ম্যাজিস্ট্রেটদের ক্ষমতা অনুসারে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয়—এই তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। ম্যাজিস্ট্রেটেব আদালত গুরুতর ফৌজদারী মামলাগুলিকে দায়রা জজের (Sessions Judge) আদালতে সোপর্দ করেন। গুরুতর মামলার ক্ষেত্রে প্রথমে দায়রা জজের কোর্টেও আবেদন করা চলে। ফৌজদারী মামলায় দায়রা বা জেলাজজ অপরাধীকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করলে তার জন্য হাইকোর্টের অনুমোদন প্রয়োজন হয়। খুন, অগ্নিসংযোগ ইত্যাদি গুরুতর মামলার বিচারের ক্ষেত্রে দায়রা জজকে সাহায্য করার জন্য জুরীর সাহায্য গ্রহণ করা হয়। কলকাতার মত বড় বড় সহরে ফৌজদারী মামলার বিচারের জন্য প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত আছে।

ফৌজদারী ও দেওয়ানী মামলার জন্য জেলার সর্বোচ্চ আদালত হচ্ছে জেলা জজের আদালত। তিনি সব জজদেব সাহায্যে দেওযানী সংক্রান্ত বিচার পবিচালনা করেন। সম্পত্তির মূল্য অনুসাবে প্রথমেই জেলাজজের আদালতে বিচার কবা হয়। ক্ষেত্রবিশেষে মুনসেফী আদালতের রাযের বিরুদ্ধেও জেলা জজেব আদালতে আপীল কবা চলে। জেলাজজ ফৌজদাবী মামলায দাযরা জজ হিসেবেও কাজ করতে পারেন। সহকারী দাযরা জজদের সাহায্যে জেলাজজ ম্যাজিস্ট্রেটদের আদালত থেকে প্রেরিত মামলার বিচার করতে পারেন।

শাসনবিভাগ থেকে বিচারবিভাগের পৃথকীকরণ (Separation of Judiciary from Executive):

শাসনবিভাগ থেকে বিচারবিভাগেব পৃথকীকরণ গণতন্ত্র তথা নাগরিক অধিকারের অন্যতম রক্ষাকবচ বলে বিবেচিত হয়। আমাদের সংবিধানে রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশাত্মক নীতির অন্তর্গত ৫০ অনুচ্ছেদে শাসনবিভাগ থেকে বিচারবিভাগেব পৃথকীকবণেব প্রচেষ্টার কথা বলা হযেছে। এই পৃথকীকরণ সম্পূর্ণভাবে সম্ভব না হলেও, কোন কোন রাজ্যে ইতিমধ্যেই এই মর্মে কাজ শুরু হযেছে। মাদ্রাজ রাজ্যে ম্যাজিস্ট্রেটদেব বিচার ও শাসন সংক্রান্ত কাজ পৃথক করা হযেছে। বিচার সংক্রান্ত কাজেব জন্য ম্যাজিস্ট্রেটদের আইনজ্ঞ হতে হয় এবং তাদের হাইকোর্টের নিয়ন্ত্রণাধীনে রাখা হযেছে। শাসন সংক্রান্ত ম্যাজিস্ট্রেটদের রাজ্যসরকারের অধীনে বাখা হয়েছে। তাছাড়া অন্ধ্রপ্রদেশ, গুজরাট, কেরালা, মহারাষ্ট্র এবং মহীশূরেও এই পৃথকীকরণের কাজ এগিযে চলেছে।

কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল (Union Territories):

রাজ্য পুনর্গঠন কমিটির সুপারিশ অনুসারে মূল অংগরাজ্যগুলির শ্রেণীবিভাগ তুলে দিয়ে পার্লামেণ্ট ১৯৫৬ সালে যে আইন [*The constitution* (Seventh Amendment) Act] পাস করে, তার ফলে এগুলির দুটি শ্রেণীকরণ হয়: যথা, রাজ্য (State) এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল (Union Territories)।

বর্তমানে সংবিধানেব প্রথম তালিকায নয়টি কেন্দ্রশাসিত (Union Territories) অঞ্চলের উল্লেখ আছে। এগুলি হচ্ছে: (১) দিল্লী, (২) হিমাচল প্রদেশ, (৩) মণিপুর, (৪) ত্রিপুরা, (৫) আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ (৬) লাক্ষাদ্বীপ, মিনিকয় এবং আমিনিদিপি দ্বীপপুঞ্জ, (৭) দাদরা এবং নগর হাভেলি, (৮) গোয়া, দমন, দিউ এবং (৯) পণ্ডিচেরী।

সংবিধানের ২৩৯ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, এই অঞ্চলগুলির শাসনব্যবস্থা রাষ্ট্রপতি তাঁর নিযুক্ত শাসনকর্তার মাধ্যমে পরিচালিত করবেন (Save as otherwise as provided by Parliament by law, every Union Territory shall be administered by the President acting, to such extent, as he thinks fit, through an administrator to be appointed by him with such designation as he may specify.)। এই অনুচ্ছেদের পরের ধারায় বলা হয়েছে যে রাষ্ট্রপতি কোন পার্শ্ববর্তী রাজ্যের রাজ্যপালকেও এই উদ্দেশ্যে নিয়োগ করতে পারেন এবং সেক্ষেত্রে তিনি তাঁর মন্ত্রীসভা ব্যতিরেকে কাজ করবেন।

২৩৯এ অনুচ্ছেদে পার্লামেণ্ট হিমাচল প্রদেশ, মণিপুর, ত্রিপুরা, গোয়া, দমন, দিউ ও পণ্ডিচেরীর জন্য আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্যে নির্বাচিত অথবা আংশিক ভাবে মনোনীত এবং আংশিক ভাবে নির্বাচিত সংস্থা সৃষ্টি করতে পারেন। তাছাড়া, এই অনুচ্ছেদে পার্লামেণ্টকে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের জন্য মন্ত্রীপরিষদ অথবা আইনসভা এবং মন্ত্রীপরিষদ—এই উভয় প্রকার সংস্থাকেও সৃষ্টিকরার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। ১৯৬২ সালের সংবিধানের চতুর্দশ সংশোধনী আইনের [*Constitution* (Fourteenth Amendment) Act 1962] দ্বারা উক্ত অংশটুকু সংযোজিত হয়েছে।

লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, চতুর্দশ সংশোধনী আইনের দ্বারা দিল্লীর জন্য কোন স্বতন্ত্র আইন সভা গঠন করা হয়নি। পূর্বে ১৯৫৬ সালের একটি আইনের দ্বারা হিমাচল প্রদেশ, মণিপুর এবং ত্রিপুরার জন্য একটি করে Territorial Council ছিল। প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে এই Territorial Councilগুলির নির্বাচন হত। Territorial Council-এর সদস্যরা তাঁদের মধ্য থেকে একজন সভাপতি (Chairman) এবং সহ-সভাপতি (Vice-Chairman) নিযুক্ত করতে পারত। প্রত্যেক Territorial Council-এর Administrator কর্তৃক একজন প্রধান কার্যনির্বাহক (Chief Executive officer) নিয়োগের ব্যবস্থা করা হয়। তিনিই পদাধিকার বলে উক্ত Territorial Council-এর সম্পাদক (Secretary)। Territorial Council-এর কাজ ছিল অনেকটা আজকের দিনের জেলাবোর্ডের মত। রাস্তাঘাট নির্মাণ এবং রক্ষণাবেক্ষণ করা, যানবাহন পরিচালনা করা, স্কুল, হাসপাতাল, ঔষধ বিতরণ কেন্দ্র, বাজার, মেলা, খোঁয়াড়, বিশ্রামাগার, জল

সরবরাহ, বাঁধ প্রভৃতির নির্মাণ করা ও পরিচালনা করা এর অন্যান্য কর্তব্যগুলির অন্যতম। এই সমস্ত কাজের জন্য Territorial Councilগুলিকে প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহের ক্ষমতাও দেওয়া হয়েছিল।

রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের জন্য একজন শাসক থাকবেন। Territorial Council-এর সভাপতি এই সংস্থার অধিবেশনের প্রস্তাবসমূহ তাঁকে জ্ঞাত করাবেন। তিনি এই সভায় যোগ দিতে পারেন এবং প্রয়োজন বোধে এদের প্রস্তাবকে নাকচ করে আদেশ জারী করতে পারেন।

২৪০ অনুচ্ছেদ অনুসারে (১) আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ (২) লাক্কা দ্বীপ, মিনিকয় এবং আমিনিদিবি দ্বীপপুঞ্জ (৩) দাদরা এবং নগর হাভেলী (৪) গোয়া, দমন, দিউ এবং (৫) পণ্ডিচেরীর শান্তি, উন্নতি এবং উত্তম শাসনব্যবস্থার জন্য রাষ্ট্রপতি নিয়ম তৈরী করতে পারেন। অবশ্য ২৩৯এ অনুচ্ছেদ অনুসারে গোয়া, দমন, দিউ এবং পণ্ডিচেরীর জন্য কোন আইনসভা সৃষ্টি হলে রাষ্ট্রপতি এই অঞ্চলগুলির জন্য পূর্বোক্ত উদ্দেশ্যে কোন নিয়ম সৃষ্টি করবেন না।

জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য (The State of Jammu and Kashmir)ঃ

জম্মু ও কাশ্মীরের সংবিধান আলোচনা করতে হলে তার ঐতিহাসিক পটভূমিকাটি আমাদের একটু আলোচনা করা দরকার।

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট ভারতের স্বাধীনতা লাভ করার সময় জম্মু ও কাশ্মীর ভারতে যোগদান করেনি। এই সময়ের পর এক উপজাতীয় সৈন্যদল পাকিস্থানের সাহায্য পেয়ে কাশ্মীর আক্রমণ করে এবং এই রাজ্যের বেশ কিছু অংশ দখল করে নেয়। এই সৈন্যদল যখন শ্রীনগরের কাছাকাছি এগিয়ে আসে তখন কাশ্মীর সরকার অনন্যোপায় হয়ে ভারতের কাছে সাহায্যের জন্য আবেদন জানায় এবং ভারতীয় সৈন্যদল এই আক্রমণকারী সৈন্যদলকে বেশ কিছু দূর হটিয়ে দেয়। এই সময় কাশ্মীর সরকার ভারত সরকারের সাথে একটি চুক্তিপত্রে (Instrument Accession) আবদ্ধ হয়। এই চুক্তির শর্ত অনুসারে কাশ্মীরের দেশরক্ষা, বৈদেশিক ব্যাপার এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা ভারত সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন হয়। ভারত সরকার এই সময় পাকিস্থানের কাশ্মীর আক্রমণের বিরুদ্ধে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের স্বস্তি পরিষদে আবেদন জানায়। ইতিমধ্যে ১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারী ভারতের নতুন সংবিধান চালু হয়। এই সংবিধানে জম্মু ও কাশ্মীরকে ভারতের অংগ

রাজ্যের মধ্যে গণ্য করা হলেও কাশ্মীরের জটিল এবং অনিশ্চিত রাজনৈতিক অবস্থার জন্য তাকে অন্যান্য রাজ্যের চাইতে পৃথক স্থান দেওয়া হয়। অবশ্য সংবিধানের প্রথম অনুচ্ছেদে বর্ণিত প্রথম তালিকায় ভারতের অন্যান্য রাজ্যের সংগে জম্মু ও কাশ্মীর স্থান পেয়েছে। তাছাড়া, সংবিধানের ৩৭০ অনুচ্ছেদে জম্মু ও কাশ্মীরের ক্ষেত্রে আইনপ্রণয়ন সংক্রান্ত বিধানাবলী লিপিবদ্ধ করা হয়েছে এবং এগুলি জম্মু এবং কাশ্মীরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

সংবিধানের বিধান অনুসারে জম্মু ও কাশ্মীরের সংবিধান রচনার জন্য একটি নির্বাচনের অনুষ্ঠান হয় এবং ১৯৫১ সালের ৩১শে অক্টোবর তারিখে এই গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন বসে। এই পরিষদ জম্মু ও কাশ্মীরের জন্য একটি পৃথক পতাকা গ্রহণ করে কিন্তু এর অন্যান্য আলোচ্য বিষয়বস্তু নিয়ে ভারতের সংগে মতদ্বৈধ উপস্থিত হওয়ায় ১৯৫২ সালের জুলাই মাসে শেখ আবদুল্লার নেতৃত্বে একটি কাশ্মীর প্রতিনিধি দলের সংগে ভারত সরকারের প্রতিনিধিদের একটি চুক্তি হয়। এই চুক্তি ভারতের পার্লামেণ্ট ও কাশ্মীর গণপরিষদ কর্তৃক সমর্থিত হয় এবং ভারতের রাষ্ট্রপতি ১৯৫৪ সালের মে মাসে একটি আদেশ জারী করেন। এটিকে *Constitution* (Application to Jammu and Kashmir) *order 1954* বলা হয়। এই আদেশের বলে আমাদের সংবিধানের কোন্ কোন্ অংশটুকু জম্মু ও কাশ্মীরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে বা কি কি ব্যতিক্রম থাকবে তার উল্লেখ করা হয়। ইতিমধ্যে জম্মু ও কাশ্মীর তার সংবিধান তৈরী করে এবং ১৯৫৭ সালের ২৬শে জানুয়ারী তারিখ থেকে তা চালু হয়।

এই সংবিধানের ৩ ধারায় জম্মু ও কাশ্মীরকে ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে ঘোষণা করা হয়েছে (The State of Jammu and Kashmir is and shall be an integral part of the Union of India)। জম্মু ও কাশ্মীরের অধিবাসীদের ভারতের নাগরিক হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। এই রাজ্যের প্রধানকে সদর-ই-রিয়াসৎ বলে ঘোষণা করা হয়েছে। তিনি এই অধিকার বলে ভারতের রাষ্ট্রপতি কর্তৃক স্বীকৃত হবেন। এই রাজ্যের একটি মন্ত্রীপরিষদ থাকবে এবং তারা যৌথভাবে আইন সভার কাছে দায়ী থাকবে। আইন সভার সদস্যরা প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত হবেন। মোটামুটি এই বিধানগুলি ছাড়া এই সংবিধানে কতকগুলি মৌলিক অধিকার এবং রাজ্য পরিচালনায় নির্দেশাত্মক নীতিও স্থান পেয়েছে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

কেন্দ্র এবং অংগরাজ্যের সম্পর্ক

(Relation between the Union and the States)

আইন-প্রণয়ন সংক্রান্ত সম্পর্ক (Legislative relations between the Union and the States) :

যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতা বণ্টনের ক্ষেত্রে আমরা প্রধানতঃ দুটি নীতি অনুসৃত হতে দেখতে পাই। প্রথমতঃ, কেন্দ্রীয় আইনসভার ক্ষমতাগুলি উল্লেখ করে; সংশ্লিষ্ট অংগরাষ্ট্রগুলির ক্ষমতা অনুল্লেখিত অবস্থায় থাকতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং অষ্ট্রেলিয়ায় এই নীতি অনুসৃত হয়। অপরপক্ষে অংগরাষ্ট্রগুলির ক্ষমতাগুলি উল্লেখ করে, কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতাগুলি অনুল্লেখিত অবস্থায় রাখা যেতে পারে। কেবল কানাডায় এই দ্বিতীয় নীতিটি অনুসৃত হয়।

ভারতের ক্ষেত্রে একটি পৃথক নীতি অনুসৃত হয়েছে। ক্ষমতা বণ্টনের জন্য এখানে তিনটি তালিকা আছে; যথা—কেন্দ্রীয় তালিকা (Union List), রাজ্যের তালিকা (State List) এবং যুগ্ম তালিকা (Concurrent List)। কেন্দ্রীয় আইনসভা কেন্দ্রীয় তালিকা বা Union List-এর অন্তর্ভুক্ত বিষয়-গুলির উপর আইন প্রণয়ন করবে, রাজ্য আইনসভাগুলি রাজ্যতালিকা বা State List-এর অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলির উপর আইন প্রণয়ন করবে আর কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য—এই উভয় আইনসভাই যুগ্ম-তালিকা বা Concurrent List-এর অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলির উপর আইন প্রণয়ন করবে।

এই তিনটি তালিকায় উল্লিখিত বিষয়গুলি বিস্তৃত আকারে লিপিবদ্ধ হয়েছে। কেন্দ্রীয় পার্লামেণ্টের ক্ষমতা শুধুমাত্র এই তালিকার মধ্যে সীমাবদ্ধ করা হয়নি। ঐ তিনটি তালিকায় উল্লিখিত হয়নি এমন কোন বিষয়ের উপর আইন প্রণয়ন করতে হলে কেন্দ্রীয় আইনসভার তার উপর আইন-প্রণয়নের অধিকার থাকবে। পার্লামেণ্ট এবং রাজ্য আইনসভার আইনের মধ্যে কোন অসংগতি থাকলে রাজ্যর আইনের অসংগতিপুর্ণ অংশটুকু বাতিল হয়ে কেন্দ্রের আইনটিই বলবৎ হবে। ২৪৯ অনুচ্ছেদ অনুসারে যদি রাজ্য সভা দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যক উপস্থিত সদস্যের ভোটে এই মর্মে প্রস্তাব গ্রহণ

করে যে জাতীয় স্বার্থে পার্লামেণ্ট রাজ্যতালিতার অন্তর্ভুক্ত কোন এক বিষয়ের উপর আইন প্রণয়ন করুক, তাহলে পার্লামেণ্ট তার উপর আইন প্রণয়ন করতে পারবে। এই প্রস্তাব প্রথমে এক বৎসর কাল বলবৎ থাকবে এবং পরে এর কার্যকাল আরও এক বছরের জন্য বাড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে। এই প্রস্তাব অনুসারে প্রণীত আইন প্রস্তাবের কার্যকাল গত হওয়ার পর ছ'মাস পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।

২৫২ অনুচ্ছেদ অনুসারে দুই বা ততোধিক আইনসভার সমস্ত কক্ষ যদি তাদের এক্তিয়ারভুক্ত বিষয়ের উপর আইন প্রণয়নের জন্য পার্লামেণ্টকে অনুরোধ করে প্রস্তাব গ্রহণ করে, তাহলে উক্ত রাজ্যগুলির জন্য সেই বিষয়ে পার্লামেণ্ট আইন প্রণয়ন করতে পাবে। পরে প্রস্তাব গ্রহণ করে অন্য যে কোন রাজ্য এই আইন গ্রহণ করতে পারে। এই ধরনের আইন কেবলমাত্র পার্লামেণ্টের দ্বারাই সংশোধিত বা প্রত্যাহৃত হতে পারে।

সংবিধানের দশম অধ্যায়ে বর্ণিত বিধান অনুসারে জরুরী অবস্থাকালীন পার্লামেণ্ট ২৫০ অনুচ্ছেদ অনুসারে সারা ভারত অথবা তার যে কোন অংশের জন্য রাজ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলির উপরও আইন তৈরী করতে পারে।

২৫৩ অনুচ্ছেদ অনুসারে কোন আন্তর্জাতিক সন্ধি বা চুক্তিকে কার্যকরী করার জন্য পার্লামেণ্ট যে কোন বিষয়ের উপর আইন প্রণয়ন করতে পারে।

আইন প্রণয়নের ক্ষমতা বণ্টন (Distribution of Legislative Powers) ঃ

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের ২৪৬ অনুচ্ছেদে তিনটি তালিকার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলি হচ্ছে : (১) কেন্দ্রীয় তালিকা (Union List) (২) রাজ্য তালিকা (State List) এবং যুগ্ম তালিকা (Concurrent List)। কেন্দ্রীয় তালিকার (Union List) অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলির উপর আইন প্রণয়ন করবে কেন্দ্রীয় পার্লামেণ্ট। রাজ্য তালিকার (State List) অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলির উপর আইন তৈরী করবে রাজ্যের আইনসভা এবং যুগ্ম তালিকার অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলির উপরে আইন তৈরী করবে কেন্দ্রীয় ও রাজ্যের উভয় আইনসভা। এই তালিকা তিনটি সংবিধানের সপ্তম

তালিকায় (Seventh Schedule) বর্ণিত হয়েছে। কেন্দ্রীয় তালিকার অন্তর্ভুক্ত বিষয় মোট ৯৭টি। এগুলির মধ্যে দেশরক্ষা, নৌ-সৈন্য ও বিমানবাহিনী, বৈদেশিক সম্পর্ক, ইউ. এন. ও, যুদ্ধ ও শান্তি, রেলপথ, ডাক ও তার, মুদ্রা, বিদেশী ঋণ, ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা, আন্তরাজ্য গমনাগমন (Inter-State migration), আয়কর, কর্পোরেশন ট্যাক্স, সম্পত্তি কর (Estate duty), উত্তরাধিকার কর (Duties in respect of Succession to property), সংবাদপত্রের উপর কর প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

কেন্দ্রীয় তালিকা

রাজ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত বিষয় ৬৬টি। এদের মধ্যে শান্তি-শৃংখলা (Public order), পুলিস, সুপ্রীম কোর্ট ও হাইকোর্ট ছাড়া বিচার ব্যবস্থা, জেলখানা, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা, জনস্বাস্থ্য, শিক্ষা, কেন্দ্রীয় তালিকার অন্তর্ভুক্ত ছাড়া অন্যান্য যোগাযোগ ব্যবস্থা, খোঁয়াড়, বন, মৎস, ওজন ও মাপ, সরাইখানা, রাজ্য সরকারের গৃহ ও গৃহ নির্মাণ সংক্রান্ত বিষয়, ভূমি রাজস্ব, কৃষি, বিক্রয়কর, জীবিকা, ব্যবসা ও বৃত্তির উপর কর প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

রাজ্য তালিকা

যুগ্ম তালিকার অন্তর্ভুক্ত বিষয় হচ্ছে ৪৭টি। এগুলির মধ্যে ফৌজদারী আইন (Criminal Law), ফৌজদারী আইনের পদ্ধতি (Criminal procedure), বিবাহ ও বিবাহ-বিচ্ছেদ সংক্রান্ত আইন, আইন ও চিকিৎসা সংক্রান্ত বৃত্তি, গুরুত্বপুর্ণ পরিসংখ্যা (Vital Statistics), কতকগুলি বিশেষ ক্ষেত্রে ব্যবসা বাণিজ্য মূল্য নিয়ন্ত্রণ, বিজলী, সংবাদপত্র, বই ও প্রেস, স্ট্যাম্প ডিউটি (Stamp duty), সম্পত্তির অধিকার ও গ্রহণ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

যুগ্ম তালিকা

প্রশাসন-সংক্রান্ত সম্পর্ক (Administrative Relations):

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা বলতে এক রাষ্ট্রনৈতিক কাঠামোর মধ্যে দুটি পৃথক শ্রেণীর সরকারের অস্তিত্বকে বুঝায়। দুটি পৃথক শ্রেণীর সরকারের মধ্যে শুধুমাত্র ক্ষমতা বণ্টনের দ্বারাই এই শাসনব্যবস্থার সাফল্য নির্ভর করে তা নয়, কেন্দ্র ও সংশ্লিষ্ট অংগরাজ্যগুলির মধ্যে সুষ্ঠু প্রশাসনিক সম্পর্কের উপরেও এর উৎকর্ষতা অনেকাংশে নির্ভরশীল।

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকারের আইনগুলিকে প্রয়োগ করার জন্য ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতি অনুসৃত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কেন্দ্রীয় সরকারের নিজস্ব প্রশাসনিক সংগঠনের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় আইনগুলিকে চালু করে। ওয়েমার সংবিধানের আমলে সংশ্লিষ্ট অংগরাষ্ট্রগুলির প্রশাসনিক সংবিধানের সাহায্যেই কেন্দ্রীয় আইনসভা, অর্থাৎ রীচের (*Reich*)-এর আইনগুলি চালু করা হত। ভারতের ক্ষেত্রে এই উভয় প্রকার ব্যবস্থাই প্রবর্তন করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় আইনসভার আইনগুলিকে বিভিন্ন রাজ্যে চালু করার জন্য কেন্দ্রের নিজস্ব সংগঠন যেমন আছে, বিভিন্ন অংগরাজ্যের প্রশাসনিক ব্যবস্থার সাহায্যে কেন্দ্রীয় আইনকে বলবৎ করার ব্যবস্থাও তেমনি আছে।

কেন্দ্রের প্রশাসনিক ক্ষমতা কেন্দ্রীয় পার্লামেণ্টের আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রগুলির মধ্যেই পরিব্যাপ্ত। তাছাড়া, ক্ষেত্র বিশেষে যুগ্ম তালিকার অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলির মধ্যেও কেন্দ্রীয় সরকারের প্রশাসনিক ক্ষমতা বিস্তৃত হতে পারে। জরুরী অবস্থা ঘোষিত হলে কেন্দ্রের প্রশাসনিক ব্যবস্থা অংগরাজ্যের প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে কিভাবে সেখানকার শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হবে সে সম্বন্ধে যে কোন বিষয়ে নির্দেশ দিতে পারে।

সংবিধানের ২৫৬ অনুচ্ছেদ অনুসারে প্রত্যেক অংগরাজ্যের প্রশাসনিক ব্যবস্থা এমনভাবে চালু হবে যাতে তারা পার্লামেণ্ট প্রণীত আইনগুলির অনুবর্তী হয় এবং এই উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় শাসনদপ্তর সংশ্লিষ্ট অংগরাজ্যগুলিকে ভারত সরকারের বিবেচনা মত প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিতে পারবে। অন্যভাবে বলা যেতে পারে যে, প্রত্যেক অংগরাজ্যের কর্তব্য হবে তার প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে এমন ভাবে পরিচালিত করা যাতে নাকি কেন্দ্রীয় আইনসভার প্রণীত আইনগুলিকে চালু করা সম্ভব হয় এবং এতদুদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক দপ্তর অংগরাজ্যগুলিকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিতে পারবে। যখনই কেন্দ্রীয় আইনসভা কোন আইন প্রণয়ন করে তখন তাকে বাস্তবে প্রয়োগ করার জন্য ভারত সরকার একটি নিজস্ব প্রশাসনিক দপ্তর সৃষ্টি করতে পারবে অথবা তাকে প্রয়োগ করার ভার সংশ্লিষ্ট অংগরাজ্যগুলির উপর ছেড়ে দিতে পারে। কেন্দ্রীয় সরকার যে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করুন না কেন ২৫৬ অনুচ্ছেদ অনুসারে প্রত্যেক অংগরাজ্যের কর্তব্য হবে তার প্রশাসনিক সংগঠনকে এমনভাবে চালু করা যাতে তাদের নিজ এলাকায় কেন্দ্রের আইনকে প্রয়োগ করা সম্ভব হয়। শুধু তাই নয়, ২৫৭ অনুচ্ছেদে আরও বলা হয়েছে

যে, প্রত্যেক অংগরাজ্যের প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে চালু করার পক্ষে কোন বাধা সৃষ্টি না হয় এবং এতদুদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় শাসনদপ্তর সংশ্লিষ্ট অংগরাজ্যগুলিকে তার বিবেচনা মত প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিতে পারবে। এগুলি ছাড়া, জাতীয় অথবা যুদ্ধসংক্রান্ত ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগ ব্যবস্থা নির্মাণ বা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার অংগরাজ্যগুলিকে প্রশাসনিক নির্দেশ দিতে পারে। ভারত সরকার নিজেও সৈন্যবাহিনী, নৌবাহিনী এবং বিমান বাহিনীর জন্য যোগাযোগ ব্যবস্থা নির্মাণ বা রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারেন। কোন এক অংগরাজ্যের রেলপথ সংরক্ষণের জন্য কেন্দ্র উক্ত রাজ্যকে প্রশাসনিক নির্দেশ দিতে পারে। ২৫৮ অনুচ্ছেদ অনুসারে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রশাসনিক ক্ষমতার ক্ষেত্রেও রাষ্ট্রপতি কোন এক অংগরাজ্যকে তার সম্মতি নিয়ে শর্তসাপেক্ষ অথবা বিনা শর্তে ক্ষমতা অর্পণ করতে পারেন। তাছাড়া, অংগরাজ্যের এক্তিয়ারভুক্ত নয় এমন বিষয়েও পার্লামেণ্ট আইন প্রণয়ন করে অংগরাজ্যকে ক্ষমতা অর্পণ করতে পারে বা বিশেষ কর্তব্য পালন করতে নির্দেশ দিতে পারে। অবশ্য একপ ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারকে প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত ব্যয়ভার বহন করতে হবে। অপরদিকে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতি নিয়ে রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারকে রাজ্যের এক্তিয়ারভুক্ত বিষয় সম্পর্কে ক্ষমতা অর্পণ করতে পারে।

বিভিন্ন অংগরাজ্যের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া এবং আলোচনার ভিত্তিতে সুষ্ঠু প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার উপরেও যুক্তরাষ্ট্রের সাফল্য অনেকাংশে নির্ভর করে। ২৬২ অনুচ্ছেদে নদী অথবা নদীর উপত্যকাকে কেন্দ্র করে অংগরাজ্যের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হলে তার সুষ্ঠু সমাধানের জন্য পার্লামেণ্টকে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া, ২৬৩ অনুচ্ছেদে বিভিন্ন অংগরাজ্যের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হলেও রাষ্ট্রপতি সে সম্বন্ধে অনুসন্ধান এবং পরামর্শ দেবার জন্য পরিষদ গঠন করতে পারেন। বিভিন্ন অংগরাজ্য অথবা কেন্দ্রীয় সরকার এবং অংগরাজ্যের স্বার্থ সংযুক্ত এমন যে কোন বিষয়ে রাষ্ট্রপতি প্রয়োজন মনে করলে এই জাতীয় পরিষদ গঠন করতে পারেন।

পরিশেষে উল্লেখযোগ্য যে, ৩৬৫ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, কেন্দ্রীয় সরকারের আইনসম্মত নির্দেশ কোন রাজ্যসরকার পালন করতে অক্ষম হলে উক্ত রাজ্যে সাংবিধানিক নিয়ম অনুসারে শাসনকার্য পরিচালনা অসম্ভব বলে ধরে নিয়ে ৩৫৬ অনুচ্ছেদ অনুসারে রাষ্ট্রপতি প্রয়োজনীয় ঘোষণা জারী করবেন এবং

সেখানকার প্রশাসনিক ব্যবস্থা বাতিল করে দেবেন। এই প্রসংগে উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন অনুসারে কেন্দ্রের প্রশাসনিক নির্দেশ কোন প্রাদেশিক সরকার পালন করতে অক্ষম হলে তার বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ক্ষমতা প্রাদেশিক গভর্ণরদের হাতে ন্যস্ত ছিল। প্রাদেশিক গভর্ণরেরা তাঁদের বিশেষ দায়িত্বের (Special Responsibilities) সাহায্যে কেন্দ্রের নির্দেশকে কার্যকরী করতেন। বর্তমান সংবিধানে রাজ্যপালদের এই জাতীয় কোন ক্ষমতা না থাকায় সংবিধানে বিশেষ নির্দেশের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

রাজস্ব বিষয়ক সম্পর্ক (Financial Relation between the Union and the States):

রাজস্বের বণ্টন সংক্রান্ত ব্যাপারে আমাদের সংবিধানের ব্যবস্থা ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের অনুরূপ। বর্তমান ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারের আয়ের উৎসগুলিকে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে এই ক্ষেত্রে রাজস্ব আরোপ, আদায় এবং বণ্টনের ব্যাপারে একটি বিশেষ নীতি অনুসৃত হয়েছে। এমন কতকগুলি রাজস্ব আছে যেগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাপ্য। অনুরূপভাবে এমন কতকগুলি রাজস্ব আছে যেগুলি রাজ্য সরকার কর্তৃক আরোপিত এবং তার আয় সম্পূর্ণ রাজ্য সরকারের প্রাপ্য।

কেন্দ্রীয় সরকারের আয়ের প্রধান উৎস হচ্ছে: (১) রেলপথ, (২) ডাক ও তার (৩) আয়কর, (৪) আমদানী-রপ্তানি শুল্ক (৫) ব্যাংক (৬) মুদ্রা ব্যবস্থা (৫) কতকগুলি আবগারী শুল্ক (৬) কর্পোরেশন ট্যাক্স এবং (৭) সম্পদ ও সম্পত্তি কর প্রভৃতি।

রাজ্য সরকারের প্রধান আয়ের উৎসগুলি হচ্ছে: (১) ভূমি রাজস্ব (২) রাজ্য আবগারী কর (৩) বন বিভাগ (৪) বিক্রয় কর (৫) বিদ্যুৎ কর (৬) কৃষি আয়কর প্রভৃতি।

এমন কতকগুলি কর আছে যেগুলি কেন্দ্র সরকার ধার্য করে এবং আদায় করে কিন্তু আদায়ীকৃত কর রাজ্যগুলির মধ্যে ভাগ করে দিতে হয়। এগুলি হচ্ছে, কৃষি জমি ছাড়া অন্যান্য সম্পত্তির উত্তরাধিকারের উপর ধার্য কর, অকৃষি জমি ছাড়া অন্যান্য সম্পত্তির উপর আরোপিত কর (estate duty), রেলপথ বিমান বা সমুদ্রের উপর, যাত্রীদের উপর প্রান্তিক কর ('Terminal tax), সংবাদপত্র বিক্রয় ও তার বিজ্ঞাপনের উপর কর প্রভৃতি।

কতকগুলি কর আছে যেগুলি ধার্য করে কেন্দ্রীয় সরকার কিন্তু আদায় এবং ভোগ করে রাজ্য সরকার। এগুলি হচ্ছে Bill of Exchange-এর উপর দেয় স্ট্যাম্প ডিউটি, প্রসাধন দ্রব্যের উপর দেয় আবগারী শুল্ক প্রভৃতি।

কৃষি আয়কর ছাড়া, সমগ্র আয়কর কেন্দ্রীয় সরকার ধার্য করবেন এবং আদায় করবেন কিন্তু তা বণ্টিত হবে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে পাটের উপর রপ্তানী শুল্ক এই নিয়মের অন্তর্গত ছিল কিন্তু বর্তমান সংবিধানে এই আয় সম্পূর্ণ কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাপ্য। সংবিধানের ২৭৩ অনুচ্ছেদ অনুসারে কেন্দ্র আসাম, বিহার, উড়িষ্যা এবং পশ্চিম বাংলাকে পাট রপ্তানি শুল্কের পরিবর্তে আর্থিক সাহায্য (grant) করতে পারে। তাছাড়া, সংবিধানে ২৭৬ অনুচ্ছেদে কেন্দ্রীয় সরকার পার্লামেন্টের নির্দেশ অনুসারে রাজ্যসরকারগুলিকে অর্থ সাহায্য (grants-in-aid) করতে পারেন। উপজাতি এলাকার উন্নয়নকল্পে বিশেষ করে এই সাহায্য দেওয়া হয়।

২৮০ অনুচ্ছেদে পূর্বোক্ত রাজস্ব বণ্টন সংক্রান্ত নিয়মাবলী নির্ধারণের জন্য একটি অর্থ কমিশন (Finance Commission) নিয়োগের ব্যবস্থা করা হয়। এই কমিশনে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত একজন সভাপতি (Chairman) এবং চারজন সদস্য থাকবেন। কেন্দ্রীয় এবং রাজ্যসরকারের মধ্যে যে সমস্ত আয় বণ্টিত হবে বা বণ্টিত করা যেতে পারে সে সম্বন্ধে এবং বিভিন্ন রাজ্যের প্রাপ্য অংশ সম্বন্ধে রাষ্ট্রপতিকে সুপারিশ করাই এই কমিশনের কাজ। প্রথম অর্থ কমিশন ১৯৫১ সালে এবং দ্বিতীয় অর্থ কমিশন ১৯৫৬ সালে নিয়োগ করা হয়। ১৯৬০ সালের ডিসেম্বর মাসে তৃতীয় অর্থ কমিশন নিয়োগ করা হয়। এই কমিশন ১৯৬১ সালে ডিসেম্বর মাসে তার বিবরণ পেশ করে। এই কমিশনের রাজস্ব বণ্টন সংক্রান্ত প্রায় সমস্ত সুপারিশগুলি কেন্দ্রীয় সরকার মেনে নিয়েছেন।

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের স্বরূপ (Nature of Indian Federation):

ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার স্বরূপকে বুঝতে হলে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থা বলতে কি বোঝায় প্রথমে তা আলোচনা করা দরকার। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় আমরা দু' প্রকারের সরকার দেখতে পাই। একটি সংবিধান উভয়ের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন করে উভয়কেই নিয়ন্ত্রিত করে। অধ্যাপক

ডাইসের (*Dicey*) ভাষায়, "Federalism means the distribution of the force of the State among a number of co-ordinate bodies each originating in and controlled by the constitution." অপরপক্ষে, এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থায় একটিমাত্র সরকার থাকে। একটিমাত্র সরকারের প্রশাসনিক অংশ হিসেবে যে আঞ্চলিক শাসনব্যবস্থা থাকে তাদের কোন স্বাধীন আইনগত অস্তিত্ব (Independent juridical status) থাকে না। অধ্যাপক ডাইসে (*Dicey*) এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থার সংগা নির্দেশ করে বলেছেন, "Unitarism means the habitual exercise of supreme legislative authority by one central power" অর্থাৎ, এখানে কেন্দ্রীয় সরকারই সমগ্র ক্ষমতার অধিকারী। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার মত এখানে কেন্দ্রীয় ও অংগরাজ্যের শাসনব্যবস্থা সংবিধানের দ্বারা উদ্ভূত ও নিয়ন্ত্রিত হয়ে সমান আইনগত মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত নয়।

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার পূর্বোক্ত সংগার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের স্বরূপ বিশ্লেষণের চেষ্টা করব। সংবিধানের প্রথম অনুচ্ছেদে যদিও ভারতকে একটি "Union of States" বলে বর্ণনা করা হয়েছে তথাপি যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধানের মূল বৈশিষ্ট্য এতে যে বর্তমান তাতে সন্দেহ নেই। প্রথমতঃ, সংবিধান তিনটি তালিকার সাহায্যে কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক সরকারের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন করেছে এবং সংবিধানের এই নির্দেশ অনুসারে উভয় সরকারই তাদের নিজ নিজ ক্ষমতা পরিচালনা করতে বাধ্য। অংগরাজ্যের সরকারগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের প্রশাসনিক অংশমাত্র নয়। তাদের সৃষ্টি সংবিধানের দ্বারা। তাদের শাসনব্যবস্থার মূল দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে মন্ত্রীমণ্ডলীর উপর যাঁরা তাঁদের কার্যাবলীর জন্য রাজ্যের আইনসভার কাছে দায়ী। তাছাড়া, উভয়ের ক্ষমতার পরিধি বিচার করার জন্য এখানে একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতও আছে যার সিদ্ধান্ত কেন্দ্রীয় এবং অংগরাজ্য উভয় সরকারকে মেনে নিতে হবে। এদিক থেকে বিচার করলে মোটামুটিভাবে আমাদের শাসনব্যবস্থাকে আমরা যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা বলে গণ্য করতে পারি। তবে, কাঠামোর দিক থেকে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার এই বৈশিষ্ট্যগুলি বিদ্যমান থাকলেও ক্ষমতা বণ্টন, প্রশাসনিক সম্পর্ক এবং অর্থ সংক্রান্ত ক্ষমতার দিক থেকে বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখব যে, সংশ্লিষ্ট অংগরাজ্যগুলির ক্ষমতা বহুল পরিমাণে সীমিত করে

কেন্দ্রীয় সরকারকেই অধিক ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। প্রথমেই আমাদের ক্ষমতা বণ্টনের দিকটি আলোচনা করা যাক্ :

সংবিধানের ২৪৬ অনুচ্ছেদে তিনটি তালিকার (Union List, State List ও Concurrent List) উল্লেখ করে যথাক্রমে কেন্দ্রীয়, রাজ্য এবং উভয় সরকারের ক্ষমতার ক্ষেত্র উল্লেখ করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় তালিকার (Union List) অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলির উপর কেন্দ্রীয় আইনসভা অর্থাৎ পার্লামেণ্ট আইন তৈরী করবে। রাজ্য তালিকার (State List) অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলির উপর রাজ্যের আইনসভা আইন প্রণয়ন করবে এবং যুগ্ম তালিকার (Concurrent List) অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলির উপর কেন্দ্রীয় ও রাজ্য উভয় আইনসভাই আইন প্রণয়ন করবে। রাজ্য আইনসভার প্রণীত কোন আইনের বিধান কেন্দ্রীয় আইনসভায় প্রণীত কোন আইনের বিধানের সংগে অসংগতিপুর্ণ হলে কেন্দ্রীয় আইনসভার আইনটিই বলবৎ হবে এবং রাজ্য আইনসভায় আইনের অসংগতিপুর্ণ অংশটুকু বাতিল হয়ে যাবে। রাজ্য এবং যুগ্ম তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়নি এমন কোন বিষয়ের উপর আইন তৈরী করতে হলে, সেটি কেন্দ্রীয় আইনসভার আইন প্রণয়নের বিষয় হবে। তাছাড়া, নিম্নলিখিত কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় পার্লামেণ্টকে রাজ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলির উপরেও আইন প্রণয়নের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে।

(১) ২৪৯ অনুচ্ছেদ অনুসারে রাজ্যসভার দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যক উপস্থিত ও ভোটদানকারী সদস্যের ভোটে যদি এরূপ প্রস্তাব গৃহীত হয় যে জাতীয় স্বার্থের উদ্দেশ্যে পার্লামেণ্টের কোন বিষয়ের জন্য আইন প্রণয়ন করুক, তাহলে পার্লামেণ্টের উক্ত বিষয়ের উপর আইন তৈরী করা ন্যায়সংগত হবে।

(২) ২৫০ অনুচ্ছেদ অনুসারে জরুরী অবস্থায়ও পার্লামেণ্ট যে কোন বিষয়ের উপর আইন তৈরী করতে পারে।

(৩) দুই বা ততোধিক রাজ্যের আইনসভা যদি প্রস্তাব গ্রহণ করে যে পার্লামেণ্ট রাজ্যতালিকার কোন বিষয়ের উপর আইন তৈরী করুক, তাহলে পার্লামেণ্টের সেই বিষয়ের উপর আইন তৈরী করা আইনসংগত হবে। অবশ্য এই আইন শুধু মাত্র সেই রাজ্যগুলির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে।

(৪) তাছাড়া, কোন আন্তর্জাতিক সন্ধি বা চুক্তি ইত্যাদি কার্যকরী করার জন্যও কেন্দ্রীয় পার্লামেণ্ট রাজ্যতালিকার যে কোন বিষয়ের উপর আইন প্রণয়ন করতে পারে।

সুতরাং আইন প্রণয়নের ক্ষমতার বণ্টনের দিক থেকে বিচার করলে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে যে, কেন্দ্রীয় পার্লামেণ্টকেই বেশী ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে।

প্রশাসনিক ক্ষমতার দিক থেকে বিচার করলেও কেন্দ্রীয় প্রবণতার বৈশিষ্ট্য সুস্পষ্ট হয়ে পড়ে।

আমাদের সংবিধান অনুসারে রাজ্যপাল রাষ্ট্রপতির দ্বারা নিযুক্ত হন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গভর্ণর সংশ্লিষ্ট অংগরাজ্যের জনসাধারণ কর্তৃক প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হন। ক্যানাডার গভর্ণরেরা গভর্ণর জেনারেল কর্তৃক নিযুক্ত হন। সুতরাং ভারতের ক্ষেত্রে রাজ্যপালদের নিযুক্তি বিষয়ে আমরা ক্যানাডার ব্যবস্থারই অনুগামী হয়েছি। প্রশাসনিক কৃত্যকগুলির ক্ষেত্রেও সম্পূর্ণ পৃথকীকরণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে বর্তমান সংবিধানের ব্যবস্থা মোটামুটি ১৯৩৫ সালের ভারত শাসনেরই অনুরূপ। ৩১২ অনুচ্ছেদ অনুসারে কেন্দ্রীয় পার্লামেণ্ট কেন্দ্র ও অংগরাজ্যগুলির জন্য এক বা একাধিক সর্বভারতীয় কৃত্যক (All India services) সৃষ্টি করতে পারে। তাছাড়া, সংবিধান অনুসারে প্রত্যেক অংগ-রাজ্যের কর্তব্য হবে তার প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে এমনভাবে চালু করা যাতে নাকি কেন্দ্রের আইনগুলিকে চালু করা সম্ভব হয় এবং এতদুদ্দেশ্যে কেন্দ্রের প্রশাসনিক দপ্তর রাজ্য দপ্তরকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিতে পারবে। জাতীয় অথবা যুদ্ধ সংক্রান্ত ব্যাপারে, যোগাযোগ ব্যবস্থা, নির্মাণ বা রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রেও কেন্দ্রীয় সরকার অংগরাজ্যের প্রশাসনিক বিভাগকে নির্দেশ দিতে পারে। পরিশেষে উল্লেখ করা হয় যে, কেন্দ্রীয় সরকারের আইনসম্মত নির্দেশগুলি কোন রাজ্যসরকার পালন করতে অক্ষম হলে উক্ত রাজ্যে সাংবিধানিক নিয়মানুসারে শাসনকার্য পরিচালনা অসম্ভব বলে ধরে নিয়ে ৩৫৬ অনুচ্ছেদ অনুসারে রাষ্ট্রপতি প্রয়োজনীয় ঘোষণা জারী করবেন এবং সেক্ষেত্রে তিনি রাজ্যের প্রশাসনিক ব্যবস্থা বাতিল করে দিতে পারেন। সুতরাং প্রশাসনিক ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও আমাদের সংবিধানে কেন্দ্রীয় প্রবণতার দিকে ঝোঁক সুস্পষ্ট।

আর্থিক বণ্টনের দিক থেকে বিচার করলে দেখা যাবে যে অংগরাজ্যগুলিকে কেন্দ্রের উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল করা হয়েছে। কেন্দ্র এবং প্রাদেশিক

সরকারের আয়ের উৎসগুলিকে সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করে দিলেও রাজ্য-সরকারগুলিকে অপেক্ষাকৃত গুরুত্বপূর্ণ আয়ের উৎসগুলির উপর কোন এক্তিয়ার নেই। যে সমস্ত রাজস্ব কেন্দ্র এবং অংগরাজ্যগুলির মধ্যে বণ্টিত হবে বলে সংবিধানে উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলিও অর্থকমিশন (Finance Commission)-এর সুপারিশের উপর নির্ভরশীল। তাছাড়া, অংগরাজ্যগুলির আয়-ব্যয় নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের উচ্চ-পদাধিকারী নিয়ন্ত্রক এবং মহাগণনা পরীক্ষকের নিয়ন্ত্রণ সুস্পষ্ট।

আইন সংক্রান্ত ক্ষমতা বণ্টন, প্রশাসন সংক্রান্ত সম্পর্ক এবং রাজস্ব বণ্টনের বিধানগুলি লক্ষ্য করে আমরা ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রকে সম্পূর্ণ যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থা হিসেবে গণ্য করতে পারি না। অনেক লেখকেব মতে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত অংগরাজ্যগুলি এক একটি প্রশাসনিক অংগ (Administrative unit) মাত্র। অর্থাৎ এগুলিকে কোনক্রমে আদর্শ যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার অন্তর্গত যথাবিহিত মর্যাদাসম্পন্ন অংগরাজ্য হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে না। এই যুক্তিকে আমরা কোনক্রমেই মেনে নিতে পারি না। কারণ যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা বলতে আমরা বুঝি এমনই এক শাসনব্যবস্থা যেখানে লিখিত সংবিধান কেন্দ্র ও অংগরাজ্যগুলির মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন করে দেয় এবং এই বণ্টিত ক্ষমতা উভয় সরকারের মধ্যে কেউই এককভাবে পরিবর্তন করতে পারে না। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যস্থার এই মূল নীতিটি ভারতের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হয়েছে একথা আমাদের স্বীকার করতেই হবে। গণপরিষদের অন্যতম সদস্য ডাঃ আম্বেদকর যথার্থই বলেছেন, "যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার মূল নীতি হচ্ছে এই যে, কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে আইন সংক্রান্ত এবং প্রশাসনিক ক্ষমতা কেন্দ্রের সৃষ্ট কোন আইনের দ্বারা বণ্টিত হয় না—সংবিধানই এই কাজ করে থাকে। আমাদের সংবিধান এই কাজই করেছে। এই নীতিটি আমাদের সংবিধানের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, এ সম্বন্ধে কোন ভুল থাকতে পারে না। সুতরাং রাজ্যগুলিকে কেন্দ্রের অধীনে স্থাপন করা হয়েছে এ কথা বলা ভুল। কেন্দ্র নিজের ইচ্ছানুসারে এই বণ্টনের সীমারেখাকে পরিবর্তিত করতে পারে না" (The basic principle of Federalism is that legislative and executive authority is partitioned between the centre and the state not by any law to be made by the centre but by the constitution, itself. This is what the constitution does.

This is the principle embodied in our constitution. There can be no mistake about it. It is, therefore wrong to say that the states have been placed under the centre. Centre connot by its own will alter the boundary of this partition.")।

উপসংহারে আমরা বলতে পারি যে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার মূল নীতি এবং বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকলেও আমাদের শাসনব্যবস্থা চিরাচরিত এবং আদর্শ যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার অনুকরণে গঠিত হয়নি। অধ্যাপক দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষায় আমরা বলতে পারি যে, এটি একটি এককেন্দ্রিকতার দিকে ঝোঁক সম্পন্ন যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা (It is a federal in form with a pronounced unitary bias.)। স্যার আইভর জেনিংসের (Sir Ivor Jennings) ভাষায় "India has a federation with a strong centralizing tendency." অধ্যাপক হোয়ার (Wheare) ভারতকে অর্ধ-যুক্তরাষ্ট্রীয় (Quasi-federal) শাসনব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত করতে বলেন ("In the class of quasi-federal constitution it is probably proper to include Indian constitution of 1950"।

অংগরাজ্যগুলির স্বায়ত্তশাসন কিছুটা খর্ব করে কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার যাথার্থকে আমরা অস্বীকার করতে পারি না। দ্বিধাবিভক্ত ভারতের দুর্বলতাই যুগে যুগে বৈদেশিক শক্তিকে পথ দেখিয়ে এনেছে। এক্তিয়ার উদ্দিন মহম্মদ খিল্‌জি, মহম্মদ ঘোরি এবং পলাশির যুদ্ধের কলংকিত ইতিহাসের পুনরাবৃত্তির সম্ভাবনা যে কোন প্রকারেই হোক আজ আমাদের তা বন্ধ করতে হবে। প্রাদেশিকতা এবং সাম্প্রদায়িকতার নগ্ন এবং জঘন্য রূপ আজও আমাদের জাতীয় ঐক্যের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গৃহযুদ্ধের ইতিহাসের পাতায় আমাদের শিক্ষণীয় বিষয় অবশ্যই আছে। এই সমস্ত দিক চিন্তা করে জাতীয় ঐক্য এবং রাজনৈতিক সংহতি সুদৃঢ় করার প্রয়োজনীয়তায় কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থাকে যথাযথভাবে শক্তিশালী করার সারবত্তা আমরা কোনক্রমেই অস্বীকার করতে পারি না। আমাদের সংবিধানের প্রথম অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে—India, that is Bharat, shall be a Union of status। বিভিন্ন অংগরাজ্যের এই সংবিধানগত বন্ধন অবিচ্ছেদ্য এবং তা সম্পূর্ণ যুক্তিসম্মত।

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সংগে অন্যান্য কয়েকটি যুক্তরাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্যগত তুলনা (Some peculiar features of Indian federalism in relation to other federal governments) :

ভারতীয় ও অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রের তুলনা প্রসংগে প্রথমেই সংবিধানের কথা বলতে হয়। ভারতের সংবিধানে কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির শাসনব্যবস্থার সংগঠন একটিমাত্র সংবিধানেব অন্তভু ক্ত করা হয়েছে। ক্যানাডাতেও এই নীতি অনুসৃত হয়েছে। কিন্তু মার্কিন যুক্তবাষ্ট্র ও অস্ট্রেলিয়ার সংবিধান কেবলমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারের গঠন প্রণালী ও তার সংশ্লিষ্ট ক্ষমতাবলীর বর্ণনা করেছে এবং অংগরাষ্ট্রগুলি নিজ নিজ সংবিধান রচনা করেছে। প্রকৃত পক্ষে ভারত ও ক্যানাডার অংগরাষ্ট্রগুলি ছিল অল্প বিস্তব প্রশাসনিক সংগঠন মাত্র। সুতরাং এক বৃহত্তর যুক্তরাষ্ট্র সংগঠনেব উদ্দেশ্যে তাদের মধ্যে কোন চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ার প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং অস্ট্রেলিয়ার যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা কেন্দ্র ও মূল বাষ্ট্রগুলির এক চুক্তির ফলে (compact) গঠিত হয়েছে।

ক্ষমতা বণ্টনের ক্ষেত্রেও এই শাসনব্যবস্থাগুলিব মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং অস্ট্রেলিয়ার কেন্দ্রীয় সরকাবের ক্ষমতাগুলি বিবৃত (enumerated) হয়েচে এবং বাকী সমস্ত ক্ষমতা মূল রাষ্ট্রগুলি ভোগ করে। কিন্তু ভারতের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ও বাজ্য উভয় প্রকার সরকারের ক্ষমতা বিবৃত হয়েছে। তাছাডা, এই দেশগুলিতে অবশিষ্ট ক্ষমতা (residuary powers) কেন্দ্রীয় সরকারগুলিই ভোগ করে। কতকগুলি বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকাবকে রাজ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত বিষয়বস্তুগুলির উপর আইন তৈরী করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। যেমন,

(১) রাজ্যসভার দুই-তৃতীযাংশ সদস্যের উপস্থিতি ও ভোটের প্রস্তাব ক্রমে জাতীয় স্বার্থের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় আইনসভা রাজ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত বিষয়বস্তুগুলির উপর আইন তৈরী করতে পারবে।

(২) ২৫০ অনুচ্ছেদ অনুসারে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক জরুরী অবস্থা ঘোষিত হলে কেন্দ্রীয় আইনসভা রাজ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলির আইন তৈরী করতে পারে।

(৩) ২০৫ অনুচ্ছেদে দুই বা ততোধিক রাজ্যের আইনসভার অনুরোধ ক্রমে কেন্দ্রীয় আইনসভা রাজ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলির উপর আইন তৈরী করতে পারে।

(৪) কোন আন্তর্জাতিক সন্ধি বা চুক্তিকে কার্যকরী করার জন্যও কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলির উপর আইন তৈরী করতে পারে।

কেন্দ্রীয় ও রাজ্য আইনসভার অসংগতির ক্ষেত্রেও কেন্দ্রীয় আইনসভার আইনকেই বলবৎ করা হবে বলে ঘোষণা করা হয়েছে এবং রাজ্য আইনসভার অসংগতিপুর্ণ আইনটুকু সেক্ষেত্রে বাতিল হয়ে যাবে।

এই সমস্ত দিক থেকে বিচার করলে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রপ্রবণতা সুস্পষ্ট এবং সেদিক থেকে ভারতে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা বণ্টনের পদ্ধতি অনন্য।

(৫) কেন্দ্রীয় আইনসভার প্রতিনিধিত্বের দিক থেকেও ভারত ও অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে পার্থক্য লক্ষণীয়। ভারতের কেন্দ্রীয় আইনসভার উর্ধ্বতন কক্ষে অংগরাজ্যগুলি থেকে সমানসংখ্যক প্রতিনিধি প্রেরিত হয় না। কেননা রাজ্যসভায় উত্তর প্রদেশের প্রতিনিধি সংখ্যা ৩৪, ত্রিপুরার সংখ্যা মাত্র ১; কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মূল রাষ্ট্রগুলির জনসংখ্যা ও এলাকায় যথেষ্ট পার্থক্য থাকলেও, তারা সিনেটে সমানসংখ্যক প্রতিনিধি প্রেরণ করে। অস্ট্রেলিয়াতেও এই নীতি বিদ্যমান।

(৬) প্রশাসনিক ব্যবস্থার দিক থেকে বিচার করলে দেখা দেখা যায়, কেন্দ্র ও অংগরাজ্যগুলির জন্য একই সর্বভারতীয় কৃত্যক (All India Services) আছে। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে কেন্দ্র ও রাজ্যসরকারগুলি পরস্পরের প্রতিনিধিরূপে কাজ করে থাকে। এই ব্যবস্থা আদর্শ যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার ব্যতিক্রম বলেই স্বীকার করে নিতে হবে।

(৭) তাছাড়া, ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে রাজ্যপাল রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গভর্ণরেরা রাজ্যের জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত হন। ক্যানাডা ও অস্ট্রেলিয়ার গভর্ণরেরা ইংলণ্ডের রাজা বা রাণী কর্তৃক নিযুক্ত হন।

(৮) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দ্বি নাগরিকত্ব আছে—যুক্তরাষ্ট্রীয় নাগরিকত্ব এবং মূল রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব। কিন্তু ভারতের ক্ষেত্রে একটিমাত্র নাগরিকত্ব বিদ্যমান—তা হচ্ছে ভারতীয় নাগরিকত্ব।

(৯) সংবিধান পরিবর্তনের দিক থেকেও ভারতীয় পদ্ধতি লক্ষণীয়। ভারতের সংবিধানের অধিকাংশ বিধানগুলি দুষ্পরিবর্তনীয় হলেও কিছু অংশ সুপরিবর্তনীয। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের সংশোধন করতে হলে মূল রাষ্ট্রেব আইনসভাগুলিব তিন চতুর্থাংশের সম্মতিব প্রয়োজন। কিন্তু ভারতের ক্ষেত্রে আইন প্রণযন সংক্রান্ত ক্ষমতা বণ্টনের জন্য রাজ্যের আইন সভাগুলির অর্ধেক অংশেব সম্মতি প্রযোজন হয়।

সংবিধানের পরিবর্তন পদ্ধতি (Methods of Amendment) :

ভারতের সংবিধান গ্রেটব্রিটেনের সংবিধানের মত সুপরিবর্তনীয় নয়, আবাব মার্কিন যুক্তবাষ্ট্রেব স'বিধানের মত দুষ্পবিবর্তনীয়ও নয। প্রকৃতপক্ষে পরিবর্তনের ক্ষেত্রে ভারতীয সংবিধানের বিধানগুলি মধ্যপন্থী বলা যেতে পারে। আমাদেব সংবিধানে এমন কতকগুলি বিধান আছে যেগুলিকে সহজেই পরিবর্তন করা যেতে পাবে। অর্থাৎ, এই সমস্ত ক্ষেত্রে ভারতীয় পার্লামেণ্ট সাধারণ সংখ্যাধিক্যে পরিবর্তন সাধন করতে পারে। নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে পার্লামেণ্ট সাধারণ সংখ্যাধিক্যে আইন পাস করে সংবিধানগত পরিবর্তন সাধন করতে পাবে। যথা :

(১) কোন নতুন রাজ্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে অথবা তার নাম অথবা এলাকা পরিবর্তনেব ক্ষেত্রে।

(২) কোন রাজ্যের বিধানপরিষদ সৃষ্টি অথবা অপসারণের ক্ষেত্রে।

সংবিধানের অন্যান্য বিধানগুলিও অবশ্য কেন্দ্রীয় পার্লামেণ্টের দ্বারা পবিবর্তিত হতে পারে। তবে এর জন্য এক বিশেষ নিয়ম অনুসরণ করতে হবে। পার্লামেণ্টের যে কোন কক্ষ সংবিধান সংশোধনের প্রস্তাব আনতে পারে এবং প্রত্যেক কক্ষেব সদস্যদের অন্ততঃ দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতি ও ভোটদানের মাধ্যমে এবং উক্ত কক্ষের সমস্ত সদস্যের সংখ্যাধিক্যে পাস হলে সেটিকে রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হয়। রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করলে ঐ বিধানটি পরিবর্তিত হয়। সংবিধানের মৌলিক অধিকারগুলিও এই পদ্ধতির মাধ্যমে পরিবর্তিত হতে পারে।

তাছাড়া, এমন কতকগুলি বিধান আছে যেগুলি পরিবর্তন করতে হলে পার্লামেণ্টে পূর্বোক্ত পদ্ধতিতে পাস হতে হবে এবং তারপর অন্ততঃ অর্ধেক

সংখ্যক রাজ্যের আইনসভাগুলির দ্বারা সমর্থিত হতে হবে। এইভাবে পাস হয়ে রাষ্ট্রপতির সম্মতি পাওয়ার পর এই বিধানগুলি পরিবর্তিত বা সংশোধিত হতে পারবে।

এই বিষয়গুলির অন্যতম হচ্ছে—(১) রাষ্ট্রপতির নির্বাচন সংক্রান্ত নিয়মাবলী, (২) সপ্তম সিডিউলে (Seventh Schedule)-এ বর্ণিত আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত বিষয়গুলি, অর্থাৎ কেন্দ্রীয় তালিকা (Union List), রাজ্য তালিকা (State List) এবং যুগ্ম তালিকার (Concurrent List) অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলি, (৩) পার্লামেণ্টে প্রতিনিধিত্ব সংক্রান্ত বিষয়গুলি এবং (৪) সংবিধানের পরিবর্তন সংক্রান্ত নিয়মাবলী।

নির্বাচন কমিশন ও ভোটদান ব্যবস্থা (Election Commission and Electoral System):

সংবিধানের ৩২৪ অনুচ্ছেদে একটি নির্বাচন কমিশনের উল্লেখ করা হয়েছে। এই নির্বাচন কমিশনার রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নির্দিষ্ট অন্যান্য সদস্যদের নিয়ে গঠিত হবে। পার্লামেণ্ট আইন করে এঁদের চাকরির অন্যান্য শর্তাদি স্থির করে দেবে। যে পদ্ধতি এবং কারণে সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিদের অপসারিত করা যায় (অর্থাৎ অসদাচরণ এবং অযোগ্যতা) সেই ভাবেই নির্বাচন কমিশনারকে অপসারিত করা যেতে পারে। পার্লামেণ্ট ও রাজ্যের আইনসভার নির্বাচন, রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতির নির্বাচন এবং পার্লামেণ্ট ও রাজ্যের আইনসভার নির্বাচন সংক্রান্ত বিবাদের নিষ্পত্তির জন্য নির্বাচনী ট্রাইবুন্যাল (Election tribunals) নিয়োগ, তত্ত্বাবধান, নির্দেশ ও নিয়ন্ত্রণ করাই (Suprintendence, direction and control) এই কমিশনের কাজ। প্রত্যেক সাধারণ নির্বাচনের আগে নির্বাচন কমিশনকে উপরোক্ত কাজে সাহায্য করার জন্য রাষ্ট্রপতি উক্ত কমিশনের পরামর্শক্রমে আঞ্চলিক কমিশনারও (Regional Commissioners) নিয়োগ করতে পারেন।

সংবিধানের ৩২৬ অনুচ্ছেদ অনুসারে সকল প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিককে লোকসভা এবং রাজ্য বিধানসভায় নির্বাচনের অধিকার দেওয়া হয়েছে। ভোটদানের তালিকাভুক্ত সকলকে ভারতীয় নাগরিক এবং অন্ততঃ ২১ বৎসর বয়স্ক হতে হবে। অবশ্য তারা এই সংবিধানের অন্য কোন নিয়মে অথবা কোন আইনের

দ্বারা বিকৃত মস্তিষ্ক, বসবাস না করা (Nonresidence), অপরাধ এবং বে-আইনী ক্রিয়াকলাপের (Crime or corrupt or illegal practice) জন্য অযোগ্য বিবেচিত না হলে এই অধিকার ভোগ করবে।

প্রত্যেক আদমসুমারীর শেষে কোন্ নির্বাচনী এলাকা থেকে কতজন প্রতিনিধি নির্বাচিত হবেন তা ঠিক করা হয়। লোকসভা ও রাজ্যসভার সংগঠনের ক্ষেত্রে কোন্ নীতি অনুসরণ করে এই নির্বাচনী এলাকা ভাগ করা হবে তা সংবিধান নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। জনসংখ্যার সংগে প্রতিনিধি সংখ্যার আনুপাতিক সমতা বজায় রাখাই এই নীতির মূলকথা।

রাষ্ট্রভৃত্য নিয়োগ পরিষদ (Public Service Commission):

গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় জনসাধারণের প্রতিনিধি স্থানীয় মন্ত্রীসভার সদস্যরা সরকার পরিচালনার নীতিগুলি নির্ধারণ করেন এবং সেগুলিকে কার্যকরী করা হয় প্রাশাসনিক কর্মচারীদের সাহায্যে। বর্তমানে ভারতে কয়েকটি সর্বভারতীয় কৃত্যক (All India Services) আছে। এগুলির মধ্যে ভারতীয় প্রাশাসনিক কৃত্যক (Indian Administrative Service), ভারতীয় বৈদেশিক কৃত্যক (Indian Foreign Service), ভারতীয় পুলিশ কৃত্যক (Indian Police Service) প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

প্রশাসনিক ব্যবস্থার উৎকর্ষ এবং নিরপেক্ষতার জন্য রাষ্ট্রভৃত্য নিয়োগ পরিষদের গুরুত্ব উল্লেখযোগ্য। স্বজন তোষণের বিরুদ্ধে বিভাগীয় কর্মতৎপরতা ও পারদর্শীতা বজায় রাখার জন্য এক নিরপেক্ষ রাষ্ট্রভৃত্য পরিষদ গণতন্ত্রের অপরিহার্য অংগ বলে বিবেচিত হয়। আমাদের সংবিধানে ৩১৫ অনুচ্ছেদে কেন্দ্র এবং রাজ্যসরকারগুলির জন্য রাষ্ট্রভৃত্য নিয়োগ পরিষদের উল্লেখ আছে। একাধিক রাজ্যের আইন পরিষদ রাষ্ট্রপতির অনুমোদন ক্রমে একটি সংযুক্ত রাষ্ট্রভৃত্য পরিষদও নিয়োগ করতে পারে। তাছাড়া, কোন রাজ্যের রাজ্যপালের অনুরোধ ক্রমে এবং রাষ্ট্রপতির সম্মতি সাপেক্ষে কেন্দ্র রাষ্ট্রভৃত্য নিয়োগ পরিষদ উক্ত রাজ্যের রাষ্ট্রভৃত্য নিয়োগের ক্ষেত্রে সাহায্য করতে পারে।

কেন্দ্র অথবা সংযুক্ত রাষ্ট্রভৃত্য নিয়োগ পরিষদের সভাপতি (Chairman) রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন। রাজ্যভৃত্য নিয়োগ পরিষদের সভাপতি সংশ্লিষ্ট রাজ্যের রাজ্যপাল কর্তৃক নিযুক্ত হন। কেন্দ্রীয় সরকার অথবা কোন রাজ্যসরকারের অধীনে কোন কর্মে অন্ততঃ দশ বৎসর কাল নিযুক্ত আছেন এমন ব্যক্তিদের মধ্য থেকে এই পরিষদের অন্ততঃ অর্ধেক সদস্য নেওয়া হবে।

রাষ্ট্রভৃত্য নিয়োগ পরিষদের সদস্যেরা ছ' বৎসরের জন্য নিযুক্ত হন, তবে কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভৃত্য নিয়োগ পরিষদের সদস্যেরা ৬৫ বৎসর এবং সংযুক্ত রাষ্ট্রভৃত্য নিয়োগ পরিষদের সদস্যেরা ৬০ বৎসর বয়সে অবসর গ্রহণ করবেন। কেন্দ্র অথবা সংযুক্ত রাষ্ট্রভৃত্য নিয়োগ পরিষদের সদস্যরা রাষ্ট্রপতির নিকট এবং রাজ্যভৃত্য নিয়োগ পরিষদের সদস্যরা রাজ্যপালের নিকট লিখিতভাবে পদত্যাগপত্র পেশ করতে পারেন। তাছাড়া, কোন সদস্য কোন বিচারালয় কর্তৃক দেউলিয়া বলে ঘোষিত হলে অথবা নিজ পদের বাইরে কোন বেতনগ্রাহী পদে নিযুক্ত থাকলে, অথবা রাষ্ট্রপতির বিবেচনায় শারীরিক বা মানসিক দিক থেকে দুর্বল হলে অথবা কোন উচ্চ বিচারালয়ের বিবৃতিতে অসদ আচরণের দোষে দুষ্ট হলে রাষ্ট্রপতি তাঁকে সদস্যপদ থেকে অপসারিত করতে পারেন। রাষ্ট্রভৃত্য পরিষদের সদস্য সংখ্যা এবং তাঁদের চাকরির শর্তাদি কেন্দ্রের এবং সংযুক্ত পরিষদের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক এবং রাজ্যের ক্ষেত্রে রাজ্যপাল কর্তৃক নির্ধারিত হবে।

কেন্দ্র ও রাজ্যের কৃতক (Services)-গুলিতে নিয়োগের জন্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাগুলি পরিচালনা করা যথাক্রমে কেন্দ্র ও রাজ্যভৃত্য পরিষদের অন্যতম কাজ। তাছাড়া, এই পদগুলিতে নিয়োগ পদ্ধতি, পদোন্নতি, স্থানান্তরিতকরণ ইত্যাদি বিষয়ে রাষ্ট্রপতি ও রাজ্যপাল যথাক্রমে কেন্দ্র ও রাজ্যপরিষদগুলির পরামর্শ গ্রহণ করেন। ভারত অথবা রাজ্যসরকারের কোন বেসামরিক পদে নিযুক্ত ব্যক্তিদের শৃংখলা সংক্রান্ত বিষয়ে এবং তাদের উপস্থাপিত দরখাস্ত, স্মারকলিপি ইত্যাদি বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সরকারকে পরামর্শ দেওয়াও এদের অন্যতম কাজ। সরকারকে তার অধীনে সকল শ্রেণীর কর্মচারীদের কোন দাবীর ক্ষেত্রে এই পরিষদের পরামর্শ গ্রহণ করতে হয়। এই দাবী কর্মরত অবস্থায় কোন সরকারী কর্মচারীর মামলা পরিচালনার খরচ অথবা আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে অকর্মণ্য হলে পেনসন অথবা অন্যান্য দাবী সংক্রান্ত খরচের ব্যাপারে হতে পারে। সরকার এই সব ব্যাপারে পরিষদের সংগে পরামর্শ করতে না চাইলে সেই মর্মে তাকে নিয়ম তৈরী করতে হবে এবং সেই নিয়ম আইন সভার অনুমোদন সাপেক্ষ। কেন্দ্র অথবা রাজ্য রাষ্ট্রভৃত্য পরিষদকে প্রত্যেক বৎসর তাদের কাজের বিবরণ যথাক্রমে রাষ্ট্রপতি অথবা রাজ্যপালের নিকট পেশ করতে হবে এবং এই বিবরণ ও তাঁদের পরামর্শ তাঁরা গ্রহণ করতে সক্ষম না হলে তার কারণ নিজ নিজ আইন সভার (অর্থাৎ, পার্লামেণ্ট বা রাজ্যের আইনসভার) নিকট পেশ করবেন।

চতুর্দশ অধ্যায়

ভারতের রাজনৈতিক দলপ্রথা

(Party System in India)

গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাকে কার্যকরী করার জন্য রাজনৈতিক দলপ্রথার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। একই রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আদর্শে বিশ্বাসী ব্যক্তিরা তাদের আদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে জনমতকে স্বপক্ষে এনে সরকার গঠন করে তাদের আদর্শকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার চেষ্টা করে। জনসাধারণের বিক্ষিপ্ত চিন্তাধারাকে এক বিশেষ গতিপথে প্রবাহিত করার চেষ্টা করে তারা দেশের বিভিন্নমুখী সমস্যাগুলি সমাধানের পথ নির্দেশ করে। সরকারী শাসনযন্ত্রকে পরিচালনার সুযোগ পেয়ে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত দল যেমন তার পরিকল্পনাগুলিকে বাস্তবে রূপ দিতে যত্নবান হয়, তেমনি সরকারের বিরোধী দল সরকারের দোষক্রটিকে দেখিয়ে সরকারী দলকে সতর্ক এবং সাবধান করে দিয়ে জনমতকে সজাগ করে তোলে। সত্যিকারের গণতন্ত্রে তাই রাজনৈতিক দলপ্রথা অপরিহার্য।

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস (Indian National Congress) :

ভারতে বৃহত্তম রাজনৈতিক দল হল ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে এই দল সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করে।

কংগ্রেসের প্রাথমিক (primary) এবং সক্রিয় (active) উভয় প্রকার সদস্য আছে। প্রাথমিক সদস্যকে বাৎসরিক চার আনা চাঁদা দিতে হয়। পঁচিশ বা তদূর্ধ্ব বয়স্করা সক্রিয় সদস্য হতে পারে। বাৎসরিক এগার টাকা চাঁদা দিয়ে সক্রিয় সভ্য হওয়া যায়। কংগ্রেসের গ্রাম অথবা মহল্লা, মহকুমা ও জেলা পর্যায়ে সংগঠন আছে। জেলা পর্যায়ের ঊর্ধ্বতন সংগঠন হল প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি। এই সংগঠনের একজন সভাপতি, সহ-সভাপতি, সম্পাদক এবং কয়েকজন সদস্যকে নিয়ে কার্যকরী সমিতি গঠিত হয়। এর উপরে আছে সর্ব ভারতীয় সংগঠন। এই সংগঠনের একজন সভাপতি, দুজন সাধারণ সম্পাদক এবং সভাপতি কর্তৃক মনোনীত কয়েকজন সদস্যদের নিয়ে সর্বভারতীয় কংগ্রেস কার্যকরী সমিতি (Working Committee) গঠিত হয়।

আবাদী কংগ্রেসের সময় থেকে কংগ্রেস তার সমাজতান্ত্রিক আদর্শের উপর জোর দিয়ে আসছে। অর্থনৈতিক আদর্শের দিক থেকে কংগ্রেসের বর্তমান অনুসৃত নীতিকে মিশ্রিত অর্থনীতি (mixed economy) বলা যেতে পারে। পূর্ণ সমাজতন্ত্র কংগ্রেসের লক্ষ্য বলে প্রচার করলেও শান্তিপুর্ণ এবং বিবর্তনের মাধ্যমেই এই প্রতিষ্ঠান তার আদর্শকে কার্যকরী করার কথা প্রচার করে এসেছে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক, জীবনবীমা প্রভৃতি কয়েকটি ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ জাতীয়করণ সম্ভব হলেও, শিল্প ও কৃষিজ উৎপন্নের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত মালিকানার স্বত্বকেই কংগ্রেস সরকার স্বীকার করেছে। অবশ্য এই সমস্ত ক্ষেত্রে সরকারী নিয়ন্ত্রণের পরিধি দিন দিন বেড়ে চলেছে। ইস্পাত ও অন্যান্য ভারী শিল্পের ক্ষেত্রে শ্রমিকদের ন্যায়সংগত অধিকার আইনের দ্বারা স্বীকৃত হয়েছে। বিভিন্ন প্রদেশে ভূমিসংস্কার আইনের মাধ্যমে জমিদারীপ্রথা বিলুপ্ত করে কৃষক সম্প্রদায়ের অবস্থার উন্নতি বিধানের চেষ্টা করা হয়েছে। সমবায়ের ভিত্তিতে কৃষি ও কুটিরশিল্পকে নতুন করে গড়ে তোলার আদর্শকেও কংগ্রেসের অন্যতম আদর্শ বলে প্রচারিত হয়েছে। তাছাড়া, ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা কংগ্রেসের অন্যতম আদর্শ বলে প্রচারিত হয়েছে।

বৈদেশিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে কংগ্রেস আন্তর্জাতিক শান্তি এবং সহ-অবস্থানের নীতিতে বিশ্বাসী। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে কংগ্রেস বৃহৎ শক্তিদের জোট থেকে প্রভাবমুক্ত হয়ে নিরপেক্ষ নীতি অবলম্বনের পক্ষপাতী। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এই নিরপেক্ষতাকে তারা আদর্শভ্রষ্ট স্থবির নিরপেক্ষতা বলে জ্ঞান করতে রাজী নয়। এসিয়া ও আফ্রিকার ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা আন্দোলনকারী জাতিগুলির স্বপক্ষে কংগ্রেস তার নীতি ঘোষণা করেছে। কংগ্রেসের বৈদেশিক নীতির মুলকথা পঞ্চশীলের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। এগুলি হচ্ছে: প্রত্যেক রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব এবং এলাকাগত সংহতিতে পারস্পরিক শ্রদ্ধা, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যাপারে আভ্যন্তরীণ নীতিতে হস্তক্ষেপ না করা, পারস্পরিক সমতা ও সুযোগ-সুবিধা, শান্তিপুর্ণ সহ-অবস্থান এবং শান্তিপুর্ণ উপায়ে আন্তর্জাতি বিবাদের সমাধান।

ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টি (Indian Commupist Party):

রুশ সাম্যবাদের আদর্শে ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টি ১৯২৪ সালে গঠিত হয়। সোভিয়েত সাম্যবাদের অনুকরণে এদেশে শ্রেণীহীন এবং সর্বপ্রকার শোষণমুক্ত

সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করাই এই দলের আদর্শ। এই দলের মুলনীতিগুলি হচ্ছে : বিদেশী মূলধনের জাতীয়করণ, বিনা ক্ষতিপুরণে জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ, ভাষাভিত্তিক রাজ্যগঠন, শিল্পের জাতীয়করণ, বিনা খরচায় পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা এবং মহাজনদের কাছ থেকে কৃষক ও শ্রমিকদের সকল প্রকার ঋণ ব্যবস্থা রহিতকরণ।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এই দল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংগে সম্পর্ক ছেদ করার নীতিতে বিশ্বাসী। তাছাড়া, এই দল ভারতের কমনওয়েলথের সদস্যভুক্তির যৌক্তিকতা বিশ্বাস করে না। পাকিস্থান ও অন্যান্য কয়েকটি প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সংগে বন্ধুত্বপূর্ণ নীতিতে এই পার্টি আস্থাবান। তবে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের সংগে জোট বন্ধনে এই দল অধিকতর আস্থাবান। সম্প্রতি সোভিয়েত যুক্তবাষ্ট্র ও কম্যুনিষ্ট চীনের সংগে মতানৈক্য এবং ভারতে চীনা আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে এই দলের বৈদেশিক সম্পর্কের নীতিকে কেন্দ্র করে বিরাট ভাংগন ধরে গেছে। তাই চীনপন্থী কম্যুনিষ্টরা আজ সর্বভারতীয় সংগঠনের ক্ষেত্রে দুর্বল হয়ে পডেছে।

ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টির একটি কেন্দ্রীয় কার্যকরী সমিতি এবং একজন সাধারণ সম্পাদক আছে। তাছাডা, রাজ্য ও জেলা পর্যায়েও এদের শক্তিশালী সংগঠন আছে। কম্যুনিষ্ট পার্টির প্রাথমিক সংগঠনকে সেল (cell) বলা হয়। জনসাধারণের মধ্যে কম্যুনিষ্ট পার্টির নীতিকে প্রচার করার জন্য স্বল্প সংখ্যক সদস্যদের নিয়ে 'সেল' গঠিত হয়। এই দল ভারতের মধ্যে কেরালা এবং পশ্চিম বাংলায় অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী।

স্বতন্ত্র দল (Swatantra Party):

রাজা গোপালাচারীর নেতৃত্বে এই দল গঠিত হয়। অধ্যাপক রঙ্গ, মিনুমাসানী প্রভৃতি চিন্তাশীল ব্যক্তিরাও এই দলের সংগে যুক্ত আছেন। এই দল কংগ্রেসের সমাজতান্ত্রিক নীতির বিরুদ্ধে প্রচারকার্য চালাচ্ছে। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এই দল ভারতের বর্তমান জোট নিরপেক্ষতার নীতি বর্জন করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংগে সম্পর্ক দৃঢ়করণে বিশ্বাসী।

জনসংঘ (Jana Sangha):

কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় সদস্যপদ ত্যাগ করার পর ১৯৫১ সালে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে এই দল গঠিত হয়। হিন্দু মহাসভার নীতির অনুসরণে

গঠিত এই দল ডঃ শ্যামাপ্রসাদের জীবিত অবস্থায় দিল্লী, পাঞ্জাব এবং পশ্চিম বাংলায় কিছু প্রভাব বিস্তার করে। কিন্তু শ্যামা প্রসাদের মৃত্যুর পর এই দলের প্রভাব ক্রমশঃই ক্ষীণ হয়ে আসছে।

মুসলীমলীগ ও হিন্দুমহাসভা (Muslim League and Hindu Mahasava)ঃ

ভারতের রাজনৈতিক দলপ্রথার একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে দলপ্রথার উদ্ভব। কংগ্রেসের প্রতিক্রিয়াশীল দল হিসেবে ১৯০৬ সালে মুসলীম লীগ দলের উদ্ভব হয়। সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে নির্বাচনী প্রথা প্রবর্তিত হওয়ার পর এই দল ভারতের মুসলমান অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে বেশ প্রভাব বিস্তার করে। এই দলের লক্ষ্য অনুসারে ভারত ভাগ করে পাকিস্থান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ভারতীয় ইউনিয়নে এই দলের অস্তিত্ব লুপ্তপ্রায়।

মুসলিম লীগের প্রতিক্রিয়াশীল দল হিসেবে ভারতের হিন্দুমহাসভা নামে একটি রাজনৈতিক দল গড়ে ওঠে। নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে হিন্দুকৃষ্টি ও সভ্যতাকে পুনর্জীবিত করে অখণ্ডহিন্দুরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করাই এই দলের লক্ষ্য বলে ঘোষণা করা হয়েছে। এই দলের অন্যান্য নীতিগুলির মধ্যে বাধ্যতামূলক সৈনিক শিক্ষা, ব্যক্তিগত মালিকানা সম্পত্তিতে সরকারী নিয়মতন্ত্রের অপসারণ, পাকিস্তানের প্রতি যথাযোগ্য ব্যবহার (Reciprocity) প্রভৃতি অন্যতম।

ভারতে অন্যান্য সাম্প্রদায়িক দলগুলি মধ্যে রামরাজ্য পরিষদ, তপশীলী ফেডারেশন (Scheduled Castes Federation) প্রভৃতি অন্যতম।

সংযুক্ত সোসালিস্ট পার্টি (Sanjukta Socialist Party)ঃ

আচার্য নরেন্দ্রদেব ও জয়প্রকাশ নারায়ণ প্রভৃতির নেতৃত্বে ১৯৩৪ সালে কংগ্রেসের অভ্যন্তরে কংগ্রেস সোসালিস্ট পার্টির জন্ম হয়। ১৯৪৭ সালে এই দল কংগ্রেসের বাইরে একটি পৃথক দল হিসেবে কাজ করে। ১৯৫২ সালে এই দল কৃষকমজদুর প্রজা পার্টির সংগে যুক্ত হয়ে প্রজা সোসালিষ্ট পার্টি নাম ধারণ করে। এই সংযুক্তির ফলে আচার্য কৃপালিনী, ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, জয়প্রকাশ নারায়ণ, অশোক মেহতা প্রভৃতি নেতাদের নেতৃত্বে এই দল শক্তিশালী হয়। পরে জয়প্রকাশ নারায়ণ এই দলের সংগে সম্পর্ক ছেদ করেন।

বর্তমানে আচার্য কৃপালিনীও এই দলের সদস্যপদ ত্যাগ করেছেন। সম্প্রতি অশোক মেহতার নেতৃত্বে এই দলের একটি বিরাট অংশ কংগ্রেসে যোগ দিয়ে একে দুর্বল করে তুলেছে। সম্প্রতি এই পার্টি ডঃ রামমোহন লোহিয়ার নেতৃত্বে গঠিত সোসালিস্ট পার্টির সংগে যুক্ত হয়ে সংযুক্ত সোসালিষ্ট পার্টি নামে একটি নতুন দল গঠন করেছে। এই নব গঠিত দল গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রবাদে বিশ্বাসী। পররাষ্ট্র নীতির ক্ষেত্রে এই দল ভারতের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রগুলির দিকে প্রবণতার বিরুদ্ধ সমালোচনা করেন বলে মনে হয়।

ভারতের অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে বিপ্লবী সমাজতান্ত্রিক দল, বিপ্লবী কম্যুনিষ্ট দল, ফরওয়ার্ড ব্লক প্রভৃতি দলগুলির নাম উল্লেখযোগ্য। গত নির্বাচনে এই দলগুলির মধ্যে কেউই আশানুরূপ সাফল্য লাভ করতে পারেনি।

ভারতেব বর্তমান শাসনব্যবস্থায় শক্তিশালী বিরোধী পক্ষের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করে চলে না। গ্রেটব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি গণতান্ত্রিক দেশগুলিতে গণতন্ত্রের সাফল্যের পিছনে রয়েছে তাদের দ্বি রাজনৈতিক দল প্রথার অস্তিত্ব। বিভিন্ন মত, ধর্ম, আঞ্চলিক স্বার্থ ইত্যাদির কারণে ভারতে শক্তিশালী দ্বি-রাজনৈতিক দলপ্রথার উদ্ভব সম্ভব হচ্ছে না। ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এই প্রবণতা লক্ষ্য করে আমরা বলতে পারি যে, সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রায় সম আদর্শের ভিত্তিতে গঠিত দলগুলির পৃথক পৃথক অস্তিত্ব বজায় না রেখে এক বৃহৎ রাজনৈতিক দলের মধ্যে একত্রীভূত হওয়াই বোধ হয় যুক্তিযুক্ত।

উপসংহারে আমরা বলতে পারি যে উল্লেখযোগ্য বিরোধী দলের অস্তিত্বের অভাব ভারতীয় গণতন্ত্রের একটি ত্রুটি সন্দেহ নেই। তবে জাতির রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে এই অভাব পুরণ করতে সক্ষম হব এরূপ আশা আমরা করতে পারি। শিল্পসৃষ্টির ক্ষেত্রে যেমন মুলধন প্রয়োজন হয়, গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার ক্ষেত্রেও তেমনি প্রয়োজন হয় রাজনৈতিক মূলধনের। সুখ-দুঃখের ঘাত-প্রতিঘাতের মাধ্যমে জাতীয় জীবনে যে অভিজ্ঞতা এবং শিক্ষা আমরা লাভ করব, রাজনৈতিক মুলধন সৃষ্টির কাজে তা অবশ্যই আমাদের সাহায্য করবে।

পঞ্চদশ অধ্যায়

স্থানীয় শাসনব্যবস্থা

(Local Government)

স্থানীয় শাসনব্যবস্থার এলাকা হিসেবে পর্যায়ক্রমে আমরা (১) ডিভিশন (Division), জেলা, (District) ও মহকুমার নাম উল্লেখ করতে পারি। প্রত্যেক বিভাগের জন্য একজন বিভাগীয় কমিশনার থাকেন (Divisional Commissioner) থাকেন। ঐ এলাকার রাজস্ব সংক্রান্ত ব্যাপারে তত্ত্বাবধান করা তাঁর প্রধান কর্তব্য। জেলার শাসনব্যবস্থার প্রধান সরকারী কর্মচারী জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট এবং প্রতিটি মহকুমার জন্য একজন করে মহকুমা অফিসার (Sub-divisonal Officer) থাকেন।

জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট (District Magistrate):

রাজ্যের শাসনব্যবস্থার অন্যতম সংগঠন হচ্ছে জেলাগুলি। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটকে কেন্দ্র করেই এই সংগঠনের শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হয়। জেলার রাজস্ব আদায়ের কাজ থেকে শুরু করে, শান্তিরক্ষা ও জনকল্যাণ-মূলক অন্যান্য বিভাগের তদারক ও পরিচালনা সংক্রান্ত যাবতীয় দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের উপর ন্যস্ত। পুর্বে ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের লোকেরা (I. C. S.) এই পদে নিযুক্ত হতেন। বর্তমানে ভারতীয় কৃত্যকের (I. A. S.) লোকেরা এই পদে নিযুক্ত হচ্ছেন। কখনও কখনও রাজ্য-কৃত্যকের ব্যক্তিদেরও দীর্ঘ অভিজ্ঞতার পরে এই পদে নিয়োগ করা হয়।

রাজস্ব সংক্রান্ত যাবতীয় দায়িত্ব জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের উপর ন্যস্ত। অবশ্য ভূমি রাজস্বের ক্ষেত্রেই জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের দায়িত্ব সর্বাধিক। এই কর্তব্যের জন্য জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটকে জেলার সরকারী তহবিলের রক্ষক হিসেবে গণ্য করা হয়। ভূমি রাজস্বের আদায়ের যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য বর্তমানে তাঁকে ভূমি সংস্কার বিভাগের (Land Reforms Department) সংগে ঘনিষ্ট যোগাযোগ রাখতে হয়। এই কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য তাঁকে কৃষি সংক্রান্ত কাজের পরিচালনা ও তদারক করতে হয়। জেলার মধ্যে কোথাও অনাবৃষ্টির ফলে শস্যহানির সম্ভাবনা দেখা দিলে তার সংবাদ রাখা ও যথাবিহিত ব্যবস্থা অবলম্বন করা, উৎপন্ন

রাজস্ব সংক্রান্ত দায়িত্ব

ফসলের পরিমাণ সংক্রান্ত তথ্যাদি সংগ্রহ করা, অধিক ফসল ফলানর জন্য প্রয়োজনীয় প্রচার এবং কৃষকদের সরকারী পরিকল্পনা ও সাহায্যাদি যথাসময়ে জ্ঞাত ও সরবরাহ করা তাঁর অন্যতম কর্তব্য বলে বিবেচিত হয়।

রাজ্যের শান্তি ও শৃংখলা বজায় রাখাও জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের অন্যতম কাজ। এই কাজের জন্য তাঁকে জেলার পুলিসবাহিনীর সুপারিন্‌টেনডেণ্ট (Superintendent of Police)-এর সাথে যোগাযোগ রাখতে হয়। জেলায় কোন গুরুতর অপরাধ ঘটলে সে সম্বন্ধে খোঁজ রাখা এবং যথাবিহিত ব্যবস্থা অবলম্বন করাও তাঁর কর্তব্য। জেলায় শান্তিভংগের সম্ভাবনা দেখা দিলে পূর্বাহ্নেই সে সম্বন্ধে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হয়। এ সমস্ত কর্তব্য যথোপযুক্তভাবে পালন করার জন্য পুলিস বিভাগের নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের উপর অর্পিত হয়েছে।

শান্তি ও শৃংখলা সংক্রান্ত দায়িত্ব

ফৌজদারী মামলার বিচার ক্ষমতাও জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটদের দেওয়া হয়েছে। বড় ফৌজদারী মামলাগুলি প্রথমে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্টে বিচারের জন্য উপস্থাপিত হয়। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট গুরুতর মামলাগুলি বিচারের জন্য দায়রা জজের কোর্টে প্রেরণ করেন। তাছাড়া, তাঁকে জেলার অন্যান্য প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটদের কাজের তদারক ও নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। আমাদের সংবিধানে শাসনবিভাগ থেকে বিচার বিভাগের কাজের পৃথকীকরণের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু বর্তমান ব্যবস্থায় জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট একাধারে জেলার শাসক ও ফৌজদারী মামলার বিচার সংক্রান্ত ক্ষমতারও অধিকারী। এই ব্যবস্থা গণতান্ত্রিক নীতির বিরোধী। অবশ্য ভারতের কোন কোন রাজ্যে সম্পূর্ণভাবে এবং কোথাও কোথাও আংশিক ভাবে শাসনবিভাগ থেকে বিচার বিভাগের পৃথকীকরণের কাজ এগিয়ে গিয়েছে।

বিচার সংক্রান্ত ক্ষমতা

পূর্বোক্ত কর্তব্যগুলি ছাড়া, জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটকে কৃষি, সেচ, বিদ্যালয়-পরিদর্শন বিভাগ, চিকিৎসা ও সরকারী হাসপাতাল পরিচালনা সংক্রান্ত কাজের তদারকও করতে হয়। জেলার জেলা বোর্ড, মিউনিসিপ্যালিটি, ইউনিয়ন বোর্ড, পঞ্চায়েত প্রভৃতি স্বায়ত্ত-শাসনাধীন প্রতিষ্ঠানগুলির কার্যাবলীর উপর নজর রাখাও তাঁর অন্যতম কর্তব্য। জেলার সরকারী কার্যাবলীর নিয়ন্ত্রক এবং

জনকল্যাণমূলক বিভাগের পরিচালনা

অধিকর্তা হিসেবে অনেক জনকল্যাণমূলক কার্যাবলীর জন্য আহুত সভাসমিতি ও সামাজিক অনুষ্ঠানেও তাঁকে যোগ দিতে হয়।

উপসংহার

পূর্বোক্ত কর্তব্যের তালিকা থেকে বোঝা যায় যে, জেলার সমগ্র শাসনব্যবস্থার মেরুদণ্ড হচ্ছে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট। ঐ সমস্ত কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য তাঁর ধীশক্তি ও তীক্ষ্ণ বিচারশক্তির যেমন প্রয়োজন হয়, তেমনি প্রত্যুৎপন্নমতি ও কর্মতৎপরও হতে হয়। প্রকৃতপক্ষে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের কৃতিত্বের উপর জেলার সুষ্ঠু শাসনব্যবস্থা অনেকাংশে নির্ভর করে।

স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠান (Local self Governing Bodies) :

গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অবলম্বন করে। প্রকৃতপক্ষে যে সমস্ত সমস্যা স্থানীয় তার সমাধানের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং তাকে বাস্তবে রূপায়িত কবতে স্থানীয় লোকদেরই এগিয়ে আসা উচিত। কোন এক উর্দ্ধতন কেন্দ্রীয় সবকারের পক্ষে স্থানীয় সমস্যাগুলি সম্বন্ধে যথাযথভাবে অবহিত হয়ে তার সমাধানের জন্য কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করা সম্ভব তো নয়ই, উপবন্তু তা গণতন্ত্রের নীতি-বিরুদ্ধও বটে। অধ্যাপক ল্যাস্কির ভাষায় বলা যায়—

স্থানীয় স্বাযত্তশাসনেব প্রযোজনীযতা

"We cannot realise the full benefit of democratic government unless we begin by the admission that all problems are not central problems and that results of problems not central in their incidence require decision at the place and by the persons, where and by whom the incidence is most deeply felt."[1]

কোন দেশের স্থানীয় শাসনব্যবস্থাকে আমরা দুটি শ্রেণীতে ভাগ করতে পারি : যথা, গ্রাম ও নগরকেন্দ্রিক স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসনব্যবস্থা।

গ্রামে গাঁথা ভারতের শাসনব্যবস্থাকে যথার্থ গণতান্ত্রিক হতে হলে গ্রাম্য জীবনকেই কেন্দ্র করে তার ভিত্তি গড়ে তুলতে হবে। মহাত্মা

1. *Laski:* Grammar of Politics, Chapter VII.

গান্ধী যথার্থই বলেছেন, "ভারতের স্বাধীনতাকে গোড়া থেকে শুরু করতে হবে। তাই, প্রত্যেক গ্রামকে সম্পূর্ণ ক্ষমতা-সম্পন্ন গণতান্ত্রিক অথবা পঞ্চায়েতী ব্যবস্থা-সম্পন্ন হতে হবে" ("The Indian independance must begin at the bottom. Thus every village will be a republic in a panchayat having full powers.")।

প্রধানমন্ত্রী নেহেরু ১৯৪৮ সালে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন মন্ত্রীদের এক সম্মেলনে বলেন—"গণতন্ত্রকে নীচ হতে গড়ে তুলতে না পারলে উপরে তা কখনই সাফল্যমণ্ডিত হতে পাবে না ("Democracy at the top could not be a success unless it is built on the foundation from below")। ভারতের সংবিধানে চতুর্থ পরিচ্ছেদে রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশাত্মক নীতির ৫০ অনুচ্ছেদে সারা ভারতব্যাপী গ্রামপঞ্চায়েত গঠন করার ইচ্ছা ব্যক্ত হয়েছে।

বলবন্ত মেটা কমিটির স্থপারিশ

বলবন্ত রায় মেটা কমিটির সুপারিশ অনুসারে গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণের কাজ ইতিমধ্যেই কোন কোন রাজ্যে শুরু হয়েছে। এই কমিটির পরিকল্পনায় স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের ক্ষেত্রে তিনটি স্তরের (Three-tier system) কথা বলা হয়েছে। গ্রাম পর্যায়ে থাকবে গ্রামপঞ্চায়েত। স্থানীয় উন্নয়নমূলক যাবতীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন করা এবং তার জন্য স্থানীয় এলাকা থেকে প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহের ক্ষমতা এই প্রতিষ্ঠানগুলিকে দেওয়া হয়েছে।

পঞ্চায়েত সমিতি

কতকগুলি গ্রামপঞ্চায়েতকে নিয়ে ব্লক পর্যায়ে (Block level) তৈরী হবে একটি 'পঞ্চায়েত সমিতি'। এই সমিতির একজন 'প্রধান' থাকবে। এই সমিতির সংগে সংযুক্ত সরকারী বিশেষজ্ঞদের নিয়ে এই সমিতি তার অন্তর্গত বিভিন্ন সমিতিগুলিকে সাহায্য এবং নিয়ন্ত্রিত করবে।

জেলা পরিষদ

'মুখ্য প্রধানের' নেতৃত্বে জেলা পর্যায়ে থাকবে একটি জেলা পরিষদ। এই পরিষদের অন্তর্ভুক্তি বিভিন্ন সমিতিগুলিকে পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে পরিচালিত করা এবং এই পর্যায়ের সংগে যুক্ত সরকারী বিশেষজ্ঞদের দিয়ে এগুলিকে সাহায্য করাই হচ্ছে এই পরিষদের অন্যতম প্রধান কর্তব্য।

স্থানীয় শাসনব্যবস্থার তিনটি পর্যায়ের এই সংস্থাগুলি শুধুমাত্র গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণের আদর্শকেই কার্যকরী করবে না—পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অন্তর্গত সংশ্লিষ্ট স্থানীয় পরিকল্পনাগুলিকে প্রণয়ন করে তাদের বাস্তবে রূপায়িত করার কাজেও এদের সাহায্য অপরিহার্য বলে মনে করা হয়। পরিকল্পনা কমিশনের (Planning Commission) পরিকল্পনা মূল্যায়ণ সংস্থার (Programme Evaluation Organisation) মতে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বিভিন্ন পরিকল্পনাগুলিকে কার্যকরী করার জন্য এই প্রতিষ্ঠানগুলিকে যথোপযুক্ত ভাবে শক্তিশালী করা উচিত। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, এই প্রতিষ্ঠানগুলি শুধু একটি আদর্শমাত্র নয়, বাস্তব প্রয়োজনীয়তার দিক থেকেও এই শ্রেণীর প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব অপরিহার্য।

প্রয়োজনীয়তা

পশ্চিম বাংলায় জেলা ও ব্লক পর্যায়ে যথাক্রমে জেলা পরিষদ ও আঞ্চলিক পরিষদ গঠনের জন্য আইন প্রণীত হলেও এই আইন এখনও কার্যকরী হয়নি। আশা করা যায়, আগামী কয়েক বৎসরের মধ্যে এই আইন সর্বত্র কার্যকরী করা সম্ভব হবে।

১৯৫৬ সালে পশ্চিম বাংলা পঞ্চায়েত আইন (West Bengal Panchayat Act) পাস হয়। এই আইন গ্রাম পর্যায়ের জন্য অঞ্চল পঞ্চায়েত এবং গ্রাম পঞ্চায়েত—এই দুই শ্রেণীর গ্রাম্য স্বায়ত্তশাসন সংস্থা তৈরী করে। এই আইনের ৩১, ৩২ ও ৩৩ ধারায় গ্রাম পঞ্চায়েতের কার্যগুলি উল্লিখিত হয়েছে। এই কাজগুলিকে (১) বাধ্যতামূলক (compulsory), (২) নির্দিষ্ট (assigned) এবং (৩) ইচ্ছামূলক (discretionary)—এই তিন ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। সংক্ষেপে বলা যেতে পারে যে, গ্রাম্য উন্নয়নমূলক, যথা—অনাময় ব্যবস্থা (sanitation), মল-ময়লা নিস্কাসন (conservancy), পয়ঃ প্রণালী, নর্দমা এবং লোককণ্টক (Public Nuisance) অপসারণ প্রভৃতি বিষয়ে ব্যবস্থা অবলম্বন করা, রাস্তাঘাট নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ, পুষ্করিণী ও জলাশয়গুলির উন্নতি বিধান, পানীয় জলের ব্যবস্থা করা, সরকারী ঋণ বণ্টনে সাহায্য করা, খাদ্যদ্রব্যের বিলি ব্যবস্থা করা প্রভৃতি গ্রাম পঞ্চায়েতের কর্তব্য। গ্রাম পঞ্চায়েতের কোন নিজস্ব আয়ের উৎস নেই। এই ব্যাপারে তাদের অঞ্চল পঞ্চায়েতের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করতে হয়। অঞ্চল পঞ্চায়েতের প্রধান

গ্রাম ও অঞ্চল পঞ্চায়েত

কর্তব্য হচ্ছে তিনটি—(১) পঞ্চায়েত ট্যাক্স আদায় করা ও তা সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতদের মধ্যে বণ্টন করা, (২) চৌকিদার, দফাদার পরিচালনা করা এবং (৩) ন্যায় পঞ্চায়েত গঠন করা। এগুলি ছাড়া, রাজ্যসরকার এই প্রতিষ্ঠানগুলির উপর এমন কর্তব্য আরোপ করে যেগুলি চালনা করা এবং রাজ্যসরকারে বর্তিয়েছে এরূপ জমিদাবী সম্পত্তি ও স্বার্থ পবিচালন (manage) করাও অঞ্চল পঞ্চায়েতের অন্যতম কর্তব্য বলে পশ্চিমবংগ পঞ্চায়েত আইনে উল্লেখ করা হয়েছে।

পশ্চিমবংগ পঞ্চাযেত আইনেব ৫৫ ধারায অঞ্চল পঞ্চাযেতের আযেব উৎস-গুলি বর্ণিত হযেছে। এগুলি হচ্ছেঃ (১) রাজ্য সবকার কর্তৃক সাধাবণ অথবা কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে যে কোন প্রকাব সাহায্য (২) জমি বা বাড়িব মালিকের উপর ধার্য কব (৩) বৃত্তি, ব্যবসা ও আইনজীবিকার উপব ট্যাক্স (৪) যান, গাড়ী প্রভৃতির উপব ফি ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া, যে সমস্ত এলাকায় চৌকিদারী চাকরাণ জমি আছে তার দরুন সবকারের কাছ থেকে চাকরাণ কব (chakran rent) বাবদ কিছু টাকা পাওযা যায়।

পঞ্চাযেত প্রথাব প্রধান ত্রুটি হচ্ছে সরকাব কতৃক প্রকৃত ক্ষমতা হস্তান্তরের অভাব। চৌকিদার, দফাদাব পরিচালনার ক্ষমতা নামে মাত্র অঞ্চল পঞ্চায়েতের উপর অর্পিত হলেও, নিযোগ ও বরখাস্তের ক্ষেত্রে এই সংস্থাব কোন ক্ষমতাই নেই। তারা শুধু পঞ্চাযেত তহবিল থেকে চৌকিদারদের বেতন দেয় মাত্র। অঞ্চল পঞ্চায়েতের করের অধিকাংশ আদায় হয় ভূমি থেকে। কিন্তু অঞ্চল পঞ্চাযেতের অধিকাংশ সদস্য এক বিশেষ ভূম্যাধিকারী শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় কর ধার্যের কাজ যথার্থ ও নিরপেক্ষভাবে হয় না। অঞ্চল ও গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে প্রয়োজনীয় সহযোগিতার অভাবে স্থানীয উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা কার্যকরী করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। অপরপক্ষে, গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি তাদের বাজেট প্রণয়নের সুপারিশ এবং উপযুক্ত সময়ে তাদের প্রাপ্য অর্থের বণ্টন ইত্যাদি ব্যাপারে অঞ্চল পঞ্চায়েতের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু অঞ্চল পঞ্চায়েতের অধিকাংশ সদস্য ইচ্ছা করলে বিশেষ বিশেষ গ্রাম পঞ্চায়েতকে অর্থের বণ্টন ব্যাপাবে অসুবিধার সৃষ্টি করতে পারে। তাছাড়া, এমন কতকগুলি উন্নয়নমূলক কাজ আছে যেগুলি গ্রাম পঞ্চায়েতের ক্ষুদ্র আর্থিক সামর্থ্যের দ্বারা যথাযথ ভাবে পরিচালিত করা সম্ভব নয়। অথচ, গ্রাম পঞ্চায়েতের উপরে বৃহত্তর সংগঠন

পঞ্চাযেত ব্যবস্থার ত্রুটি

অঞ্চল পঞ্চায়েতের কোন গঠনমূলক কাজ করার ক্ষমতা পঞ্চায়েত আইনে উল্লিখিত হয়নি।

গ্রামাঞ্চলের উন্নয়নমূলক কাজে গ্রামীণ প্রতিনিধি ও সরকারী বিশেষজ্ঞদের মধ্যে সহযোগিতার অভাব দেখা যায়। ব্লক পর্যায়ে জড়িত সরকারী বিশেষজ্ঞদের দৃষ্টিভংগী ও কর্মপ্রণালীর আমুল পরিবর্তন প্রয়োজন।

জেলাবোর্ড (District Board) ঃ

জেলায় স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠান হিসেবে জেলাবোর্ডের সৃষ্টি হয়। এই সংস্থায় সদস্য সংখ্যা ৯ জনের কম ও ৩৩ জনের বেশী নয়। জেলাবোর্ডেব সদস্যরা নিজেদের মধ্য থেকে একজন সভাপতি (*Chairman*) ও কয়েকজন সহ-সভাপতি (*Vice-Chairman*) নিযুক্ত করেন। ইউনিয়নবোর্ডের তালিকাভুক্ত

সংগঠন

ভোটারবা যাঁরা অন্ততঃ ছয় আনা ট্যাক্স দেন এবং অন্ততঃ ম্যাট্রিকুলেশান বা অনুরূপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ তারাই জেলাবোর্ডের নির্বাচনে ভোট দিতে পারে। জেলাবোর্ডের একজন মুখ্য কর্মসচিব (*secretary*), একজন ইনজিনিয়ার (*engineer*) ও কয়েকজন স্বাস্থ্য সংক্রান্ত ব্যপারে তদারক করার জন্য কর্মচারী আছেন।

জেলার রাস্তাঘাট, সেতু ইত্যাদি নির্মাণ ও তদারক এবং রক্ষণাবেক্ষণ করা, চিকিৎসা সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানগুলিকে অর্থ সাহায্য করা, সংক্রামক ব্যাধির

কার্যাধ্যক্ষ

প্রতিরোধ কল্পে ঔষধ-পত্রাদি সরবরাহ করা জেলাবোর্ডের অন্যতম কর্তব্য। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিকে আর্থিক সাহায্য দানও জেলাবোর্ডের অন্যান্য কর্তব্যগুলির অন্তর্ভুক্ত।

জেলাবোর্ডের কর্তব্যের তুলনায় তার আয়ের উৎস নিতান্তই নগণ্য। ভূমি রাজস্বের সংগে আদায়ীকৃত রোডসেস (Roadcess)-ই জেলাবোর্ডের প্রধান আয়। এই আয় জেলাবোর্ড প্রত্যক্ষভাবে আদায় করতে পারে না।

আয়ের উৎস

সরকার এই সেস আদায় করে পরে উহা জেলাবোর্ডদের দিয়ে থাকে। এছাড়া জেলাবোর্ড ,খোঁয়ার, খেয়াঘাট প্রভৃতি থেকে কিছু কিছু অর্থ সংগ্রহ করে। রাজ্য সরকার জেলাবোর্ডগুলিকে অর্থ সাহায্য করেন। সরকারের অনুমোদনক্রমে জেলাবোর্ড ঋণ গ্রহণও করতে পারে।

জেলাবোর্ডগুলির পরিবর্তে ভারতে জেলাপরিষদ গঠিত হতে চলেছে। আর্থিক অনটনের দরুন জেলাবোর্ডগুলি তাদের উপর অপর্তি কর্তব্যগুলি পালন করতে পারেনি। আশা করা যায়, আগামী জেলাপরিষদ প্রকৃত স্বায়ত্ত-শাসনমূলক প্রতিষ্ঠান হিসেবে জেলার উন্নয়নমূলক কাজে গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করবে। পশ্চিমবাংলায় জেলাপরিষদ ও আঞ্চলিকপরিষদ সৃষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় আইন সৃষ্টি হলেও এখনও এই আইন কার্যকরী হয়নি।

কলকাতা করপোরেশন (Calcutta Corporation):

কলকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ প্রভৃতি বড বড সহরগুলির জন্য একটি করে করপোরেশন আছে। কলকাতা করপোরেশনের মোট সদস্য সংখ্যা ৮৬ জন। এদের মধ্যে ৮০ জন প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে বিভিন্ন ওয়াডগুলি থেকে নির্বাচিত হন। কলকাতা ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাস্টের সভাপতি পদাধিকার বলে কর্পোরেশনের একজন কাউন্সিলর (Councilor) মনোনীত হন। করপোরেশনের সদস্যদের বলা হয় কাউনসিলর। কাউনসিলররা পাঁচজন অল্ডারম্যান নিয়োগ করেন। করপোরেশনের মোট ৮৬ জন সদস্য নিজেদের ভেতর থেকে একজন মেয়ব ও একজন ডেপুটি মেয়র নির্বাচিত করেন। করপোরেশনের প্রধান কর্মাধ্যক্ষ হিসেবে একজন প্রধান কর্মসচিব (Chief Commissioner) সরকাব কর্তৃক নিযুক্ত হন। তাছাড়া, কর্পোরেশনের কার্য পরিচালনার জন্য একজন মুখ্য ইনজিনিয়ার, মুখ্য হেলথ অফিসার ও অন্যান্য অনেক কর্মচারী আছেন।

সংগঠন

শিক্ষা, স্বাস্থ্যকর, নগর পরিকল্পনা ইত্যাদি কাজের প্রত্যেকটির জন্য একটি করে স্থায়ী কমিটি (Standing Committee) আছে। এই কমিটিতে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি আলোচিত হওয়ার পর কাউনসিলরের সভায় তা সুপারিশের জন্য উপস্থাপিত হয়।

করপোরেশনের আয়ের প্রধান উৎস হচ্ছে : (১) জমি ও বাড়ির মূল্যের উপর ধার্য কর (২) বৃত্তি ও পেশার উপর কর (৩) গাড়ি, ঘোড়া, কুকুর প্রভৃতির উপর কর, (৪) করপোরেশনের নিজস্ব বাজার, সরাইখানা প্রভৃতি থেকে আয় (৫) রাজ্য সরকারের প্রদত্ত অর্থ সাহায্য (৬) সরকারের অনুমতিক্রমে গৃহীত ঋণ প্রভৃতি।

আয়ের উৎস

করপোরেশনের কাজের পরিধি সুবিস্তৃত। রাস্তাঘাট নির্মাণ ও নামকরণ, পানীয় জল ও সাধারণ জলের সরবরাহের ব্যবস্থা, ময়লা নিষ্কাশণের ব্যবস্থা করা, আলো সরবরাহের ব্যবস্থা প্রভৃতি করপোরেশনের কর্তব্য-গুলির অন্যতম। করপোরেশনের অনুমোদন ব্যতিরেকে সহরের এলাকার মধ্যে কেউ বাড়ি-ঘর নির্মাণ করতে পারে না। জনসাধারণের স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যে হাসপাতাল ও চিকিৎসাকেন্দ্রগুলিকে পরিচালনা করা ও প্রয়োজনীয় অর্থ সাহায্য করাও এর কর্তব্য। সংক্রামক ব্যাধির প্রসার নিরোধ কল্পে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করা, যথা—বসন্তের টিকা দেওয়া, কলেরা, টায়ফয়েড্ প্রভৃতি ব্যাধির প্রতিরোধমূলক ঔষধের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি করপোরেশনের অন্যতম কর্তব্য বলে বিবেচিত হয়। জন্ম-মৃত্যুর হিসেব রাখা এবং বাড়ি-ঘরে আগুন লাগলে উহা নিবারণ করার দায়িত্ব করপোরেশরেন উপর ন্যস্ত হয়েছে। করপোরেশনের নিজস্ব প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। তাছাড়া, প্রয়োজনবোধে শিক্ষার প্রসারকল্পে অন্যান্য বিদ্যালয়গুলিকে অর্থ সাহায্যও করে থাকে। নিজস্ব পশু হত্যাশালা ও বাজার ইত্যাদির মাধ্যমে বিশুদ্ধ খাবার সরবরাহের কাজও করপোরেশন করে থাকে।

কার্যাবলী

মিউনিসিপ্যালিটি (Municipalities) :

প্রত্যেক রাজ্যের অন্তর্গত সাধারণ সহরগুলির জন্য পৌরপ্রতিষ্ঠান আছে। এগুলিকে সাধারণতঃ মিউনিসিপ্যালিটি বলা হয়। বিভিন্ন রাজ্যের মিউনিসিপ্যালিটিগুলির গঠন ও আয়ের উৎস স্বতন্ত্র। বড় বড সহরগুলির জন্য যেমন রাজ্য সরকারের পৃথক আইন আছে, তেমনি রাজ্যের সমস্ত সাধারণ সহরগুলির জন্য পৃথক মিউনিসিপ্যাল আইন আছে।

পশ্চিমবাংলার মিউনিসিপ্যালিটিগুলি ১৯৩২ সালের মিউনিসিপ্যাল আইনের দ্বারা পরিচালিত হয়। অবশ্য পরে এই আইনটির বেশ কয়েকটি ধারা সংশোধন হয়েছে। পশ্চিম বাংলায় মিউনিসিপ্যালিটির সদস্যদের কমিশনার বলা হয়। কয়েকজন কমিশনারদের নিয়ে মিউনিসিপ্যালিটির কাউনসিল (Council) গঠিত হয়। ১৯৩২ সালের বংগীয় মিউনিসিপ্যাল আইনের ১৫ ধারা অনুসারে মিউনিসিপ্যালিটির কাউনসিলের সদস্য সংখ্যা নয় জনের কম হবে না এবং ত্রিশ জনের বেশী হবে না। মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনাররা নিজেদের মধ্য থেকে একজন চেয়ারম্যান (Chairman) এবং একজন ডেপুটি চেয়ারম্যান (Deputy Chairman)

গঠন

নির্বাচিত করেন। মিউনিসিপ্যালিটিতে একজন কর্মাধ্যক্ষ (Executive Officer) আছেন। তাছাড়া, উচ্চ শ্রেণীর মিউনিসিপ্যালিটিগুলি একজন হেলথ অফিসার (Health officer) এবং একজন ইন্‌জিনিয়ার (Engineer)-ও নিয়োগ করে থাকে। বর্তমানে মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনারদের কার্যকাল পাঁচ বৎসর।

আয়

বংগীয় মিউনিসিপ্যাল আইনের ১২৩ ধারা অনুসারে মিউনিসিপ্যালিটির আয়ের প্রধান উৎস হচ্ছে হোল্ডিং ট্যাক্স ("a rate of holding situated within the municipality assessed on their annual value")। এগুলি ছাড়া, জীবিকা ও বৃত্তির উপর কব, ময়লা নিষ্কাসন কবার জন্য কর, জল ও আলো সরবরাহ করার জন্য সেবামূলক কর, গাড়ী ও যানবাহন প্রভৃতির উপর ফি এবং মিউনিসিপ্যালিটির নিজস্ব ঘরবাড়ী থেকে আয় প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

কার্যাধ্যক্ষ

মিউনিসিপ্যালিটির কর্তব্যগুলির মধ্যে রাস্তাঘাটের উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ, ময়লা সরবরাহ, জল ও বাতি সববরাহ, সংক্রামক ব্যাধি প্রসারিত হওয়ার নিরসনকল্পে টীকা ও প্রতিরোধক ঔষধপত্রাদি সরবরাহ, পাঠাগার, পার্ক, উদ্যান প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণ, প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এগুলি ছাড়া জন্ম-মৃত্যুর হিসেব রাখা, শ্মশান, কবর স্থান, খোঁয়ার প্রভৃতি রক্ষণাবেক্ষণ করাও মিউনিসিপ্যালিটিগুলিব অন্যতম কর্তব্য।

পৌর প্রতিষ্ঠানগুলি আজ তাদের কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করতে সক্ষম হচ্ছে না। স্থানীয় দলাদলিই এই ত্রুটির জন্য মুখ্যতঃ দায়ী। মিউনিসিপ্যাল কর আরোপ এবং আদায়ের ক্ষেত্রে পক্ষপাতিত্ব দেখা যায়। মিউনিসিপ্যালিটির কর ধার্যের জন্য বিশেষজ্ঞদের সাহায্য নেওয়ার ব্যবস্থা থাকলেও করদাতারা আপত্তি দিলে কাউনসিলের সভায় সিদ্ধান্ত নিয়ে তার নাকচ করা হয়। পৌরসভার সদস্যেরা প্রায়ই তাঁদের নির্বাচনের পথকে পরিষ্কার রাখার জন্য বিশেষজ্ঞদের এ্যাসেসমেণ্ট অনেক সময় পরিবর্তন করে থাকেন। কর আদায়ের ক্ষেত্রেও যথেষ্ট শৈথিল্য দেখা যায়। পৌর এলাকার করদাতাদের পৌর কর্তব্য সম্বন্ধে অবহিতির অভাব এবং পৌর কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে কর আদায়ের ব্যাপারে দৃঢতার অভাবই মুখ্যতঃ এই অনাদায়ের কারণ।

পরিশিষ্ট

তপশীলভুক্ত জাতি এবং বর্ণ সম্বন্ধে বিশেষ ব্যবস্থা

(Special Provisions for Scheduled Castes and Scheduled Tribes) ঃ

ভারতে কতকগুলি শ্রেণীর লোক আছে, যারা ভারতের অন্যান্য জনসমাজ থেকে অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর। অর্থনৈতিক অগ্রসর এবং রাজনৈতিক চেতনার দিক থেকে তারা অন্যদের চাইতে পৃথক হলেও তাঁদের পৃথক কৃষ্টি আছে। তাছাড়া, সাধারণ হিন্দু সমাজের অন্তর্গত কয়েক শ্রেণীর লোকও প্রাচীনকাল থেকে বাধা-নিষেধের দ্বারা কতকগুলি সামাজিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে এসেছে। স্বভাবতই সকল শ্রেণীর মানুষের এই মানবিক অধিকারগুলিকে রক্ষাকল্পে এবং অনুন্নত জাতিত্বের পৃথক সাংস্কৃতিকে রক্ষার জন্য সংবিধানে কতকগুলি বিশেষ ব্যবস্থার উল্লেখ করা হয়েছে। সংবিধানের 'মৌলিক অধিকার' (Fundamental Rights) এবং 'রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশাত্মক নীতি' (Directive Principles of State Policy) অধ্যায়ে অনুন্নত শ্রেণীদের সম্বন্ধে এই বিশেষ ব্যবস্থাগুলি লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। সংক্ষেপে এই বিশেষ ব্যবস্থাগুলি আলোচনা করা যেতে পারে।

অনুন্নত শ্রেণী সম্বন্ধে বিশেষ ব্যবস্থা

প্রথমতঃ, সংবিধানের ১৫ অনুচ্ছেদে বিদ্যালয়, হোটেল, রেস্টুরেণ্ট প্রভৃতিতে প্রবেশাধিকার এবং সরকারের সম্পূর্ণ বা আংশিক ব্যয়ে নির্বাহিত পুষ্করিণী, কূপ, রাস্তাঘাট প্রভৃতি ব্যবহারের ক্ষেত্রে বাধা-নিষেধ দূরীভূত করা হয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ, ১৭ অনুচ্ছেদ অনুসারে অস্পৃশ্যতার বিলোপসাধন করা হয়েছে।

তৃতীয়তঃ, ২৫ অনুচ্ছেদ অনুসারে হিন্দুর সাধারণ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলি সকল শ্রেণীর হিন্দুদের জন্য উন্মুক্ত রাখা হয়েছে।

চতুর্থতঃ, ৪৬ অনুচ্ছেদ অনুসারে অনুন্নত শ্রেণীর শিক্ষা ও অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি এবং সর্বপ্রকার শোষণের হাত থেকে তাদের রক্ষা করার ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

পঞ্চমতঃ, ৩৩০, ৩৩২ এবং ৩৩৪ অনুচ্ছেদ অনুসারে সংবিধান চালু হওয়ার ২০ বৎসর পর্যন্ত তাদের জন্য কেন্দ্রীয় ও রাজ্য আইনসভায় আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ১৯৫০ সালের জনসাধারণের প্রতিনিধিত্বমূলক আইনে (The Representation of Peoples Act, 1950) মণিপুরের তপশীলভুক্ত উপজাতিত্বের জন্য লোকসভায় আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

এগুলি ছাড়া, তপশীলভুক্ত উপজাতিত্বের উন্নতির জন্য কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক রাজ্য সরকারগুলিকে বিশেষ অর্থ সাহায্যের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিশেষ করে আসামের ক্ষেত্রে স্বায়ত্তশাসিত জেলাগুলির (Autonomous Districts) শাসনব্যবস্থার মান উন্নয়নের জন্য কেন্দ্র কর্তৃক অর্থ সাহায্যের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাছাড়া বিহার, মধ্যপ্রদেশ এবং উড়িষ্যা রাজ্যের উপজাতিদের উন্নয়নমূলক কার্যের জন্য একজন করে মন্ত্রী নিযুক্ত করারও ব্যবস্থা করা হয়েছে। সংবিধানের ৩৩৮ অনুচ্ছেদে অপশীলভুক্ত জাতি ও বর্ণদের বিশেষ অধিকার সম্বন্ধে লক্ষ্য ও অনুসন্ধান করার জন্য একজন Commissioner of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes বলে একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী নিয়োগের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তিনি রাষ্ট্রপতিকে এই অধিকারগুলির যথাযথ সংবক্ষণ সম্বন্ধে বিবরণ পেশ করবেন। আসামের জন্যও একজন Tribal Welfare Officer for Assam নিয়োগের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

সর্বভারতীয় এবং অন্যান্য কৃত্যকে (Services) তপশীলভুক্ত বর্ণ ও জাতিদের নিয়োগের জন্য কতকগুলি বিশেষ সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়েছে। সর্বভারতীয় কৃত্যকগুলিতে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার দ্বারা যে সমস্ত পদগুলি পূর্ণ করা হয় সেগুলির শতকরা ১২·৫ ভাগ তপশীলভুক্ত বর্ণদের জন্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। অন্যান্য উপায়ে যে পদগুলি পূর্ণ করা হয় সেগুলির ক্ষেত্রে এই সংরক্ষণের পরিমাণ শতকরা ১৬·৫ ভাগ। তপশীলভুক্ত জাতিদের (Scheduled Tribes) জন্য এই সংরক্ষণের পরিমাণ শতকরা ৫ ভাগ।

সংবিধান রাষ্ট্রপতিকে কোন্ কোন্ গোষ্ঠী তপশীলভুক্ত জাতি হিসেবে গণ্য হবে বা কোন্ কোন্ এলাকা তপশীলভুক্ত এলাকা বলে গণ্য হবে সে সম্বন্ধে ঘোষণা করার ক্ষমতা দিয়েছে। যে সমস্ত এলাকা অধিক

পরিমাণে উপজাতির অন্তর্ভুক্ত গোষ্ঠীদের দ্বারা অধ্যুষিত হবে সেগুলিকেই তপশীলী এলাকা হিসেবে ঘোষণা করা হবে। বর্তমানে বিহার, মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ, উড়িষ্যা, পাঞ্জাব এবং রাজস্থান প্রভৃতি এলাকায় তপশীলী এলাকা আছে। যে সমস্ত রাজ্যে তপশীলী এলাকা (Scheduled Area) আছে সেখানে একটি উপজাতি-সংক্রান্ত ব্যাপারে উপদেষ্টা সমিতি (Tribes Advisory Council) থাকবে। রাষ্ট্রপতি মনে করলে যে সমস্ত রাজ্যে তপশীলী এলাকা নেই সেখানেও তপশীলভুক্তদের জন্য এই জাতীয় সমিতি গঠন করতে পারেন। উপজাতির উন্নতিকল্পে যে সমস্ত বিষয় রাজ্যপাল কর্তৃক এই সমিতির কাছে প্রেরিত হবে সে সম্বন্ধে রাজ্যপালকে পরামর্শ দেওয়াই হচ্ছে এদের কাজ। এই সমিতির সদস্য সংখ্যা ২০ জনের বেশী হবে না এবং এঁদের তিন-চতুর্থাংশ সংখ্যক সদস্য—তপশীলভুক্ত জাতির অন্তর্গত রাজ্য আইনসভার সদস্যদের ভেতর থেকে নেওয়া হবে।

আসাম ছাড়া তপশীলভুক্ত এলাকায় বিশেষ ব্যবস্থা

আসাম রাজ্যের সমগ্র জনসংখ্যার শতকরা ৩৪ ভাগ উপজাতির অন্তর্ভুক্ত। এই রাজ্যের দুটি সীমান্ত এলাকা আসাম সরকারের কর্তৃত্বের এক্তিয়ারভুক্ত নয়। এই দুটি এলাকা হচ্ছে: (১) নেফা (North-East Frontier Agency) এবং (২) নাগাল্যাণ্ড। ১৯৬৩ সালে নাগাল্যাণ্ড একটি পৃথক রাজ্য হিসেবে ভারতের সংবিধানে স্থান পেয়েছে। অবশ্য নাগাল্যাণ্ডের জন্য এখনও পৃথক রাজ্যপাল নিযুক্ত হয়নি। আসামের রাজ্যপালই এখানকার রাজ্যপাল হিসেবে কাজ করেন। নেফার শাসনব্যবস্থাও রাষ্ট্রপতির প্রতিনিধি হিসেবে আসামের রাজ্যপালের নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হয়।

আসামের তপশীলী এলাকা সম্বন্ধে বিশেষ ব্যবস্থা

সংবিধানের ষষ্ঠ তালিকা অনুসারে আসামের উপজাতি অধ্যুষিত এলাকাগুলির জন্য District Council এবং Regional Council গঠন করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সংযুক্ত খাসিয়া জয়ন্তীয়া হিলস্ (United Khasia Jaintia Hills), গারো হিলস্, মিজো হিলস্, উত্তর কাছাড় হিলস্ এবং মিকির হিলস্ এলাকাগুলিকে স্বায়ত্তশাসিত জেলা (Autonomous District) বলা হবে। উপরোক্ত এলাকাগুলির প্রত্যেকটির জন্য একটি করে জেলাপরিষদ (District Council) থাকবে। প্রত্যেকটি পরিষদের সংখ্যা ২৪ জনের বেশী হবে না। এই সদস্যদের তিন-চতুর্থাংশ সদস্য প্রাপ্ত

বয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত হবে। এই পরিষদগুলিকে কতকগুলি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে কর ধার্য করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া, জমির ব্যবহার ও বিলিবন্দোবস্ত, অরণ্য ইত্যাদির সংরক্ষণ ও পরিচালনা, গ্রাম ও সহরগুলির পুলিসী ব্যবস্থা, স্বাস্থ্য ও অনাময় ব্যবস্থা সংক্রান্ত নিয়মাদি প্রস্তুত করা, সম্পত্তির উত্তরাধিকার, বিবাহ, সামাজিক প্রথা ইত্যাদি সম্বন্ধে আইন তৈরী করা এই পরিষদগুলির ক্ষমতার অন্তর্ভুক্ত। অবশ্য এই পরিষদ যে সমস্ত আইন তৈরী করবে সেগুলি রাজ্যপাল কর্তৃক অনুমোদিত না হওয়া পর্যন্ত কার্যকরী হবে না।

একটি স্বায়ত্তশাসিত জেলার মধ্যে একাধিক তপশীলভুক্ত জাতি (Scheduled Tribe) বাস করলে রাজ্যপাল তার এলাকাকে স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল (Autonomous Region)-এ ভাগ করতে পারেন। স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলগুলির (Autonomous Region) জন্য একটি Regional Council থাকবে। যে জেলায় Regional Council থাকবে সেখানকার জেলা পরিষদকে (District Council) আঞ্চলিক পরিষদ (Regional Council) যে-যে ক্ষমতাগুলি পরিচালনা করাব জন্য ক্ষমতা প্রদান করবে সেই ক্ষমতাগুলিই তারা পরিচালনা করতে পারবে। অবশ্য এগুলি ছাড়া এই তালিকায় বর্ণিত সংশ্লিষ্ট ক্ষমতাগুলি পরিচালনা করার ক্ষমতাও তাদের থাকবে।

জনকৃত্যকসমূহ (Public Services):

পার্লামেণ্ট চালিত শাসনব্যবস্থায় সরকারের নীতি নির্ধারণ করেন জনসাধারণের প্রতিনিধিস্থানীয় মন্ত্রীমণ্ডলী। কিন্তু সেই নীতিকে কার্যকরী করে সরকারের বিভিন্ন স্তরে নিযুক্ত স্থায়ী কর্মচারীগণ। শুধু তাই নয়, নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে মন্ত্রীমণ্ডলীকে প্রয়োজনীয় সাহায্য ও পরামর্শ দেওয়াও এঁদের অন্যতম কাজ। স্বভাবতই এই কর্তব্যকে যথোপযুক্তভাবে পালন করার জন্য তাঁদের স্ব-স্ব বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন হতে হয়।

জনকৃত্যকের কাজের স্বরূপ

উপরোক্ত কর্তব্যগুলি সরকারের কর্মচারীদের দ্বারা যথাযথভাবে প্রতিপালিত হওয়ার জন্য তাঁদের নিয়োগ, চাকরির স্থায়িত্ব ইত্যাদির ব্যাপারে কয়েকটি বিশেষ নিয়ম অনুসৃত হওয়া উচিত। প্রথমতঃ, কোন এক রাষ্ট্রভৃত্য

নিয়োগ পরিষদের দ্বারা পরিচালিত এক প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে তাঁদের চাকরিতে গ্রহণ করা উচিত। এই প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা সকলের জন্য উন্মুক্ত থাকা উচিত। এই প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা লিখিত এবং মৌখিক হতে পারে। যথোপযুক্ত পারদর্শীতা এবং উৎকর্ষ-বিধানের জন্য এই চাকরিগুলিতে উপযুক্ত বেতন ও ভাতার ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। তাছাড়া, চাকরির স্থায়িত্ব ও নিরাপত্তা বিধানের জন্যও উপযুক্ত নিয়ম-কানুন প্রবর্তিত হওয়া উচিত। এই উদ্দেশ্যে প্রমাণিত অসদাচরণ এবং অযোগ্যতা ব্যতীত তাঁরা যাতে চাকরি থেকে অপসারিত না হন তার বিধান থাকা প্রয়োজন। চাকরিতে অবস্থানকালীন যাতে কোন আর্থিক প্রলোভন বা অন্য কোন প্রকার প্রভাবের দ্বারা বশীভূত না হন তার জন্য অবসর গ্রহণান্তে উপযুক্ত পেনসন্, গ্র্যাচুয়িটি ইত্যাদির ব্যবস্থা থাকাও একান্ত প্রয়োজন।

ব্রিটিশ শাসনের সময় ভারতীয় কৃত্যক (Services)-গুলির মান উচ্চস্তরের হলেও উহা গণতান্ত্রিক নীতিগুলির বিরোধী ছিল। ভারতীয় কৃত্যকের অন্তর্গত কর্মচারীরা অধিকাংশই ছিলেন ইংরেজ এবং পরবর্তীকালে এঁদের অনেকেই গভর্নর জেনারেলের শাসন পরিষদের (Executive Council) সদস্য ছিলেন অথবা প্রাদেশিক গভর্নরের পদে উন্নীত হয়েছিলেন। সরকারী নীতিগুলিকে বিশ্বস্ততা সহকারে কার্যকরী করার চাইতে ব্রিটিশ সবকারের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের ধারক এবং বাহক বলেই তারা নিজেদের মনে করতেন।

১৯১৯ সালের আইনে জনকৃত্যক

১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনের দ্বারা প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থার ক্ষেত্রে যখন হস্তান্তরিত বিভাগের বিষয়গুলি (Transferred subjects) মন্ত্রীমণ্ডলীর হাতে ন্যস্ত হল তখন স্বভাবতই সর্বভারতীয় কৃত্যকের (All India Srevices)—বিশেষ করে ইওরোপীয় কর্মচারীরা তাদের পদমর্যাদা এবং চাকরির স্থায়িত্ব সম্বন্ধে শংকিত হয়ে পড়েন। তাঁদের এই আশংকা দূরীকরণের জন্য ব্রিটিশ সরকার কতকগুলি নিয়ম-কানুন তৈরী করে চাকরির স্থায়িত্ব ও পদমর্যাদা সম্বন্ধে তাঁদের আশ্বস্ত করেন।

এই সমস্ত নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিধানাবলী সত্ত্বেও ১৯১৯ সালের দ্বৈত-শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়ার সংগে সংগে ভারতে ইংরেজ কর্মচারীর সংখ্যা কমতে শুরু করে। এই সময় লর্ড লির (Lord Lee) সভাপতিত্বে ব্রিটিশ সরকার একটি কমিশন্ নিয়োগ করেন। এই কমিশনকে লি কমিশন (Lee Commission) বলা হয়। ভারতীয় কৃত্যকগুলির সংস্কার সম্বন্ধে অভিমত

পেশ করাই ছিল এই কমিশনের কাজ। এই কমিশন যে সমস্ত স্থপারিশ পেশ করেন তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে : দ্বৈত-শাসন ব্যবস্থায় হস্তান্তরিত বিষয়গুলির সংগে জড়িত কর্মচারীদের প্রাদেশিক সরকার কর্তৃক নিযুক্ত ও নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত। তা ছাড়া, সংরক্ষিত বিষয় (Reserved subjects)-গুলিও যখন কালক্রমে মন্ত্রীদের অধীনে আসবে তখন সমস্ত কর্মচারীদের প্রাদেশিক মন্ত্রীদের অধীনে স্থাপিত করা উচিত। ১৯৩০ সালে নিযুক্ত স্ট্যাটুটরী কমিশন (Statutory Commission) লি কমিশনের এই অভিমত মেনে নিতে পারেননি। তাঁদের মতে সর্বভারতীয় কৃত্যকগুলি প্রাদেশিক সরকারের অধীনে থাকলে ভারতীয় নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ হতে পারে। তাই তাঁরা এই কৃত্যকের অন্তর্ভুক্ত কর্মচারীদের সপরিষদ ভারত-সচিবের দ্বারা নিযুক্ত ও নিয়ন্ত্রিত হওয়াই বাঞ্ছনীয় বলে অভিমত দেন।

১৯৩৫ সালের আইনে জনকৃত্যক

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে কৃত্যকগুলিকে প্রধানতঃ দুটি ভাগে ভাগ করা হয় : যথা, উচ্চতর কৃত্যকগুলি (Superior Services) এবং অন্যান্য কৃত্যকগুলি (Other Services)। ভারতীয় সিভিল সার্ভিস (Indian Civil Service), ভারতীয় মেডিক্যাল সার্ভিস (Indian Medical Service), ভারতীয় পুলিস সার্ভিস (Indian Police Service) প্রভৃতি উচ্চতর কৃত্যকগুলির অন্তর্ভুক্ত। এঁরা সপরিষদ ভারতসচিব কর্তৃক নিযুক্ত ও নিয়ন্ত্রিত হতেন। অন্যান্য কৃত্যকের অন্তর্ভুক্ত কর্মচারীরা গভর্নর জেনারেলের চূড়ান্ত নিয়ন্ত্রণাধীন ছিলেন।

বর্তমান সংবিধানে জন কৃত্যক সমূহ

বর্তমান সংবিধানের কৃতকগুলিকে মোটামুটি দু' ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। যথা, সর্বভারতীয় কৃত্যকগুলি (All India Services) এবং রাজ্য-কৃত্যকগুলি (State Services)। ভারতীয় প্রশাসনিক কৃত্যক (Indian Administrative Service) এবং ভারতীয় পুলিস কৃত্যক (Indian Police Service) সর্বভারতীয় কৃত্যকের অন্তর্ভুক্ত। এই প্রসংগে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, সর্বভারতীয় কৃত্যকের কর্ম-চারীরা কেন্দ্র ও রাজ্যের প্রশাসনিক ব্যবস্থার সংগে যুক্ত থাকতে পারে। তবে কতকগুলি কৃত্যক আছে যেগুলি সম্পূর্ণভাবে কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থার সংগে যুক্ত। এগুলি হচ্ছে : রেলওয়ে সার্ভিস, পোস্ট-টেলিগ্রাফ সার্ভিস, অডিট ও অ্যাকাউন্টস সার্ভিস প্রভৃতি। রাজ্যসভার দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতি ও ভোটে যদি এই মর্মে প্রস্তাব গৃহীত হয় যে জাতীয় স্বার্থের উদ্দেশ্যে অন্য যে

কোন কৃত্যক সর্বভারতীয় কৃত্যকের অন্তর্ভুক্ত করা হোক, তাহলে সেগুলিকে সর্বভারতীয় কৃত্যকের অন্তর্ভুক্ত করা চলবে। রাজ্য-কৃত্যকের অন্তর্ভুক্ত কর্মচারীরা সম্পূর্ণভাবে রাজ্য প্রশাসনিক ব্যবস্থার সংগে যুক্ত। সর্বভারতীয় কৃত্যকগুলিতে কর্মচারী সংগ্রহ (recruitment) এবং তাদের চাকরির শর্তাদি নির্ধারণের জন্য নিয়ম-কানুন প্রস্তুত করার সম্পূর্ণ অধিকার পার্লামেণ্টের এবং অনুরূপভাবে রাজ্য-কৃত্যকগুলিতে কর্মচারী সংগ্রহ (recruitment) এবং চাকরির শর্তাদি নির্ধারিত হবে রাজ্য আইনসভার দ্বারা (Subject to the provisions of this constitution, Acts or the appropriate Legislature may regulate this recruitment and conditions of service of persons appointed to public services and posts in connection with this affairs of the Union or of any State)। তপশীলভুক্ত জাতি (Scheduled Tribes) ও বর্ণ (Scheduled Castes) এবং অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায়দের (Anglo-Indian Community) জন্য বিশেষ সংরক্ষণের ক্ষেত্র ছাড়া, যে কোন কৃত্যকগুলিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে ভারতীয় নাগরিকদের মধ্যে কোনরূপ বৈষম্যমূলক নিয়ম থাকা চলবে না। সর্বভারতীয় কৃত্যকের কর্মচারীরা রাষ্ট্রপতির আস্থাভাজন থাকাকালীন এবং রাজ্য-কৃত্যকের কর্মচারীরা রাজ্যপালের আস্থাভাজন থাকাকালীন স্বপদে অধিষ্ঠিত থাকেন। অবশ্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীসভার পরামর্শ অনুসারেই রাষ্ট্রপতি বা রাজ্যপাল তাঁদের অপসারিত করেন। রাষ্ট্রপতি অথবা রাজ্যপালের অপসারণ সংক্রান্ত ক্ষমতা নিছক অনুষ্ঠানমাত্র। আসলে চাকরিতে বহাল থাকার ক্ষেত্রে তারা যথেষ্ট নিরাপত্তা ভোগ করে। কৃত্যকে নিযুক্ত কোন ব্যক্তিকে অপসারিত করতে হলে তার বিরুদ্ধে কোন এক অভিযোগ থাকতে হবে। উক্ত অভিযোগের ক্ষেত্রে অনুসন্ধানের ব্যবস্থা থাকতে হবে এবং অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিতে হবে।

জনকৃত্যকের কর্মচারীদের সংগ্রহ, পদোন্নতি, স্থানান্তর, শাস্তিমূলক ব্যবস্থা, কর্মরত অবস্থায় অবসর গ্রহণ করতে বাধ্য হলে পেনসন দান ইত্যাদি ব্যাপারে

রাষ্ট্র ভৃত্য নিয়োগ পরিষদ

রাষ্ট্রপতি অথবা রাজ্যপালকে সাহায্য এবং পরামর্শ দেওয়ার জন্য সংবিধানে রাষ্ট্রভৃত্য নিয়োগ পরিষদ (Public Service) গঠনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।[1]

---

1. রাষ্ট্রভৃত্য নিয়োগ পরিষদের গঠন, সদস্যদের নিয়োগ, অপসারণ পদ্ধতি ও অন্যান্য শর্তাদি সম্বন্ধে পূর্ববর্তী অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

জনকৃত্যকগুলির প্রধান ত্রুটি হচ্ছে, উপযুক্ত দৃষ্টিভংগী এবং নীতিবোধের অভাব। যে সমস্ত কর্মচারীদের জনসাধারণের সংগে সম্পর্কযুক্ত হতে হয় তাঁদের সহানুভূতি সহকারে জনসাধারণের সুবিধা-অসুবিধা বা অভাব অভিযোগ সম্বন্ধে অবহিত হওয়া দরকার। কিন্তু দুঃখের বিষয় ব্রিটিশ আমলের সরকারী কর্মচারীদের মত আপত্তিজনক দৃষ্টিভংগী আজকের দিনের কর্মচারীদের মধ্যেও প্রায় দেখা যায়। জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রের কর্মচারীদের আদর্শবোধ থাকা প্রয়োজন। অন্যথায় সরকারের নীতিগুলি বহুল পরিমাণে ব্যাহত হবার সম্ভাবনা থাকে। প্রকৃতপক্ষে লাল ফিতার চাপে অনেক সরকারী পবিকল্পনা এবং কার্যাদি আজ ভণ্ডুল হতে চলেছে। সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে আজ দুর্নীতিরও অভাব নেই। বিশেষ করে পুলিস, ভূমি সংস্কার এবং খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগের কর্মচারীদের মধ্যে দুর্নীতির প্রসার দেখা যাচ্ছে। দুর্নীতির কারণগুলি অনুসন্ধান করে সে সম্বন্ধে প্রতিরোধ-মূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা একান্ত প্রয়োজন।

কৃত্যকগুলির ত্রুটি

মন্ত্রীমণ্ডলী এবং স্থায়ী কর্মচারীদের মধ্যে সুষ্ঠু সম্পর্কের প্রশ্নটিও এই প্রসংগে অতি গুরুত্বপূর্ণ। মন্ত্রীসভার সদস্যদের তাঁদের সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মচারীদের কাজে অনেক সময় অযথা হস্তক্ষেপ করতে দেখা যায়। স্থায়ী কর্মচারীদের স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ না দিলে প্রশাসনিক নিরপেক্ষতা বজায় রাখা অনেক ক্ষেত্রে সম্ভব হয় না। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে উচ্চতম কর্মচারীদের মধ্যেও জনসাধারণের প্রতিনিধি স্থানীয় কর্তৃপক্ষের নীতি ও নির্দেশাবলীকে অস্বীকার করার প্রবণতা দেখা যায়। এই প্রবণতা স্পষ্টতই গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার নীতি বিগর্হিত।

স্থায়ী কর্মচারীদের সংগ্রহের (recruitment) পদ্ধতি ত্রুটিমুক্ত নয়। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাগুলি লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে পরিচালিত হয়। স্বল্পস্থায়ী মৌখিক পরীক্ষার সাহায্যে কোন ব্যক্তির যোগ্যতা সঠিক ভাবে যাচাই করা সম্ভব নয়। কোন কোন রাজ্যে স্থানীয় বসবাসের শর্ত আরোপ করায় যথার্থভাবে যোগ্য ব্যক্তিদের সংগ্রহ করা সম্ভব হয় না।

সংগৃহীত ব্যক্তিদের উপযুক্ত শিক্ষার অভাব জনকৃত্যকগুলির অন্যতম ত্রুটি। এই উদ্দেশ্যে চাকরিতে প্রবেশের পূর্বে এবং পরে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা থাকা উচিত। আমাদের দেশে চাকরিতে প্রবেশের পূর্বে কিছু শিক্ষাদানের ব্যবস্থা থাকলেও চাকরিতে প্রবেশেব পর শিক্ষা দানের কোন ব্যবস্থা নেই। ফলে

স্থায়ী কর্মচারীদের মধ্যে প্রয়োজনীয় উৎসাহ ও পরিবর্তিত দৃষ্টিভংগীর অভাব দেখা যায়। জনকৃত্যকগুলির উন্নতি বিধান কল্পে এই জাতীয় শিক্ষার ব্যবস্থাকে মোটেই অস্বীকার করা চলে না।

জনকৃত্যকগুলির প্রয়োজনীয় উৎকর্ষ বজায় রাখার জন্য কর্মচারীদের উপযুক্ত পদোন্নতির ব্যবস্থা থাকা একান্ত প্রয়োজন। এই পদোন্নতির জন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে কর্মচারীদের বিভাগীয় ঊর্ধ্বতন কর্তাদের সুপারিশের উপর নির্ভর করতে হয়। বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের উচিত এই উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় কাগজ-পত্রাদি ঠিকভাবে সংরক্ষিত করা। দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশে স্থায়ী কর্মচারীদের কর্মবিবরণ যথাযথভাবে রক্ষিত হয় না এবং কর্মচারীদের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাদের বিভাগীয় বড় কর্তাদের খেয়ালখুশির উপর নির্ভর করতে হয়।

সরকারী ভাষা (Official Language) :

সংবিধানের ৩৪৩ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, দেবনাগরী অক্ষরে হিন্দী হবে ভারতের সরকারী ভাষা। সরকারী কাজে ব্যবহৃত সংখ্যাও হবে ভারতীয় সংখ্যার আন্তর্জাতিক রূপ। (The Official Language of the Union shall be Hindi in Devanagri Script. The form of numerals to be used for the Official purposes of the Union shall be the international form of Indian numerals)।

তাছাড়া, উক্ত অনুচ্ছেদে আরও বলা হয়েছে যে সংবিধান চালু হওয়ার সময় থেকে পনের বৎসর পর্যন্ত ইংরেজী আগেকার মতই সরকারী ভাষা হিসেবে ব্যবহৃত হবে। এই পনের বৎসরের মধ্যেও রাষ্ট্রপতি সরকারী কার্যাদির উদ্দেশ্যে ইংরেজী ছাড়া হিন্দী ভাষার ব্যবহারের জন্য আদেশ দিতে পারেন। এই পনের বৎসর অতিবাহিত হওয়ার পর পার্লামেণ্ট আইন তৈরী করে ইংরেজীর ব্যবহার চালু রাখতে পারে। এই প্রসংগে উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৬৩ সালে সরকারী ভাষা সংক্রান্ত আইনের দ্বারা (Official Language Act, 1963) উক্ত সময়ের পরেও হিন্দী ছাড়া ইংরেজীকেও সরকারী ভাষা হিসেবে ব্যবহার করা চলবে বলে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে।

সংবিধান চালু হওয়ার সময় থেকে পাঁচ বছর এবং দশ বছর পর রাষ্ট্রপতিকে সরকারী ভাষা সংক্রান্ত ব্যাপারে সুপারিশ করার জন্য একটি কমিশন নিয়োগ

করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই কমিশনে একজন সভাপতি এবং ভারতের চোদ্দটি ভাষার তরফ থেকে গৃহীত একজন করে প্রতিনিধি থাকবে। এই কমিশনের কাজ হবে কেন্দ্রীয় সরকারের সরকারী কাজকর্মের উদ্দেশ্যে হিন্দী ভাষার ক্রমাগত ব্যবহার এবং ইংরেজীর ব্যবহারের হ্রাস সম্বন্ধে পরামর্শ দেওয়া। তাছাড়া, সুপ্রীমকোর্ট ও হাইকোর্টগুলিতে ব্যবহার যোগ্য ভাষা, বিভন্ন আইনসভায় প্রণীত বিল, আইন এবং নিয়ম কানুন সম্বন্ধে অভিমত পেশ করাও এই কমিশনের অন্যতম কাজ। এই কমিশনের সুপারিশগুলি বিবেচনার জন্য একটি কমিটির নিকট উপস্থাপিত করা হবে। এই কমিটির মোট সদস্য সংখ্যা হবে ৩০ জন। এই ৩০ জন সদস্যেব মধ্যে ২০ জন্য সদস্য লোকসভার সদস্যদের দ্বারা এবং বাকী ১০ জন রাজ্যসভার সদস্যদের দ্বারা সমানুপাতিক নির্বাচন পদ্ধতিতে নির্বাচিত হবেন। উপরোক্ত কমিশনের সুপারিশগুলি বিবেচনা করে সে সম্বন্ধে রাষ্ট্রপতির নিকট তাঁদের অভিমত পেশ করাই হচ্ছে এই কমিটির কাজ। রাষ্ট্রপতি এই বিবরণ পাওয়ার পর সরকারী ভাষা সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় নির্দেশ জারী করবেন।

পার্লামেণ্ট কর্তৃক আইনের দ্বারা অন্য ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত সুপ্রীমকোর্ট ও হাইকোর্টের কার্যাবলী, বিল, আইন এবং নিয়ম-কানুন ইত্যাদি ইংরেজী ভাষার মাধ্যমেই পরিচালিত ও প্রকাশিত হবে। অবশ্য রাজ্যপাল রাষ্ট্রপতির পুর্ব অনুমতি সাপেক্ষে এই সমস্ত কাজকর্মের জন্য হিন্দী ভাষা ব্যবহারের জন্য অনুমতি দিতে পাবেন। তবে এক্ষেত্রে হাইকোর্টের সমস্ত রায় এবং নির্দেশাবলী ইংরেজী ভাষাতেই দিতে হবে। কোন রাজ্য সরকার তার বিল, আইন, নিয়ম ও নির্দেশাদিতে ইংরেজী ছাড়া অন্য ভাষা ব্যবহার করলে, সেই সরকারকে তার ইংরেজী অনুবাদ অবশ্যই প্রকাশ করতে হবে এবং উক্ত অনুবাদকে অবশ্যই বৈধ বলে গণ্য করা হবে।

কোন রাজ্য সরকার ইংরেজী ছাড়া সেই রাজ্যে ব্যবহৃত অন্য কোন ভাষা সরকারী কাজকর্মের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে পারেন—তবে আন্তরাজ্য যোগাযোগ অথবা কেন্দ্রের সংগে যোগাযোগের জন্য ব্যবহৃত ভাষাকে অবশ্যই কেন্দ্রের সরকারী ভাষা হতে হবে। যদি কোন রাজ্যের যথেষ্ট সংখ্যক লোক এই মর্মে ইচ্ছা প্রকাশ করে যে তাদের ব্যবহৃত ভাষা রাজ্য সরকার কর্তৃক স্বীকৃত হোক, তাহলে রাষ্ট্রপতি সেই ভাষাকে উক্ত রাজ্যের সরকারী ভাষা হিসেবে ব্যবহার করার জন্য নির্দেশ দিতে পারেন। ভারতের যে কোন

অধিবাসী কেন্দ্র অথবা রাজ্য সরকারের কাছে যে কোন ভাষায় তার অভিযোগ পেশ করতে পারবে।

নির্বাচন সংক্রান্ত ব্যবস্থা (Provisions Regerding Election to the Legislatures) :

আমাদের সংবিধানে প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকার নীতি গৃহীত হয়েছে। অন্ততঃ একুশ বৎসর বয়স্ক নাগরিক যিনি সংবিধান বা পার্লামেণ্ট কর্তৃক আইনের দ্বারা অযোগ্য বিবেচিত হননি, তিনি নির্বাচনের অধিকার ভোগ করবেন। কোন নাগরিক যদি নির্বাচনী এলাকায় বসবাস না করেন, অথবা বিকৃত মস্তিষ্ক হন অথবা নির্বাচনের সময় কোন আইনবিরুদ্ধ অথবা অসদাচরণে লিপ্ত হন তা হলে তাঁকে ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়। সংবিধানের ৩৩০ অনুচ্ছেদ অনুসারে তপশীলভুক্ত জাতি ও বর্ণদের জন্য লোকসভায় আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা আছে।

লোকসভার সদস্য নির্বাচনের জন্য প্রত্যেক রাজ্যকে কতকগুলি নির্বাচনী এলাকায় ভাগ করা হয়। লোকসভার প্রতিনিধি নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রত্যেক রাজ্য থেকে এমন সংখ্যক সদস্য নির্বাচিত হবে যাতে নাকি তার জনসংখ্যার সংগে লোকসভার সদস্য সংখ্যার অনুপাত অন্যান্য রাজ্যের ক্ষেত্রেও এক থাকে। তাছাড়া, প্রত্যেক রাজ্যগুলির অন্তর্ভুক্ত নির্বাচনী এলাকা থেকে লোকসংখ্যার সংগে নির্বাচিত সদস্যের অনুপাত উক্ত রাজ্যের অন্যান্য এলাকাগুলি সংগেও যেন সমান হয়। কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মধ্যে আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ এবং লাক্ষা দ্বীপ ও মিনিকয় দ্বীপের সদস্যরা রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত হন। তাছাড়া, আসামের উপজাতি অধ্যুষিত নেফা প্রভৃতি এলাকা থেকেও সদস্যরা রাষ্ট্রপতি দ্বারা মনোনীত হন। অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায় ঠিকমত প্রতিনিধিত্ব পায়নি মনে করলে রাষ্ট্রপতি এই সম্প্রদায় থেকে ঊর্ধ্বতন পক্ষে দুজন সদস্য মনোনীত করতে পারেন। রাজ্যসভার সদস্যদের মধ্যে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত সদস্যরা ছাড়া অন্যান্য সদস্যরা রাজ্য বিধানসভার নির্বাচিত সদস্যদের দ্বারা একক হস্তান্তর যোগ্য ভোটদানের পদ্ধতিতে নির্বাচিত হবেন। কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলি থেকেও একই পদ্ধতিতে প্রতিনিধি নির্বাচিত হন।

রাজ্য বিধানসভার সদস্য নির্বাচনের জন্যও প্রত্যেক রাজ্যকে কতকগুলি নির্বাচনী এলাকায় ভাগ করা হয়। এই এলাকাগুলিকে এমনভাবে ভাগ করা

হয় যাতে নাকি কোন এলাকার জনসংখ্যার সংগে নির্বাচিত সদস্তের অনুপাত অন্যান্ত এলাকাগুলির সংগে এক হয়। রাজ্যবিধান পরিষদের সদস্যরা এই উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট এলাকাগুলি থেকে সংবিধানের নির্দেশমত স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠান, স্নাতক এবং শিক্ষক সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের দ্বারা নির্বাচিত হন। এই প্রসংগে উল্লেখযোগ্য যে একই ব্যক্তি প্রয়োজনীয় যোগ্যতাসম্পন্ন হলে একাধিক নির্বাচনে ভোট দেবার সুযোগ পাচ্ছে। এই ব্যবস্থা কিছুটা অগণতান্ত্রিক বলে মনে হওয়াই স্বাভাবিক।

নির্বাচন সংক্রান্ত কার্যাদি, যথা—নির্বাচন পরিচালনা, তালিকা প্রস্তুত, নির্বাচনের ক্ষেত্রে দুর্নীতি বন্ধ করা ইত্যাদির জন্য সংবিধানে একটি নির্বাচন কমিশন (Election Commission) নিয়োগের ব্যবস্থা করা হয়েছে। মুখ্য নির্বাচন কমিশন (Chief Election Commissioner) এবং অন্যান্য কয়েকজন সদস্য নিয়ে এই কমিশন গঠিত হয়। নির্বাচন কমিশনকে সাহায্য করার জন্য রাষ্ট্রপতি আঞ্চলিক কমিশনার (Regional Commissioners)-ও নিয়োগ করতে পারেন। নির্বাচন সংক্রান্ত বিবাদের মীমাংসা করার জন্য নির্বাচন কমিশন নির্বাচন ট্রাইবুন্যাল (Election Tribunal) নিয়োগ করতে পারেন।

ভারতের পার্লামেণ্ট চালিত গণতন্ত্র (Parliamentary Democracy in India) ঃ

ভারতের বর্তমান সংবিধান এক আদর্শ গণতান্ত্রিক সংবিধান সন্দেহ নেই। তবে এই গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা ভবিষ্যতে কতদূর কার্যকরী হবে সেটি এক চিন্তার বিষয়। পাকিস্থান, নেপাল, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি দেশগুলিতে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা পর্যুদস্ত হয়েছে। মধ্য ও দূর প্রাচ্যের অনেক রাষ্ট্রেও সেনাবাহিনীর অভ্যুত্থানের নজির বিরল নয়। Controlled অথবা Guided Democracy-র নাম করে ভারতের গণতন্ত্রকে এখনও বিকৃত করা হয়নি। এমত অবস্থায় স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, ভারতের গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ কি? অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তির মধ্যে ভারতে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার সাফল্যের পেছনে রয়েছে গণতন্ত্রের উপর সম্পূর্ণ আস্থাশীল আমাদের প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রীর বিরাট ব্যক্তিত্ব। বিরাট ব্যক্তিত্বের তিরোধানের সংগে সংগে ভারতের গণতন্ত্রকে এক বিরাট অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে বলে অনেকে মনে করেন। শ্রীনেহেরুর

লোকান্তরিত হওয়ার পর সেই সমস্যার সামনাসামনি আমরা এসে দাঁড়িয়েছি। এর সমাধানে আমরা কতটা কৃতকার্যতা অর্জন করব সেইটিই আমাদের বিচার্য বিষয়।

গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাকে কার্যকরী করতে হলে তার জন্য প্রয়োজনীয় পরিবেশ সৃষ্টির প্রয়োজন। যে দেশে অর্থনৈতিক বৈষম্য অতিশয় তীব্র, যে সমাজের বিভিন্ন স্তরে ব্যবধান বিদ্যমান, যেখানে রাজনৈতিক চিন্তাধারা ও মতামতের ক্ষেত্রে সহনশীলতার অভাব—সেখানে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা বেশীদিন টিঁকে থাকতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে গণতন্ত্রকে সাফল্যমণ্ডিত করতে হলে প্রয়োজন হয় গণতান্ত্রিক পরিবেশের। গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য এবং জীবন দর্শনে বিশ্বাস না থাকলে অথবা অভ্যস্ত না হলে গণতন্ত্রের পরীক্ষা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে বাধ্য।

ভারতের ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক পরিবেশের এই প্রয়োজনীয় শর্তগুলি কতদূর বিদ্যমান আছে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্রদের তা বিচার্য বিষয়।

এই প্রসংগে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় যে গণতন্ত্রকে এক বিশেষ জীবন দর্শন হিসেবে গ্রহণ করতে না পারলে দেশের উর্ধ্বতন পর্যায়ে শুধুমাত্র এক সরকারী কাঠামোর মাধ্যমেই এই শাসনব্যবস্থাকে সাফল্যমণ্ডিত করা যায় না। সমাজজীবনের বিভিন্ন স্তরে গণতান্ত্রিক ভাবধারা ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত থাকা দরকার। যে সমাজব্যবস্থায় সহনশীলতার অভাব সেখানে গণতন্ত্র টিঁকবে কেমন করে? আমাদের বরেণ্য রাষ্ট্রপতি গোরক্ষপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সমাবর্তন উৎসবে ছাত্রদের লক্ষ্য করে বলেছিলেন, "সত্যিকারের 'গণতান্ত্রিক আদর্শ' ('true spirit of democracy') আমাদের সংযমী এবং মতবৈষম্যকে মেনে নেবার জন্য সহনশীল হতে শিক্ষা করতে হবে" ("we must learn to act with restraint and tolerate differences")। প্রকৃতপক্ষে গণতান্ত্রিক নীতি ও পদ্ধতিতে আস্থা স্থাপন এই শাসনব্যবস্থার সাফল্যের একটি অন্যতম শর্ত। গণতন্ত্র নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতি বিশ্বাস করে। পারস্পরিক বোঝাপড়া, অপরের সুবিধা-অসুবিধা সম্বন্ধে সহানুভূতি সুলভ মনোভাব জাতীয় চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হতে হবে। ভারতের ক্ষেত্রে গণতন্ত্রের পক্ষে অতি প্রয়োজনীয় এই পরিবেশের যে একান্ত অভাব এমন কথা আমরা বলতে পারি না। বিগত কয়েকটি সাধারণ নির্বাচন শান্তিপূর্ণভাবেই অতিবাহিত হয়েছে। নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী নাগরিকেরা এই নির্বাচনের

মাধ্যমে তাদের যথেষ্ট বিচারবুদ্ধি এবং দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে। কংগ্রেস কেন্দ্রীয় বা রাজ্য আইন সভার অধিকাংশ আসন দখল করে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলেও, এই ক্ষমতার তারা অপব্যবহার করেছে এমন কথা বলা যায় না। একমাত্র কেরলের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগ শোনা গেলেও, সাধারণভাবে কংগ্রেস সরকার গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতেই শাসন-ব্যবস্থা পরিকল্পনা করে আসছে আমরা মনে করতে পারি।

ভারতের পার্লামেণ্ট চালিত গণতন্ত্রের সাফল্যের পিছনে আর একটি বড় কারণ হচ্ছে শান্তি ও শৃংখলাপূর্ণভাবে এখানকার শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হওয়া। এই প্রসংগে আমাদের অবশ্যই উল্লেখ করতে হয় যে, আমাদের এই শৃংখলাপুর্ণ শাসনব্যবস্থার কৃতিত্ব ব্রিটিশ সরকারের বেশ কিছুটা প্রাপ্য। এদেশের শাসনব্যবস্থা পরিচালনার জন্য বিদেশী শাসকেরা মূলতঃ তাদের অর্থনৈতিক স্বার্থের দিকে বেশী করে নজর দিয়েছে সন্দেহ নেই। তাছাড়া, তাদের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থকে বজায় রাখতে গিয়ে অনেক ক্ষেত্রে নিষ্প্রয়োজনীয় কঠোরতা এবং ক্ষেত্র বিশেষে জঘন্য রকমের নিষ্ঠুরতার পরিচয়ও দিয়ে এসেছে। এই অন্যায় এবং ত্রুটিবিচ্যুতিগুলিকে মেনে নিলেও, আমাদের অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে প্রশাসনিক ব্যবস্থার ক্ষেত্রে উপযুক্ত ব্যক্তিদের দিয়ে এমনই এক সংগঠন তারা গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিল যে অর্থনৈতিক ও অন্যান্য অনেক বিষয়ে এই অনগ্রসর দেশও আইন ও শৃংখলার দিক থেকে অন্যান্য অগ্রসর ও পাশ্চাত্ত্য দেশগুলির তুলনায় এই দেশ কোন অংশে পশ্চাৎপদ ছিল না। ব্রিটিশ আমলে প্রশাসনিক ব্যবস্থার সংগঠন এবং তাদের সংগে জড়িত ব্যক্তিরা তাদের পারদর্শিতা ও যোগ্যতার জন্য প্রশংসা লাভ করেছেন। Pax Britannica ('Peace brought by Britain') শব্দটি অর্থহীন বলা চলে না।

আইন ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য যে শাসন-সংক্রান্ত কাঠামোটি আজও আমরা বজায় রেখেছি সেটি মুখ্যতঃ ব্রিটিশ সরকারেরই সৃষ্ট। অবশ্য এই প্রসংগে আমাদের উল্লেখ করা প্রয়োজন যে বর্তমানে আমাদের রাষ্ট্রের অনুসৃত নীতি সমাজতন্ত্রবাদের নীতি। জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রের কার্যাবলীর নীতি ও প্রকৃতি পরাধীন দেশের শাসনব্যবস্থার নীতি ও প্রকৃতি থেকে পৃথক। এখানে আইন ও শৃংখলা রক্ষার যেমন প্রয়োজনীয়তা আছে, তেমনি তৎপরতার সংগে জনকল্যাণমূলক পরিকল্পনাগুলিকেও বাস্তবে রূপ দেওয়া দরকার।

দুঃখের বিষয়, স্বাধীন ভারতের এই নতুন রাষ্ট্রনৈতিক আদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে শাসনযন্ত্রের কাঠামোটির প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধন করা হয়নি। ব্রিটিশ আমলের প্রশাসনিক কর্মচারীরা কোনরূপ আদর্শের ধার ধারত না। ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থাকে বজায় রাখতে হলে যে আইনানুগত্য ও শৃংখলার একান্ত প্রয়োজন, সেইটুকুই ছিল তাদের মূল লক্ষ্য। বর্তমান সরকারের মূল লক্ষ্য তা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে সেইজন্য প্রয়োজনীয় রূপ পরিবর্তিত হতে হবে। তাই প্রশাসনিক সংগঠন ব্যবস্থা থেকে দীর্ঘসূত্রতা এবং দুর্নীতির মূল উৎপাটিত হতে হবে। জয়প্রকাশ নারায়ণ প্রশাসনিক ব্যবস্থার পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ করে বলেন, "বিলম্বই গণতন্ত্রকে হত্যা করে" (Delay will kill democracy")।

কংগ্রেস বিগত কয়েকটি অধিবেশনে প্রশাসনিক পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তার প্রস্তাব গ্রহণ করেছে। শ্রীগুলজারীলাল নন্দ প্রমুখ মন্ত্রীরাও প্রশাসনিক ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তার কথা আমাদের বার বার শুনিয়েছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই সম্বন্ধে আজও কোনরূপ কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়নি। 'লালফিতার চাপ' এবং প্রশাসনিক কর্মচারীদের চক্র যদি সরকার ভেদ করতে না পারে, ভারতীয় গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ তবে অন্ধকারাচ্ছন্ন। তাই গণতন্ত্রকে যথাযথভাবে কার্যকরী করতে হলে প্রশাসনিক ব্যবস্থার প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধন করতে হবে। প্রশাসনিক কাঠামোর বিভিন্ন স্তরের কর্মচারীদের একাধারে দুর্নীতিমুক্ত এবং কর্মতৎপর হতে হবে। পুলিস, ভূমিসংস্করণ, খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগের নিম্নতন স্তরের কর্মচারীদের এবং স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলির সংগে যুক্ত কর্মচারীদের বিশেষভাবে দুর্নীতিগ্রস্ত হতে দেখা যায়। সরকারের উচিত এই সমস্ত দুর্নীতির কারণ অনুসন্ধান করা এবং তার প্রতিরোধকল্পে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করা। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত দলের আইনসভার প্রতিনিধিদের—এমন কি কোন কোন ক্ষেত্রে মন্ত্রীসভার সদস্যদের ক্ষেত্রেও ব্যক্তি বা দলীয় স্বার্থের উদ্দেশ্যে প্রশাসনিক কর্মচারীদের কাজে হস্তক্ষেপ করতে দেখা যায়। নিরপেক্ষতার অভাব দুর্নীতিরই নামান্তর মাত্র। দেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের তরফ থেকে প্রশাসনিক ব্যবস্থার ক্ষেত্রে যদি পুনঃ পুনঃ হস্তক্ষেপ হয়, তাহলে স্বভাবতঃই এই সংগঠন নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে সক্ষম হবে না এবং কালক্রমে দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে পরবে।

ভারতে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার ভবিষ্যতের কথা আলোচনা প্রসংগে আরও একটি উল্লেখযোগ্য প্রয়োজনীয়তার কথা আমাদের মনে আসে। এটি হচ্ছে উপযুক্ত শিক্ষাব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা। পাশ্চাত্ত্যেব গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থাসম্পন্ন রাষ্ট্রগুলিতে জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষিতের হার ভারতের চাইতে অনেক বেশী। আমরা প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকার প্রথা প্রবর্তন করেছি বটে, কিন্তু রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশাত্মক নীতি অনুসারে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা এখনও প্রবর্তিত করতে পারিনি। জন স্টুয়ার্ট মিলের মতে প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকার প্রথা প্রবর্তিত হওয়ার আগে সার্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তিত করা উচিত। (Universal teaching must precede universal enfranchisement)। ভারতের তিনটি সাধারণ নির্বাচন গত হয়েছে। ভারতের অধিকাংশ লোক নিরক্ষর হলেও, এই নির্বাচনের ক্ষেত্রে তারা সাধারণ বোধ শক্তির পরিচয় দিয়েছে। প্রকৃত পক্ষে ভাবতের সাধারণ মানুষের আক্ষরিক জ্ঞান না থাকলেও ভাল-মন্দ বুঝবার ক্ষমতা তাদের যথেষ্ট আছে। বিগত সাধারণ নির্বাচণগুলিব ফলাফল থেকেই আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি। অবশ্য শিক্ষার অভাবের জন্যই ভারতের সাধারণ মানুষ নাগরিক হিসেবে তাদের যথাকর্তব্য পালন করতে সক্ষম হয় না—একথা আমাদের অবশ্যই স্বীকার করতে হবে। গ্রামাঞ্চলে সাধারণ নির্বাচণের সময় প্রায়ই দেখা যায় যে সাধারণ মানুষ অপরের বাকচাতুর্য অথবা মামুলী ছল চাতুরীর সাহায্যে অতি সহজেই প্রভাবিত হয়ে পড়ে। প্রকৃতপক্ষে, অজ্ঞ এবং অশিক্ষিত লোককে মামুলী ছল-চাতুরীর সাহায্যে অতি সহজেই বিপথে পরিচালিত করা যায়।

প্রয়োজনীয় শিক্ষাব্যবস্থা বলতে কেবলমাত্র সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষাকেই বোঝায় না। সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থাকে গণতন্ত্রের অনুগামী হতে হবে। প্রথম মহাযুদ্ধের পর ফ্যাসি পার্টির নেতৃত্বে ইটালীতে এবং নাজি পার্টির নেতৃত্বে জার্মানীতে সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থাকে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীনে আনা হয়েছিল। এই শিক্ষাব্যবস্থায় স্বাধীন এবং স্বতঃস্ফূর্ত চিন্তার অবকাশ ছিল না। এক বিশেষ রাজনৈতিক আদর্শের পরিপেক্ষিতেই শিক্ষাব্যবস্থাকে গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছিল। সোভিয়েট রাশিয়ার ক্ষেত্রেও একথা প্রযোজ্য। শিক্ষাব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হলে এবং রাষ্ট্রের নির্দেশে সম্পূর্ণ ভাবে পরিচালিত হলে তা কখনই গণতন্ত্রের অনুপন্থী হতে পারবে না। সুখের

বিষয়, ভারতের শিক্ষাব্যবস্থার উদার নৈতিক ভিত্তি পরোক্ষভাবে গণতন্ত্রের ভিত্তিকেই সুদৃঢ় করেছে। অবশ্য সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাব্যবস্থায় বিভিন্ন রাজ্য সরকারের কয়েকটি অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপের উদাহরণও দেখা গেছে। এই প্রবণতা নিঃসন্দেহে আপত্তিজনক।

ভারত পৃথিবীর বৃহত্তর গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা সম্পন্ন রাষ্ট্র। তাই গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাকে যথার্থভাবে কার্যকারী করা সত্যই দুরূহ। কেননা বিভিন্ন ধর্ম, ভাষা, কৃষ্টি এখানে পাশাপাশি বিদ্যমান।

তাই ধর্ম এবং ভাষার বৈষম্যজনিত বিরোধ এবং প্রাদেশিকতার নগ্নরূপ আমাদের সর্বভারতীয় কৃষ্টি ও ঐতিহ্যকে মাঝে মাঝে আচ্ছন্ন করে আমাদের জাতীয় ঐক্যের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। তাই গণতন্ত্রকে যথার্থভাবে কার্যকারী করা সত্যই দুরূহ। তবুও এই দুরূহ পরীক্ষার ক্ষেত্রে আমরা সাফল্যের সংগেই এগিয়ে চলেছি। গ্রেট ব্রিটেনের প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী এটলি (Earl Attlee) একবার ভারত ভ্রমণে এসে মহারাষ্ট্রের আইন সভার সদস্যদের সামনে বলেছিলেন, "You have a difficult task because you have a federation which is difficult to work. I do not know whether you had any trouble or what precisely are the sudjects allocated to them—the centre and the States. But the fact that you are able to work it is a great tribute to your parliamentary ability."*

গণতন্ত্রের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় এই শর্তগুলি আলোচনার পর শাসন ব্যবস্থা হিসেবে পার্লামেণ্ট চালিত সরকারের কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করে আমাদের বিচার করতে হবে ভারতের ক্ষেত্রে সেগুলি কতদূর কার্যকরী হয়েছে। পার্লামেণ্ট চালিত বৈশিষ্ট্যগুলির অন্যতম হচ্ছে: (১) নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্রপ্রধান (Constitutional Head of the State), (২) পার্লামেণ্টের নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত প্রকৃত ক্ষমতাসম্পন্ন মন্ত্রীসভা (Cabinet, the real Executive responsible to Parliament), (৩) সংহত রাজনৈতিক দল (Organised Political Parties) এবং (৪) বিচারবিভাগীয় স্বাধীনতা (Independence of the Judiciary)।

* Attlee's speech in a meeting of Maharastra Branch of Commonwealth Parliamentary Association on Feb 27, 1963.

ভারতের পার্লামেণ্ট চালিত শাসনব্যবস্থার প্রয়োজনীয় অংগ হিসেবে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পদাধিকারী রাষ্ট্রপতি নিয়মতান্ত্রিক প্রধান মাত্র। আসল ক্ষমতা মন্ত্রীপরিষদের উপর ন্যস্ত এবং রাষ্ট্রপতি মন্ত্রীসভার পরামর্শ অনুসারেই পরিচালিত হন। তবে এই প্রসংগে উল্লেখযোগ্য যে, সংবিধানের ভাষায় রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা সংকুচিত করা হয়নি। জরুরী অবস্থায় রাষ্ট্রপতির হাতে প্রচুর ক্ষমতা ন্যস্ত করা হয়েছে। এমন কি মন্ত্রীসভার সদস্যদের ক্ষমতায় অধিষ্ঠানও রাষ্ট্রপতির ইচ্ছার (pleasure) উপর নির্ভরশীল। তবে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতাগুলি তিনি মন্ত্রীসভার ইচ্ছা অনুসারেই পরিচালিত করবেন—এমন আমরা আশা করতে পারি। বর্তমানে রাষ্ট্রপতি এবং মন্ত্রীসভার মধ্যে মত বিরোধ না ঘটলেও, একবারেই যে কোন মতান্তর ঘটেনি এমন কথা বলা যায় না। ডঃ রাজেন্দ্র-প্রসাদ রাষ্ট্রপতি হিসেবে তাঁর কার্যকালের শেষের দিকেই কয়েকটি এই জাতীয় মত বিরোধের ইংগিত দিয়েছিলেন। এই প্রসংগে আমরা বলতে পারি যে রাষ্ট্রপতি এবং মন্ত্রীসভার সদস্যরা একই রাজনৈতিক দলের অন্তর্ভুক্ত হলে এই জাতীয় মতবিরোধের অবকাশ কম। তবে তাঁরা ভিন্ন রাজনৈতিক দলভুক্ত হলে তাঁদের মধ্যে মত বিরোধ দেখা যেতে পারে এবং সে ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি ইংলণ্ডের রাজা বা রাণীর মত শুধুমাত্র নিয়মতান্ত্রিক প্রধান হিসেবে কার্য পরিচালনা নাও করতে পারেন।

পার্লামেণ্ট চালিত শাসনব্যবস্থার চিরাচরিত নীতি হিসেবে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা স্পষ্টই সংকুচিত করা হয়নি। এদিক থেকে বিচার করলে ভারতের রাষ্ট্রপতির নিজস্ব বিচারশক্তি ও বিবেচনা অনুসারে ক্ষমতা পরিচনার সুযোগ কিছুটা হয়ত রয়ে গেছে। এই ব্যবস্থা পার্লামেণ্ট চালিত শাসনব্যবস্থায় কতটা অনুগামী হবে আজকের দিনে সে সম্বন্ধে স্থিরভাবে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সুকঠিন।

দ্বিতীয়তঃ, পার্লামেণ্ট চালিত শাসনব্যবস্থার নিয়মানুসারে আমাদের সংবিধানে পার্লামেণ্টকেই সার্বভৌম ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করা হয়েছে। মন্ত্রী-সভার সদস্যদের সংবিধানের নিয়ম অনুসারে পার্লামেণ্টের সদস্য হতে হয় এবং পার্লামেণ্টের কাছে যৌথভাবে দায়ী থাকতে হয়। তবে এই প্রসংগে উল্লেখ-যোগ্য যে মন্ত্রীসভাকে পার্লামেণ্টের কাজে যৌথভাবে দায়িত্বসম্পন্ন করা হলেও, মন্ত্রীসভার প্রতি পার্লামেণ্টের আস্থার অভাব ঘটলে মন্ত্রীসভা পদত্যাগ করতে বাধ্য হবে, একথা স্পষ্টভাবে সংবিধানে বলা হয়নি। মন্ত্রীসভার সদস্যদের

স্ব-পদে অধিষ্ঠানকে রাষ্ট্রপতির সদিচ্ছার (pleasure) উপর নির্ভরশীল করা হয়েছে। আয়ারল্যাণ্ড, জাপান প্রভৃতি এই জাতীয় শাসনব্যবস্থাসম্পন্ন রাষ্ট্রে পার্লামেণ্টের অনাস্থাভাজন হলে মন্ত্রীসভার পদত্যাগ বিষয়ক গণতান্ত্রিক নীতিটি সুস্পষ্টভাবে সংবিধানে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। আমাদের সংবিধানে পার্লামেণ্ট পরিচালিত শাসনব্যবস্থায় এই নীতিটি ভাষার আকারে সুস্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ না করার যৌক্তিকতা প্রসংগে আলাদি কৃষ্ণস্বামী আয়ার বলেন, "The Indian constitution······has advisedly refrained from enumerating in details the incidents of the responsible Govt. A provision like this will give sufficient scope for conventions for Responsible Govt. to grow up. Any stereotyping of such incidents into a statutory mould will not impart an element of elasticity to the Constitutions."

(Amrita Bazar Patrik, dated 26th Jan, 1950.)

সামাজিক এবং অর্থনৈতিক পরিকল্পনার ভিত্তিতে সুসংগঠিত রাজনৈতিক দলের অবস্থিতিও পার্লামেণ্ট চালিত গণতন্ত্রের অন্যতম অংগ। ভারতে এই শ্রেণীর রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব থাকলেও, সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে গঠিত রাজনৈতিক দলের অভাব নেই। সম্প্রতি সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে গঠিত রাজনৈতিক দলগুলিকে অবৈধ ঘোষণা করার প্রস্তাব উঠলেও, অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তি এই প্রস্তাবের সম্পূর্ণ বিরোধী। আইনের সাহায্যে কোন রাজনৈতিক দলকে তুলে দেবার নীতি একবার গৃহীত হলে, অন্যান্য দলগুলির ক্ষেত্রেও সেই প্রবণতা পরিব্যপ্ত হতে পারে। তাই শিক্ষিত ও সুসংহত জনমতই সুস্থ রাজনৈতিক দলপ্রথা গড়ে তোলার উপযুক্ত সহায়ক বলে মনে হয়। গণতন্ত্রকে সুষ্ঠুভাবে কার্যকরী করতে হলে বহু দলপ্রথার চাইতে দুটি মাত্র রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব অধিকতর উপযোগী বলে মনে হয়। দুঃখের বিষয় ভারতে আজ দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা গড়ে উঠবার কোন সম্ভাবনাই দেখা যায় না। সাম্প্রদায়িকতা এবং আঞ্চলিক আনুগত্যের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা দলগুলি দুর্বলতর হয়ে উঠছে সন্দেহ নেই, কিন্তু অর্থনৈতিক ও সমাজনৈতিক পরিকল্পনার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা দলগুলি সংহতির অভাবে দ্বিধাবিভক্ত এবং ক্ষীণতর হয়ে উঠছে। এই শেষোক্ত প্রকার দলগুলি তাদের পৃথক পৃথক অস্তিত্ব বজায় না রেখে এক শক্তিশালী দল হিসাবে গড়ে উঠলে ভারতের গণতন্ত্রের পক্ষে তা অধিকতর উপযোগী বলে মনে হয়।

গণতন্ত্রকে সাফল্যমণ্ডিত করার এক অন্যতম প্রধান শর্ত হচ্ছে বিচার-বিভাগীয় স্বাধীনতা। এর জন্য উচ্চ বিচারালয়ের বিচারপতিদের শাসনবিভাগীয় কর্তৃপক্ষের প্রভাব ও হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত হতে হবে। তাছাড়া, তাঁদের বেতন, ভাতা, নিয়োগ ও অপসারণ পদ্ধতি তাঁদের মর্যাদার উপযুক্ত হতে হবে। আমাদের হাইকোর্ট এবং সুপ্রীম কোর্টের বিচারকগণের নিয়োগ ও অপসারণ পদ্ধতি তাঁদের শাসনবিভাগীয় কর্তৃপক্ষের প্রভাব ও হস্তক্ষেপ থেকে কিছুটা মুক্ত করেছে সন্দেহ নাই। তবে বিচারবিভাগ থেকে শাসনবিভাগের পৃথকীকরণের কাজ ভারতের কোন কোন রাজ্যে আংশিক ভাবে কার্যকরী হলেও সম্পূর্ণভাবে তা ভারতের সর্বত্র চালু করা হয়নি। ভারতের সংবিধানে চতুর্থ পরিচ্ছদে রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশাত্মক নীতিতে এই পৃথকীকরণের কাজ কার্যকরী করা হবে বলে ঘোষণা করা হলেও, তা বাস্তবে রূপদানের ক্ষেত্রে সরকারের সংশয় এবং মন্থর পদক্ষেপ নিঃসন্দেহে আপত্তিজনক।

ভারত ও কমনওয়েলথ (India and the Commonwealth) :

১৯৪৯ সালে এপ্রিল মাসে কমনওয়েলথ প্রধানমন্ত্রীদের সম্মেলনে ভারত কমনওয়েলথের সদস্য হবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এই সিদ্ধান্তের ফলে ভারতের সার্বভৌমত্ব এবং প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রাদর্শ ক্ষুণ্ণ হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন। কিন্তু চিন্তা করে দেখলে দেখা যাবে যে, কমনওয়েলথের সদস্যভুক্ত হওয়ায় ভারতের রাষ্ট্র হিসেবে সার্বভৌমত্ব আদৌ ক্ষুণ্ণ হয়নি। বর্তমান সংবিধানের প্রস্তাবনায় ভারতকে একটি সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে এবং পূর্বোক্ত কমনওয়েলথ প্রধানমন্ত্রী সম্মেলনে ভারতের এই সার্বভৌম রাষ্ট্রীয় মর্যাদাকে কোন ক্রমেই খর্ব করা হয়নি। উক্ত সম্মেলনে রাজাকে কমনওয়েলথ সদস্যভুক্ত জাতির স্বেচ্ছায় এবং স্বাধীনভাবে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রতীক হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে ("Symbol of the free association of its independent member nations.") এবং সেই অর্থে রাজা বা রাণী কমনওয়েলথের প্রধান। এখানে রাজার প্রতি আনুগত্যের কোন প্রশ্নই ওঠে না।

সর্দার প্যাটেল ১৯৪৯ সালে ২৮শে এপ্রিল এক সাংবাদিক সম্মেলনে যথার্থই বলেছেন—"সার্বভৌম এবং স্বাধীন প্রজাতন্ত্র হিসেবে—ভারতের মর্যাদা কোন ক্রমেই ক্ষুণ্ণ হয়নি। কারণ এতে রাজার প্রতি আনুগত্য

জ্ঞাপনের কোন প্রশ্নই ওঠে না, রাজা শুধু কমনওয়েলথ সদস্যদের স্বাধীনভাবে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রতীক হিসেবে কাজ করবেন। ("India's status as a sovereign independent Republic is, by no means, effected, because there is no question of allegiance to His Majesty the king who will merely remain a symbol of our free association as he would be of other members.")। শ্রীনেহেরু কমনওয়েলথ চুক্তির সমর্থনে ১৯৪৮ সালের ১০ই মে এক বেতার বক্তৃতায় বলেছেন, "আমাদের অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে যে কমনওয়েলথ কোন super-state নয়। আমরা রাজাকে আমাদের স্বাধীনভাবে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার নামে মাত্র প্রধান হওয়ার প্রতীক হিসেবে গণ্য করেছি। কিন্তু সেই পদমর্যাদার জন্য কমনওয়েলথে রাজার কোন কাজ নেই। ভারতের সংবিধানেও রাজার কোন স্থান নেই এবং আমরা তাঁর প্রতি আনুগত্যও জ্ঞাপন করব না ("It must be remembered that the Commonwealth is not super-state in any sense of the term. We have agreed to consider the king as the symbolic head of this free association. But the king has no function attached to that status in the Commonwealth. So far as the constitution of India is concerned, the king has no place and we shall woe no allegiance to him.")। বস্তুতঃ, ভারতের সাংবিধানিক, আভ্যন্তরীণ অথবা বৈদেশিক সার্বভৌম ক্ষুণ্ণ হতে পারে এমন কোন চুক্তি কমনওয়েলথ সম্মেলনে করা হয়নি। তাই এই চুক্তির ফলে ভারতের রাষ্ট্রীয় মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়েছে—এরূপ মনে করার কোন সংগত কারণ নেই।

তবে এই চুক্তির ফলে ভারতের ক্ষেত্রে একটি বিরাট বৈষম্যের কথা আমরা উল্লেখ না করে পারি না। কমনওয়েলথ চুক্তিমত রাজাকে "কমনওয়েলথের প্রধান" (Head of Commonwealth") বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আমাদের সংবিধানে ভারতকে প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রধান হিসেবে আমরা রাষ্ট্রপতিকেই গণ্য করব। তাই প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র এমন কোন সংস্থা বা শক্তি গোষ্ঠীর সংগে একত্রিভূত হতে পারে না যেখানে নাকি অন্য একজন রাজাকে প্রধান হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। কমনওয়েলথ সদস্যভুক্ত অস্ট্রেলিয়া, কানাডা প্রভৃতি অন্যান্য রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে এই প্রশ্ন ওঠে না। কারণ তারা কেউই প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র নয়। ১৯৩১ সালে Statute of West-minister অনুসারে

তারা সকলেই রাজার প্রতি আনুগত্যের বন্ধনে ঐক্যবদ্ধ। কিন্তু ভারতের ক্ষেত্রে এই প্রশ্ন ওঠে না। জেনারেল স্মাট্স্ (*Genaral Smuts*) যথার্থ-ই বলেছেন যে, কমনওয়েলথ সদস্য পদ এবং প্রজাতান্ত্রিক অবস্থা স্পষ্টতই অসংগতিপূর্ণ।

এই অসংগতিপূর্ণ অংশটুকুর কথা বাদ দিলেই ভারতের স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে কমনওয়েলথের সদস্যভুক্তি যুক্তিযুক্ত বলেই বিবেচিত হয়। স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে ভারত যে কোন সময় কমনওয়েলথ থেকে বেরিয়ে আসতে পারে। স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ না করে অন্যের সংগে ঐক্যবদ্ধ হলে লাভ ছাড়া লোকসানের কিছুই নেই। ভারত তার স্বাধীন অস্তিত্ব বজায় রাখতে চায় কিন্তু 'একক' হয়ে থাকতে চায় না। সাধারণ সুযোগ-সুবিধা এবং বন্ধুত্বের বন্ধনে অন্য রাষ্ট্রের সংগে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার অর্থ কোন শক্তি জোটে (Power Block) যোগ দেওয়া বা সন্ধি চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়া নয়। কমনওয়েলথের সদস্যভুক্ত হয়েও জোট নিরপেক্ষ বৈদেশিক নীতি অনুসরণের মধ্যেই তার সত্যতা প্রমাণিত হয়।

কমনওয়েলথ সম্মেলনে সদস্য রাষ্ট্রগুলির কোন বিবাদের কথা উল্লেখ না করা এবং যে সম্বন্ধে কোন বিবৃতি (Communique) প্রকাশ না করাই ছিল এতাবৎ রীতি। কিন্তু গত কমনওয়েলথ প্রধানমন্ত্রীর সম্মেলনে কাশ্মীর সমস্যা নিয়ে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে বিবাদের উল্লেখে বা ইঙ্গিতের কথা প্রকাশিত হওয়ায়, অনেকে উক্ত সম্মেলনে ভারতের প্রতিনিধি শ্রীকৃষ্ণমাচারীর প্রতি দোষারোপ করেছেন এবং এই প্রসংগে কমনওয়েলথ পরিত্যাগ করার কথাও উঠেছে। আমাদের পরলোকগত প্রধানমন্ত্রীর মত বলিষ্ঠ ব্যক্তির অভাবে হয়ত ভারতকে এই জাতীয় অপ্রীতিকর অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। তবে অতীতের অভিজ্ঞতায় এই জাতীয় অপ্রীতিকর ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটবে না—আমরা আশা করতে পারি। আমাদের ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে, সম্পূর্ণ ভাবে বৃটিশ পক্ষপুষ্ট অতীতের ব্রিটিশ কমনওয়েলথ এবং আজকের স্বাধীন জাতিসমূহের কমনওয়েলথ এক বস্তু নয়। আফ্রিকার স্বাধীন রাষ্ট্রগুলি এই আন্তর্জাতিক সংস্থার সংগে যোগ দেওয়ার ফলে এর মূলগত প্রকৃতি আজ পরিবর্তনের দিকে। বিগত কমনওয়েলথ সম্মেলনে শ্রীকৃষ্ণমাচারী যথার্থই বলেছেন, "The new Commonwealth is the instrument which is good not only for India but for the whole world. People still think in terms of the old Commonwealth. We must not forget that 'the new Commonwealth is multi-racial and muli-national and there is a larger degree of cohesion."

প্রশ্নাবলী

1. What is the significance of the preamble to a constitution? The preamble to the constitution of India states that India is a sovereign Democratic Republic.—Explain.

(C. U. 1955)

2. The preamble to the constitution of India states that India "shall be a Sovereign Democratic Republic"—Explain.

3. Give in brief the main features of the constitution of India.

4. Indicate the states of the Republic of India within the Commonwealth of Nations. Give your answer with reference to the preamble to the constitution of India.

5. What is the nature of India Federalism? Do you agree with the view that the Indian constitution is none unitary than federal? Give reasons for your answer.

6. Describe the scheme of distribution of legislative powers between the centre (Union) and the constituent states of the Indian Union.

7. "India's constitution is federal in form with pronounced unitary bias".—Discuss (B. U. 1964)

8. Briefly describe the povisions in regard to the acquisition of citizenship in India.

9. Describe the nature of Fundamental Rights guranteed in the Indian constitution. Are they absolute? (C. U. 1954)

10. What are the Fundamental Rights guranteed in the constitution of India? Are those Rights absolute?

11. How does the constitution of India gurantee the 'Right to Equality'?

12. Discuss how 'Right to Property' has been safeguarded in our constitution?

13. What do you mean by 'Rule of Law'? Discuss how the constitution of India gurantees the same.

14. Summerise the main provisions of the Directive Principles or state policy. Are they meaningless?

15 Describe in brief the Directive Principles of State Policy as enumerated in the constitution of India, and indicate their significance.

16. What are the Directive Principles of the State Policy? Indicate the utility and impleoations of these principles.

17. How is the president of India elected ?

18. Describe the position of powers of the President of India.

19. Discuss constitutional position of the President of India in relation to his Council of Ministers.

20. Describe the position and powers of the Union Council of Ministers in relation to (a) the President and (b) the Parliament.

21. Discuss the emergency Powers of the President of India.

22. Discuss the constitutional relation between the President and the Council of Ministers.
(C. U. B. A. 1956, B. Com. 1951, '52, '54)

23. Describe the relation of the Union Council of Ministers in relation to Parliament. (C. U. B. Com. 1950)

24. Describe the position and powers of the Prime Minister of India. (C. U. B. Com. 1951, '58)

25. Give an account of the functions of the Council of Ministers.

26. Discuss the composition of the Indian Parliament.

27. Describe the main function and power of the Parliament of India.

28. Give an account of relationship between the two Houses of Parliament.

29. How far does the Indian Parliament exercise control over the purse of the Country ?

30. How a bill is passed in Indian Parliament ?

31. Describe the position of the Supreme Court of India. In what respects, if any, is this Court a guardian of our constitutional rights. (C. U. Hon. 1954)

32. Describe the position and functions of the West Bengal Legislature. Do you justify the creation of a Second Chamber in West Bengal ? Give reasons.

33. Describe the composition and functions of the Union Public Service Commission.

34. Give an account of the special provisions incorporate in our constitution for safeguarding the interests of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

35. Give an account of the electoral arrangement with special reference to the composition and function of the Election Commission in our constitution.